ফেরদৌসী

শাহনামা

[প্রথম খণ্ড]

মনিরউদ্দীন ইউসুফ

অনূদিত

বাংলা একাডেমী : ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন, ১৩৭৮
[ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১]
বা.এ. ৮০৮

প্রকাশক
ফজলে রাব্বি
পরিচালক
প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় বিভাগ
বাংলা একাডেমী
ঢাকা-২

মুদ্রণ
তাজুল ইসলাম
বর্ণমিছিল
৪২/এ, কাজী আবদুর রউফ রোড
ঢাকা-১

ভূমিকা মুদ্রণ
বাংলা একাডেমীর মুদ্রণ শাখা

প্রচ্ছদ
সৈয়দ আলী আজম

ফররুখ আহমদ

সৈয়দ আলী আহ্‌সান

ও

সানাউল হক-কে

ভূমিকা

[১]

'শাহনামা' রচনার পটভূমি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ফেরদৌসী তাঁর গ্রন্থমধ্যে কালের অভিযোগ উত্থাপন করে বলেন—

> যুদ্ধবিগ্রহে পরিপূর্ণ ছিল যুগ,
> অন্বেষণকারীর নিকট দুনিয়া ছিল অতীব সংকীর্ণ।
> এইভাবে কাটিয়েছি এক যুগ
> বাণীকে লুক্কায়িত রেখেছি নিজের মধ্যে।

এই আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যকে ঐতিহাসিক তথ্যের উপর রাখলে দেখা যায় যে, খ্রীষ্টীয় দশম একাদশ শতকে ইরান, তুরান ও আরব তাদের জাতীয়-সত্তার এক সঙ্কটময় সময় অতিক্রম করছে। বাগদাদের খলিফার প্রভাব দ্রুত হ্রাস পাওয়ায় ইরানে ও তুরানে (মধ্য এশিয়ায়) যে-সব রাজ্য গড়ে উঠছিল, তাতে তুর্কীদের প্রভাব ক্রমে আরব ও ইরানের উপর ঘনঘটার মতো বিস্তৃত হয়ে পড়ছিল।

কোন মহৎ কবি-প্রতিভার মধ্যে তার নিজের কাল অনুপ্রবিষ্ট হয়ে যখন আলোড়নের সৃষ্টি করে, তখন তার প্রকাশ হয় যেমন ব্যাপক, তেমনই গভীর। সে প্রকাশ তখন জাতীয় পুনরুজ্জীবনের পথ খুঁজে নিতে ব্যস্ত হয়। ফেরদৌসীর বেলায়ও তেমন হয়েছিল। তিনি তাঁর স্বদেশ ইরানের সুপ্ত প্রাণ-ধর্মের অনুসন্ধানে ব্যাকুল হয়ে ফিরেছিলেন, ইতস্ততঃ ছড়িয়ে থাকা কিংবদন্তী ও ইতিকথার উদ্ধারে তিনি করেছিলেন নিজেকে নিয়োজিত। পরাজিত নির্যাতিত ইরান কবির কাছে জানিয়েছিল তার মহত্তম অতীতের ক্রম-উন্মোচনের আবেদন।

এই ক্রম-উন্মোচন যে ইতিহাসের পথ ধরেই অগ্রসর হবে,—একথা নিশ্চিত। কিন্তু ইতিহাসের শিলাস্থি সংগ্রহ ও তার তথ্যের ভার পরিবহন তো কবির কাজ নয়। ইরানের হৃৎপিণ্ডে নবরক্ত সঞ্চালনের কাজই করতে

হবে! দায়িত্ব নিতে হবে ইরানকে বুঝিয়ে দেবার যে, তোমার অতীতের মত তোমার ভবিষ্যৎও প্রাণপূর্ণ হতে পারে, হতে পারে তা মহৎ।

ফেরদৌসী ইরানকে পুনরুজ্জীবিত করার সেই কঠিন দায়িত্ব সানন্দে মাথা পেতে নিয়েছিলেন। দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের প্রচুর পরিশ্রমে সে দায়িত্ব তিনি সম্পূর্ণও করেছিলেন। গ্রন্থ শেষ করে তাই, 'শাহনামা'র পরিচয় দিতে গিয়ে কবি বলেন—

بسے رنج بردم دریں سال سی
عجم زنده کردم بدایں پارسی

[দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে বহু পরিশ্রমের পর
এই পারসী গ্রন্থ দ্বারা আমি ইরানকে পুনরুজ্জীবিত
করে গেলাম।]

কবির প্রকাশের প্রধান মাধ্যম হোল কল্পনা। কিন্তু শুধু কল্পনার সাহায্যে মহৎ কবিতা সৃষ্টি হয় না; সেই কল্পনাকে জ্ঞান ও চিন্তার আশ্রয় নিতে হয় এবং কবির কাল 'অভিজ্ঞতা' হয়ে জ্ঞান, চিন্তা ও কল্পনাকে প্রাণধর্মে উজ্জীবিত করে। সেজন্যেই ফেরদৌসীর 'শাহনামা' ইতিহাস না হয়ে কাব্য হয়েছে; তথ্যের সংগ্রহ না হয়ে, তা হয়েছে যৌবনপ্রাপ্ত ইরানের প্রাণময় চলমান প্রতিচ্ছবি। 'শাহনামা' ইতিহাস হলে, জোহাকের রাজ্যকাল এক হাজার বৎসর হতে পারতো না; ইরান-বীর রুস্তম তিনশত বছর ধরে সম্রাটের পর সম্রাটের রাজ্যকাল ব্যেপে এমনভাবে দেশ ও কালের পরিব্যাপ্ত সময়াঙ্কে স্বীয় শৌর্য ও আত্মমর্যাদা প্রকটিত করার সুযোগ পেতেন না।

'শাহনামা' কাব্য; শুধু কাব্যই নয় মহাকাব্য। চরিত্র চিত্রণে, ব্যাপ্তিতে, সমৃদ্ধিত বিবরণে, শৌর্য-বীর্যের প্রকাশে, বুকভাঙা বেদনায়, ঔদার্য ও করুণার মানবিক উদ্ভাসনে এই কাব্য এমন এক বিরাট চিত্রশালার দ্বারোন্মুক্ত করে, যার অনুরূপ যে কোন দেশের সাহিত্যে দুর্লভ।

বলা হয়ে থাকে, ফেরদৌসী গজনীর অধিপতি সুলতান মাহ্‌মুদের ফরমায়েশে তাঁর এই মহাকাব্য রচনায় হাত দিয়েছিলেন। গ্রন্থমধ্যে বহুবার 'সুলতানে'র প্রশংসা কীর্তিত হয়েছে, বলাও হয়েছে, কবি সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতায় নিরাপত্তার মধ্যে সানন্দে কাল যাপন করেছেন; তবুও গ্রন্থখানি যে সুলতান মাহমুদের ফরমায়েশে রচিত হয়নি, তার প্রমাণ গ্রন্থমধ্যেই রয়েছে।

বলা হয়েছে. কবি 'শাহ্‌নামা' রচনা শুরু করার পর তাঁর এক বন্ধু তাঁকে উপদেশচ্ছলে বলেছিলেন রাজ-রাজড়াদের এই কাহিনী কোন নরপতিকে উৎসর্গ করাই শোভা পায়। বন্ধুর উপদেশ কবি শিরোধার্য করেছিলেন। ইতিহাসও বলে, সুলতান মাহমুদের সভায় ফেরদৌসী সাদরে গৃহীত হয়েছিলেন।

কিন্তু এ সংবাদ আমাদেরকে এ বিষয়ে নিশ্চয়তা দান করতে পারে না যে, ফেরদৌসী সুলতান মাহ্‌মুদেরই আদেশে 'শাহনামা' রচনা করেছিলেন। তবে আমরা এতটুকু বুঝতে পারি যে, সুলতানের রাজসভায় একজন বিশিষ্ট কবিরূপে ফেরদৌসী মাহ্‌মুদের হাত থেকে প্রচুর পারিতোষিকের আশা করেছিলেন। কিন্তু আশানুরূপ পারিতোষিক তিনি পাননি। এর কারণ 'শাহনামা' কাব্যই।

'শাহনামা' ইরানীয় জাতীয়তার উজ্জীবনের কাব্য। ইরানের স্বাধীনতা হরণকারী তুর্কী বংশোদ্ভূত গজনী-রাজবংশ এ-কাব্য সন্তুষ্ট মনে গ্রহণ করতে পারে না। পরবর্তীকালে 'শাহ্‌নামা'র আন্তর্জাতিক মূল্য যত বড়ই হোক না কেন, সুলতান মাহ্‌মুদের সময়ে তো ইরান-তুরানের (তুর্কীদের) সংঘর্ষ বাস্তব ছিল। এই বাস্তবতাকে হৃদয়ঙ্গম করার মতো সচেতনতা সুলতান মাহমুদের ছিল না, এমন ভাবা যায় না।

তাছাড়াও 'শাহনামা'য় সুলতান মাহ্‌মুদের যে সব প্রশস্তি রয়েছে, সেগুলি প্রক্ষিপ্তের মতো শোনায়। ইরানের শাহ্‌দের কীর্তি কথার সঙ্গে গজনী-বংশের কোনই সম্পর্ক নেই। 'শাহনামা'র কাহিনী মুসলমানগণ কর্তৃক ইরান বিজয়েই সমাপ্ত হয়েছে, সেখানে ইরানের সিংহাসনে জোহাকের অনুরূপ স্থানও মাহ্‌মুদের জন্য রক্ষিত হয়নি।

'শাহনামা' রচনা যখন শেষ হয়, তখন কবির বয়স আশি বছর। ত্রিশ বছর ধরে তিনি 'শাহনামা' রচনার কাজে ব্যস্ত ছিলেন বলে দেখা যায়। যদি তাই হয়, তবে ফেরদৌসীর জীবনের প্রথম পঞ্চাশটি বছর কোথায় কিভাবে কেটেছিল? এ প্রশ্ন উঠে। আরও দেখা যায়, 'শাহনামা' শেষ হয়েছিল ১০১০ সালে; ত্রিশ বছর আগে যদি তার রচনা শুরু হয়ে থাকে, তবে সেই সূচনা ৯৮০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে হয়েছিল বলে ধরে নেওয়া যায়। অথচ যে সুলতান মাহ্‌মুদ সিংহাসনারোহণ করেন ৯৯৮ খ্রীষ্টাব্দে, তাঁর আদেশে ৯৮০ সালে 'শাহ্‌নামা'র রচনা শুরু হয়েছিল, এমন ভাবা যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না।

জানা যায় যে, কবি যৌবনেই তাঁর জন্মভূমিতে ইরানের প্রাচীন রাজা-বাদশাহের এক কাহিনী লিখতে শুরু করেন গদ্যে এবং সম্ভবতঃ তা সম্পূর্ণও করেন। তারপর কবি দাকীকীর অনুবর্তিতায় ফেরদৌসী তাঁর কাহিনীকে ছন্দোবদ্ধ করার অনুপ্রেরণা লাভ করেন। দাকীকীর 'শাহনামা' অধিকদূর অগ্রসর হওয়ার পূর্বে যৌবনেই তিনি আততায়ীর হাতে নিহত হন। ফেরদৌসী যে 'শাহনামা' গদ্যে রচনা করেছিলেন অথবা তার খসড়া তৈরী করেছিলেন তা সম্ভবতঃ 'আলেকজান্দার' (আবর্‍্যোপন্যাস) ঢঙে পরিকল্পিত হয়েছিল।

সুতরাং দাকীকীর থেকে 'আলো লাভ করে' কবি স্বীয় জন্মভূমিতে বসেই বর্তমান 'শাহনামা' রচনায় হাত দেন একথা নিশ্চিত বলে ধরে নেওয়া যায়, এবং কেবল প্রবীণ বয়সেই সুলতান মাহমুদের উজির হাসান মৈমুন্দীর সহায়তায় কবি গজনীর রাজসভায় গৃহীত হন। বলা আবশ্যক যে, সুলতান মাহমুদের রাজসভা গুণীজন দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। মহাপণ্ডিত আল-বেরুনী ছিলেন সুলতানের সভার মহামূল্য মণি, আসজাদী, ফররুখী, উনসুরী নামে আরো কয়েকজন কবিও সুলতানের সভা আলো করে রেখেছিলেন।

সুলতান মাহমুদের উপর ফেরদৌসীর লেখা একটি অপবাদসূচক কবিতাকে ঘিরে অনেক মুখরোচক কাহিনীর উদ্ভব হয়েছে। এই কবিতাটি বিশেষ করে ভারতীয় উপমহাদেশে অতিশয় পরিচিত। 'শাহনামা'র অপর কোন একটি পংক্তিও যাঁদের জানা নেই, তারাও এই অপবাদ-সূচক কবিতাটির দু'চার পংক্তির উদ্ধৃতি দিতে পারেন।

নিন্দাত্মক এই কবিতাটির জনপ্রিয়তার কথা স্মরণ রেখেই এখানে আমরা সেটির পূর্ণ অনুবাদ সন্নিবেশিত করলাম।

কবিতাটি নিম্নরূপ

হায়, রাজাজয়ী মাহমুদ, তোমার জন্য দুঃখ হয়
মানুষকে যদি ভয় নাই কর, তবে অন্ততঃ খোদাকে তো ডরাও।
তোমার পূর্বেও দুনিয়ায় রাজত্ব করে গেছেন বহু বাদশা,
তাঁরা সবাই ছিলেন রাজ্যাধিপতি ও মুকুটধারী।
তাঁরা মর্যাদায় নিঃসন্দেহে তোমার চাইতে উচ্চতর ছিলেন,
সম্পদ, সৈন্য, মুকুট ও সিংহাসন তাদের মহত্তর ছিল।
তাদের কর্ম কল্যাণ ও সততাকে আশ্রয় করেই বিরাজ করতো,
নীচতা ও ক্ষুদ্রতা তাঁদের ব্যক্তিত্বকে খর্ব করেনি।

অনুগত জনকে তাঁরা বদান্যতার দ্বারা তুষ্ট করতেন,
পবিত্র বিশ্ব-প্রভুর উপাসনা ছিল তাঁদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।
কালের মধ্যে তাঁরা যশঃ ও সুনামের সন্ধানী ছিলেন,
এবং সেই অনুসন্ধানের পরিণাম ছিল মঙ্গলময়।
অপরপক্ষে যে নরপতি স্বর্ণমুদ্রার লালসায় বন্দী ছিল,
জ্ঞানীজনের কাছে তাকে হতে হয়েছে অবজ্ঞার পাত্র।
হে সুলতান! যদিও ধরিত্রী এখন তোমারই শাসনাধীন,
তবুও, জিজ্ঞাসা করছি, এই নির্লজ্জ বাক্য কেন তুমি উচ্চারণ করলে?
আমার প্রখর ব্যক্তিত্ব কি তোমার চোখে পড়েনি?
আর সেই সঙ্গে তুমি কি ভেবে দেখনি, আমার রক্ত-পিপাসু
তরবারির কথা?

তুমি আমাকে ধর্মহীন অসচ্চরিত্র বলে গালি দিয়েছ,
আমি পুরুষ সিংহ, আমাকে তুমি সম্বোধন করেছ মেষ বলে।
অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে তুমি আমায় বলেছ যে,
আমি নবী ও আলীর উপর সুপ্রাচীন ভক্তি অব্যাহত রেখেছি।
যার হৃদয়ে আলীর প্রতি এমন শত্রুতাবোধ গুপ্ত রয়েছে,
এই দুনিয়ায় তার চাইতে অপমানিত আর কে আছে?
মনে রেখো, আমি সেই দুই মহাপুরুষের দাস হয়েই থাকবো,
যতদিন না উঠিত হয় প্রলয়-ঝঞ্ঝা,

এবং যতক্ষণ, হে সম্রাট, তুমি আমার দেহকে ছিন্ন ভিন্ন করে না ফেলো
আমি সেই দুই সম্রাটের ভালোবাসা থেকে মুখ ফিরাবো না
ভাববোনা সুলতানের তীক্ষ্ণ তরবারি আমার শিরে উদ্যত হোল কি না?
মনে রেখো, এদের যে শত্রু, সে নিশ্চয় পিতৃপরিচয়হীন,
বিশ্ব-প্রভু তার দেহকে নরকাগ্নিতে দগ্ধ করবেন।
আমি নবীর পরিবার বর্গের দাস,
আমি মাথায় তুলে নিই ওসী[১]র পায়ের ধূলি।

১ যাঁর সম্পর্কে মৃত্যুকালে অনুজ্ঞা করা হয় তিনিই ওসী। শিয়া মতবাদ অনুযায়ী রসুলুল্লাহ (সাঃ) মৃত্যুকালে হজরত আলীকে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করে গিয়েছিলেন।

আমাকে তুমি ভয় দেখিয়ে বলেছো,—
তোমাব দেহকে আমি হস্তীপদতলে পিষ্ট করবো।
আমি তোমার এই ভীতিপ্রদর্শনকে তুচ্ছ জ্ঞান করি,
কারণ, আমাব হৃদয় নবী ও আলীর ভালোবাসায় সমুজ্জ্বল।
'ওহী' ও প্রেরণা-প্রাপ্তজন কি বলেছিলেন, তা শুনে রাখো,
সেই মহাপুরুষ যিনি ছিলেন আদেশ ও নিষেধের প্রভু;
শুনে রাখ, আদেশ নিষেধের সেই মহাপ্রভু কি উচ্চারণ করেছিলেন—
তিনি বলেছিলেন, আমি জ্ঞানের নগরী ও আলী তার সিংহদ্বার,
পযগম্বরের এই বাণী নিঃসন্দেহে সত্য।
আমি এই সত্যবাণীর সাক্ষ্য দান করছি,
বলতে গেলে, সে সত্যবাণী নিয়ত আমার কর্ণে ধ্বনিত
প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

তোমাব জ্ঞান, বুদ্ধি ও সঙ্কল্প যখন পথ পাবে,
তখন তুমিও অনুসরণ করবে নবী ও আলীর পথ।
যদি এই বিশ্বাসই আমার অপরাধ হয়ে থাকে,
তবে জেনে রাখ, এই আমাব ধর্ম, রীতি ও বিশ্বাস।
এই বিশ্বাস নিয়েই আমি জন্মগ্রহণ করেছি এই বিশ্বাসের
উপবই আমি মরবো

জেনে রাখ, আমাব দেহের প্রতিটি অণু হায়দারেরই[২] পায়ের ধূলি।
অপরদের[৩] সম্পর্কে আমাব কিছুই করার নেই,
তাঁদের সম্পর্কে আমার বলারও কোন প্রয়োজন পড়ে না।
মাহ্‌মুদ যদি এই সত্য থেকে নিজেকে দূরে রাখে,
তবে একটি যবেব সঙ্গেও তার বুদ্ধির পরিমাপ হবে বলে
আমি মনে করি না।

যদি আল্লাহ তাকে সিংহাসনে বসিয়ে থাকেন,
তবে পরলোকে যে নবী ও আলী রয়েছেন, তাদেরই তা দান।

---

২ হায়দর—হজরত আলী (রাঃ)র গুণবাচক পদবী।
৩ অপর তিন খলিফা—হজরত আবু বকর, উমর ও উসমান (রাঃ)।

আমি যদি বর্ণনা করি তাঁদের দয়ার কাহিনী,
তবে তদ্দ্বারা মাহমুদেরই শত পক্ষপাতিত্ব করা হয়।
দুনিয়া যতদিন থাকবে ও তাতে অবস্থান করবেন নরপতিগণ,
আমাব বাণী তাঁদেব কাছে পর্যন্ত গিয়ে পৌছবে।
তাঁরা বলবেন, তূস নগরেব অধিবাসী অভিজাত ফেরদৌসী
এই 'শাহনামা' মাহমুদেব নামে উৎসর্গ করেননি।
জেনে রাখ, নবী ও আলীব নামেই উৎসর্গ করেছি এই 'নামা'[8]
বহু অর্থময বাণীর মুক্তা আমি এতে গ্রথিত করেছি।
যদি পৃথিবীতে ফেবদৌসীব জন্ম না হোত,
তবে তরুতে উদ্গত হোতনা বদান্যতার কিশলয়।
যদি এই কাহিনীব দিকে আমি দৃষ্টিপাত না করতাম,
তবে তা মিথ্যাবাদীদের দ্বারা অন্যপথে পরিচালিত হোত।
যারা আমার এই কবিতাকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে,
আবর্তমান আকাশ তাদেরকে হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যাবে না।
আমি এই কাব্যে প্রাচীন সম্রাটদের কাহিনীব মাধ্যমে
নিজেদেরই কথা সূক্ষ্মভাবে বর্ণনা করেছি।
আমাব বযস যখন আজ আশির সন্নিকটবর্তী হয়েছে,
তখনই আমার সকল আশায় ছাই পড়লো।
আজ মনে হচ্ছে, দুনিযার এই সবাইখানায এত বছর ধরে
বৃথাই আমি স্বর্ণ-সম্পদের আশায এমন কষ্ট-সহ্য করেছি;
এই কাহিনীতে আমি ত্রিশ হাজার শ্লোকের পানপাত্র
আবর্তিত করেছি,
তাতে কীর্তিত হয়েছে রণক্ষেত্রের রীতি-নীতি;
আমি এতে বর্ণনা করেছি তীরধনুক ও পাশের কথা,
প্রহরণ ও তরবারির কার্যকারিতার কথা এতে ব্যক্ত হয়েছে।
এতে আছে, বর্ম, অনুত্রাচ, ও শিরস্ত্রাণ,
আছে, অরণ্য ও সমুদ্র, আছে মরুভূমি ও বহতা নদী;
নেকড়ে, সিংহ, হস্তী ও ব্যাঘ্রের কথাও এখানে রয়েছে,
দৈত্য, আজদাহা ও নক্রের রূপকথাও স্থান পেয়েছে এতে।

---

8 শাহনামা।

এতে আছে, মন্ত্রোচ্চারণকারীদের মন্ত্র ও দৈত্যদের ইন্দ্রজাল,—
যাদের গর্জন বায়ুরাশিকে দীর্ণ করেছে।
যুদ্ধের দিনে শক্তি পরীক্ষায় যেসব বীর
তাঁদের বীরত্ব ও ঔদ্ধত্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন,
সেই সব খ্যাতনামা ও পরম সম্মানিত পুরুষদের কাহিনীও
বর্ণিত হয়েছে এই কাব্যে,

তাঁদের মধ্যে রয়েছেন, তূর, সুল্‌ম ও আফ্রাসিয়াবের
মতো নরপতি;

রয়েছেন ফারেদূন ও কায়কোবাদের অনুরূপ বাদশাহ,
জোহাকের মত বিধর্মী, অত্যাচারী ও অসভ্য সম্রাটের কথাও
এতে আছে।
আরো আছেন, গার্‌শাসপ ও নরীমান পুত্র সামের মতো বীর—
যাঁরা বিশ্ববিখ্যাত পুরুষদেরকেও পরাভূত করতে সক্ষম হয়েছেন।
হোশঙ্গ ও দৈত্যদমন তহমূরসের কাহিনীও এতে আছে,
আছে, মনুচেহের ও সমুচ্চ সম্রাট জমশেদের কীর্তিগাথা।
কায়কাউস ও কায়খসরুর মতো মুকুটধারী সম্রাট
এবং রুস্তম ও ইস্‌ফন্দিয়াবের অনুরূপ সেনাপতিদের কাহিনীও
বর্ণিত হয়েছে এই 'নামায়'।

গোদরজ ও তাঁর বীর্যবন্ত আশি পুত্র
এবং অগণন যুদ্ধজয়ী বীরাগ্রগণ্যদের কীর্তিগাথাও বর্ণিত হয়েছে।
স্বনামধন্য সম্রাট লুহ্‌রাস্‌প,
সেনাপতি জরীর ও বাদশাহ গুশ্‌তাস্‌প,
জামাস্‌পের মতো জ্ঞানী,
যাঁকে প্রজ্জ্বলন্ত সূর্যের চাইতেও অধিক উজ্জ্বল বলে অভিহিত করা যায়,
দারাব্‌-পুত্র দারা ও হুমায়পুত্র-বহ্‌মন,
সিকান্দর, যিনি সম্রাটদেরও সম্রাট ছিলেন,
নরপতি আরদেশীর ও বাদশাহ শাপুর,
বাহ্‌রাম ও পুণ্যশীল নওশেরওয়ান;
পারভেজ, হরমুজ ও তৎপুত্র কোবাদ,

খসরু যাকে খসরু পারভেজ বলা হোত,—
এইসব পরাক্রান্ত ও উচচশীব সম্রাট
যাঁদেব কাহিনী এখানে আমি বর্ণনা করছি;
তাঁবা সবাই দীর্ঘদিন পূর্বে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন,
কিন্তু আমাব এই কাহিনীব মধ্যে তাঁবা লাভ কবেছেন নবজীবন।
ঈসাব[৫] অনুরূপ আমি এইসব মৃতব্যক্তিকে
তাঁদেব কীর্তিসহ নতুন জীবন দান করেছি।
এমন এক দাসত্ব আমি কবেছি, হে সুলতান,
যা তোমাব নামেব সঙ্গে দুনিযায স্মৃতি হিসেবে বক্ষিত হবে।
এব সংবাদ যেখানেই গিযে পেঁৌছবে, সেই জনপদই হবে বিনষ্ট,—
তা বৌদ্রদীপ্ত হোক কিংবা বর্ষণসিক্ত।
তোমাব সমুন্নত বাজপ্রাসাদেব দিকে চেযে আমি বচনা কবেছি যে কবিতা
ঋতুব পবিবর্তন তাব কোন ক্ষতি কবতে পাববে না।
এই কাব্য সম্পূর্ণ কবতে অতিবাহিত হযে গেছে, আমার সারাজীবন
এ সত্য স্বীকাব কববেন যে কোন জ্ঞানী।
কিন্তু পবিণাম যে এমন হবে, তাব আভাস তুমি দাওনি,
আব আমাব নিজেব মনেও সুলতান সম্পর্কে এমন কোন ধারণার
অস্তিত্ব ছিল না।

সুতবাং অকল্যাণকামী ব্যক্তিব জন্য কখনো সুদিন আসবে না,
প্রশংসাসূচক বাণী তাব জন্য পবিবর্তিত হবে অপবাদে।
সুলতানের জন্য আমার এই তনুকে আমি বিরূপ করেছি,
হায়! অবুঝের মতো আমি হাতে নিয়েছিলাম প্রজ্জ্বলন্ত অঙ্গার।
যদি ন্যাযপরায়ণতা তাব নির্ধারিত পথ অনুসরণ করতো,
তবে এই কাহিনীব মধ্যে তুমি অবশ্যই মনোনিবেশ করতে পারতে;
এবং বলতে পারতে, কিভাবে গ্রথিত হয়েছে এই বাণীগুলি,
এবং কিভাবে আমি এদের মধ্যে ঘটনা ও প্রকৃতিকে করেছি সুবিন্যস্ত।
বাণীর মাধ্যমে ধরিত্রীকে আমি ফুলবনের অনুরূপ করে সাজিয়েছি,
আমার পূর্বে বাণীর এমন বীজ কেউ আর বপন করতে পারেনি।

---

৫ হজরত ঈসা (আঃ) যিনি মৃতদের জীবন দান করতেন।

অগণিত কবি জন্মেছেন এই পৃথিবীতে,
তাঁরা সংখ্যায় অনেক ছিলেন তাও স্বীকার করি,
কিন্তু একথা নিশ্চিত যে, এমন করে কেউ আর বলতে পারেননি।
দীর্ঘ ত্রিশ বছ্ব ধরে বহু পরিশ্রমের পব
এই পারসী গ্রন্থ দ্বারা ইবানকে আমি পুনরুজ্জীবিত করে গেলাম।
সুলতান যদি (স্বভাবে) দরিদ্র না হতেন,
তবে আমাকে আজ সিংহাসনে বসানো হোত।
কাজেই আশা করবো, কোন নরপতির মধ্যে যেন দীনতাব অস্তিত্ব
মাত্র না থাকে,
পৌরুষের সঙ্গে যেন দাবিদ্র্যেব সহ-অবস্থান না ঘটে।
প্রজ্ঞাব উপর সুলতানেব ছিল না কোন অধিকাব,
থাকলে তিনি আমাকে আজ নিশ্চিতই সিংহাসনে বসাতেন।
সিংহাসনের অধিকারী যদি অভিজাত না হয,
তবে সিংহাসনধারীগণের স্মৃতি তার মনে উদিত হতে পারে না।
সুলতানেব পিতা যদি সুলতান হতেন,
তবে আমার শিরে আজ রক্ষিত হোত স্বর্ণমুকুট
যদি সুলতানের মাতা কোন রাজপরিবারের কন্যা হতেন,
তবে আমাকে জঙ্ঘাদেশ পর্যন্ত প্রোথিত করা হোত
স্বর্ণ রৌপ্যের স্তূপের মধ্যে
যদি বংশমধ্যে মহাত্ম্য না থাকে,
তবে মহত্ত্বের লক্ষণ সেখানে কেমন করে প্রকাশ পাবে?
হে 'উঁচু বংশীয় নবপতি মাহমুদ, তোমাব মুখে থুথু!
নবম সংখ্যা ন'য়ের মধ্যেও তিনের সংখ্যা চারের মধ্যেই
স্থান করে নিতে পারে।
যখন ত্রিশ বছর 'শাহনামা'র উপর পরিশ্রম করছিলাম,
তখন আশা করেছিলাম, সুলতান আমাকে প্রতিদানে দিবেন স্বর্ণসম্পদ।
এবং সেই সম্পদ দ্বারা দুনিয়ায় তিনি আমাকে অভাবমুক্ত করবেন,
ও বীরবৃন্দের মধ্যে সমুন্নত করবেন আমার শির।
কিন্তু যখন পারিতোষিকের জন্য উন্মুক্ত হোল রাজকোষ,
তখন সেখানে থেকে আমার জন্যে এলো না তুল্যমূল্য
পারিতোষিক।

রাজকীয় সম্পদ থেকে যদি যবই আমার লভ্য হয়,
তবে সেই যব দ্বারা আমি পথকেই ক্রয় করে নেবো।
এমন এক নরপতির সান্নিধ্যের চাইতে একটি তাম্রমুদ্রার সহবাস
শ্রেয়তর,—
যে-নরপতির না আছে চরিত্র না রীতি না ধর্ম।
দাসীর গর্ভে যার জন্ম, তার দ্বারা মহৎকাজ সম্ভব হয় না,
যতই তার পিতা রাজ্যাধিপতি হন না কেন!
অযোগ্য ব্যক্তিদের শির সমুন্নীত করা,
ও তাদের কাছে কল্যাণের আশা করা,
বস্তুত: নিজের আত্মার সঙ্গে সম্পর্ক সূত্র ছিন্ন করারই অনুরূপ,
এবং স্বীয় বস্ত্রাঞ্চলে লুকিয়ে সর্প প্রতিপালনের মতোই ক্ষতিকর।
যে বৃক্ষের সৃষ্টিতেই রয়েছে তিক্ত বীজ,
তাকে যদি স্বর্গোদ্যানেও রোপণ করা হয়,
এবং স্বর্গীয় স্রোতস্বিণীর পানি যদি তার মৃত্তিকায় সিঞ্চন করা হয়,
এবং গোড়ায় প্রয়োগ করা হয় মধু ও অমৃত;
তবুও পরিণামে তার স্বরূপ আত্মপ্রকাশ করবে
ও তার সকল ফলই হবে তিক্ত।
তুমি যদি সুগন্ধী আতর-বিক্রেতার পাশ দিয়ে যাও,
তবে তোমার পোশাকে আতরের সুগন্ধ সঞ্চারিত হবে।
অন্যপক্ষে, তুমি যদি লৌহকারের দোকানে গমন কর,
তবে, সেখান থেকে পাবে শুধু ধূম্রের কালিমা।
মন্দ যার মূলে রয়েছে, তার মধ্যে মন্দের আবির্ভাব
দেখে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই,
রাত্রি থেকে অন্ধকারকে বিযুক্ত করা সম্ভব নয়।
অনভিজাত ব্যক্তির কাছে কখনো ভালো আশা করো না,
কারণ, কৃষ্ণকায় মানুষ কখনো স্নান দ্বারা শুভ্রতা লাভ করে না।
যার মূল ভালো, তারই উপর কর দৃষ্টিপাত,—
তাতে তোমার দু'চোখ আনন্দে ভরে যেতে পারে।
বিশ্বস্রষ্টা তাকে যে-ভাবে তৈরী করেছেন, সে তেমনই হবে,
স্রষ্টা স্বয়ং যে-দ্বার বন্ধ করেন, তার কুঞ্জিকা তুমি খুঁজে পাবে না।

মাহাত্ম্য এমন এক বস্তু যা কথার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে না,
শত শত উক্তি একটি কর্মের অর্ধেক মর্যাদাও পেতে পারে না।
সেই রাজ্যাধিপতিই খ্যাতির অধিকারী,
যিনি প্রজ্ঞাকে তাঁর মহৎ কর্মের পরিচালকরূপে প্রত্যক্ষ করেন।
তুমি সম্রাটদের সদাচারের কাহিনী আরো শুনেছো,
তাঁদের চিরাচরিত রীতি নীতির কথাও সম্ভবতঃ অবগত আছ।
সে-ভাবেই যদি আমার দিকে দৃষ্টিপাত করতে
তবে আজ আমার দিনগুলি এমন করে ব্যর্থ হোত না।
এই বলে আমি সমুন্নত যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণ করলাম,
যাতে সুলতান এ থেকে গ্রহণ করতে পারে উপদেশ।
অতঃপর মানুষ যেন জানতে পারে, কথার শক্তি কতটুকু,
গ্রহণ করতে চেষ্টা করে প্রাচীন দিনের বৃদ্ধের উপদেশ।
এবং অন্যসব কবিকে সে যেন (সুলতান মাহমুদ) প্রতারিত করতে না পারে,
আর কবিগণ নিজেরাও তাঁদের সম্ভ্রম সম্পর্কে সচকিত হন।
কবিগণ যখন ব্যথা পান, তখন তাঁরা উচচারণ করেন নিন্দাসূচক কবিতা,
এবং রোজ কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকে সেই ব্যঙ্গোক্তি।
অতঃপর আমি পবিত্র বিশ্ব প্রভুর দরবারে নিবেদন করছি আমার রোদন
এবং স্বীয় মস্তকে নিক্ষেপ করছি ধূলিরাশি।
হে প্রভু, তার প্রাণকে তুমি অগ্নিতে দগ্ধ কর,
এবং প্রাপ্যজনের হৃদয়কে কর তদ্দ্বারা আলোকিত।

অপবাদসূচক এই কবিতায় ফেরদৌসী এমন কয়েকটি কথা বলেছেন, যা দিয়ে আমরা সুলতানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, 'শাহনামা' রচনা শেষ করার সময় কবির আয়ুষ্কাল, দু'চারটি শ্লোকে শাহনামার বিষয়বস্তুর পরিধি, ফেরদৌসীর শিয়া মতবাদ পারিতোষিক দানের সময় বিবেচিত হওয়ার বিষয় ও সর্বোপরি 'শাহনামা'কে' সর্বযুগের একটি মহৎ কাব্যকীর্তি হিসাবে ছেড়ে যাওয়ার প্রত্যয় আর সেই সঙ্গে কবির আত্মমর্যাদাবোধ ইত্যাদি বহু বিষয়ে জানতে পারি। ষাট হাজার স্বর্ণমুদ্রার কাহিনীটি সম্ভবতঃ একটি কাহিনীই। কবি বস্তুতঃ তার আশানুরূপ পারিতোষিক না পাওয়ায় যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন, তারই প্রতিক্রিয়ায় সুলতানের দিক থেকে কবির উপর বর্ষিত হয়েছিল

তিরস্কার এবং তার ফলই কবির আত্মমর্যাদাবোধকে আহত করেছিল। সুলতানের নিন্দাসূচক এই কবিতাটি কবির সেই প্রতিক্রিয়াকেই প্রকাশ করছে।

ঐতিহাসিক সূত্র থেকেও জানা যায় যে, ১০১০ খ্রীষ্টাব্দে ফেরদৌসী তাঁব 'শাহনামা' শেষ করেছিলেন। কবি যে দীর্ঘদিন ধরে গজনী অধিপতি মহাপবাক্রান্ত ও গুণগ্রাহী সুলতান মাহমুদেব রাজসভা অলঙ্কৃত করেছিলেন, সেটিও পুবাপুরি ঐতিহাসিক সত্য। ফেরদৌসী ইরানের তূস-নগরে এক সম্ভ্রান্ত 'দিহকান' পরিবারে জন্মগ্রহণ কবেছিলেন। 'দিহকান' শব্দটির প্রতিশব্দ মূলতঃ চাষী। কিন্তু কালক্রমে ভূমির উপর নির্ভরশীল গ্রাম্যভূস্বামীগণই দেশে গ্রামীণ সভ্যতাব চূড়ারূপে স্বীকৃতি লাভ কবেন; তাঁরাই হন ভূম্যধিকাবী ও অভিজাত। বিলাস-ব্যসনে গা ঢেলে দিলে এইসব অভিজাত ও শিক্ষিত পবিবাবেও অনেক সময দাবিদ্র্যেব অভিশাপ নেমে আসতো; তখন পরিবারের সদস্যগণ জীবিকাব অন্বেষণে বেরিয়ে পড়তেন শহরের দিকে। ফেবদৌসী সম্ভবতঃ তেমনই কোন আত্মমর্যাদাশীল অভিজাত 'দিহকান' পরিবারেব সন্তান ছিলেন।

আগেই বলেছি, 'শাহনামা'য আছে, ফেরদৌসী তাঁব যুগের অশান্ত পরিবেশের জন্য দীর্ঘদিন পর্যন্ত শাহনামা রচনায় হাত দিতে পারেননি। ইরানের পুনরুজ্জীবনের মূলমন্ত্ররূপে পবিকল্পিত ইবানীয় সম্রাট ও বীরবৃন্দের এই কাহিনী রচনার জন্য ইরানেব স্বাধীনতা হবণকারী গজনী-পবিবারের সুলতান মাহমুদ যদি ফেবদৌসীর জন্য তাঁর রাজসভার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়ে থাকেন, তবে. মাহমুদ দাসপুত্র হোন কিংবা আরও যাই হোন, তিনি যে উদার ও গুণগ্রাহী ছিলেন, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। 'শাহনামা'র মধ্যে স্থানে স্থানে ফেরদৌসী সুলতানের গুণকীর্তন করেছেন, স্তুতির অতিবাদ সত্ত্বেও সেখানে যে বাস্তবের প্রতিফলন ঘটেছে, তাতে সন্দেহ করার কিছু নেই।

ফেরদৌসী ১০২০ খ্রীষ্টাব্দে স্বীয় জন্মভূমি তূস নগরেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কথিত আছে, ভারত থেকে কোন এক যুদ্ধশেষে প্রত্যাবর্তন করার সময় উজির হাসান মৈমুন্দী সুলতান মাহমুদের সামনে 'শাহনামা'র একটি শ্লোক আবৃত্তি করেন। শ্লোকটির কাব্যিক সৌন্দর্য সুলতানকে চমকিত করে; তিনি উজিরকে জিজ্ঞাসা করেন, এ-শ্লোক কার রচনা? মৈমুন্দী জানান

যে, হতভাগ্য কবি অভিমান বশে রাজরোষে পতিত হয়েছিল। সুলতান সঙ্গে সঙ্গে কবির গৃহে ষাট হাজার স্বর্ণমুদ্রা পাঠিয়ে দেয়ার আদেশ দিলেন।

সুলতানের অনুচরগণ যখন সেই স্বর্ণমুদ্রাসহ ফেরদৌসীর জন্মভূমি তূসে প্রবেশ করেছিলেন, তখন কবির মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে সমাধি ক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে চলছিলেন তাঁর ভক্তগণ।

সুলতানের পারিতোষিক কবির একমাত্র কন্যার সামনে রাখা হলে, তিনি তা গ্রহণ করেননি বলেও লোক-শ্রুতি প্রচলিত আছে।

[২]

জীবন ও জগৎ ব্যাপকাকারে চিত্রিত হলেও, হোমারের 'ইলিয়ড-'ওডিসি' কিংবা 'রামায়ণ'-'মহাভারত' যে ধরণের মহাকাব্য, শাহনামা সে ধরনের মহাকাব্য নয়। 'ইলিয়ড-ওডিসি' ও 'রামায়ণ-মহাভারত'-এর নিয়ামকশক্তি কাল নয়—স্থান; সেখানে গ্রীস ও ট্রয়, অযোধ্যা ও লঙ্কা, হস্তিনাপুর ও কুরুক্ষেত্রকে কেন্দ্র করেই ঘটনা আবর্তিত হয়েছে; একের পতনে অন্যের মহিমা সেখানে ভাস্বর। অন্যপক্ষে 'শাহনামা'কে নিয়ন্ত্রিত করছে মহাকাল। যে-কালের বহমান স্রোতে ঘটনা ও স্থান মুহূর্তের জন্যে উদ্ভাসিত হয়ে বিলীন হয়ে যায়,—সেখানে রাজা ও রাজবংশের উত্থান-পতনে, বীরের-শৌর্যে ও সম্রাটদের মহানুভবতায় এক মূল্যবোধের উদ্ভব ঘটেছে, এবং শেষ পর্যন্ত তা মানুষের হাতে আসছে উত্তরাধিকারসূত্রে ইতিহাসেরই শিক্ষা হয়ে।

তবুও, আগেই বলেছি, 'শাহনামা' ইতিহাস নয়, কাব্যই। ইতিহাসের অস্থিসংস্থান অতিক্রম করে সেখানে দেদীপ্যমান হয়ে উঠেছে কবির কল্পনা। জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সহায়তায় জীবনের এমন এক প্রবহমানরূপ সেখানে ফুটেছে, যার পটভূমিতে কখনো সমতলভূমি, কখনো পর্বত, কখনো নদী-উপত্যকা, কখনো মরুভূমি, কখনো দীপাবলী সজ্জিত সমুন্নত নগরী। এই পটভূমি ইরান-তূরান-চীন ভারত যাই হোক না কেন, কবি তা অবলীলায় অতিক্রম করে চলেছেন। কালাশ্রিত হয়েও কালাতীত তেমন মূল্যবোধের উপরই স্থাপিত হয়েছে 'শাহনামা'র সৌধ। সত্যের জয় ও মিথ্যার পরাজয়ের উপরই চিরদিন মহৎ কাব্যের বিষয়বস্তু সংস্থিত হলেও, 'শাহনামায়' তা মানবীয়

প্রজ্ঞার কেন্দ্রস্থলে বিরাজ করে প্রত্যেকটি ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করছে; বল্‌কে উজ্জীবিত করছে বীর্যে।

বাহ্যতঃ, এই কাল-প্রাধান্য ও মূল্যবোধকে 'ওল্ড টেষ্টামেন্টের' অনুগামী বলে মনে হতে পারে, কিংবা কাব্যাকারে ইরানের ইতিহাস রচনার প্রয়াস বলেও তাকে ভুল করার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু 'শাহনামা'য় ঘটনার বিশ্লেষণ ও বহুস্থানে কাল সম্পর্কে কবির স্বগতোক্তির দিকে লক্ষ্য রাখলে, সঙ্গতভাবেই বলতে হয় যে, উপরোক্ত দুটি অনুমানের একটিও সত্য নয়। কারণ, ইতিহাসেও কাল সর্বব্যাপী নয়, স্থানের গুরুত্ব সেখানেও যথেষ্ট প্রকট। কবি, স্থান নয়, কালকেই ঘটনার আধার বলে মনে করেন এবং জীবন যে বস্তুতঃ কালেরই মহাদান, এ বিশ্বাসই তাঁর কাব্যকে কালের উপর এমন করে বিস্তৃত করেছে এবং মূল্যবোধকে দান করেছে এমন মাহাত্ম্য। ইয়োরোপের আধুনিক সমালোচকগণ যে 'ইতিহাস-চেতনার' উপর কল্পনার উৎকর্ষকে স্থাপিত করে থাকেন, ফেরদৌসীর মধ্যে সম্ভবতঃ সেই 'ইতিহাস-চেতনা'ই সব চাইতে বেশী কার্যকর ছিল।

'সম্মুখে ঠেলিছে মোরে পশ্চাতের আমি'—এই 'পশ্চাতের আমি' কখনো বৃহৎ, কখনো তার অভিজ্ঞতা দীর্ঘদিনের, কখনো তা চকিতে উদ্ভাসিত বিদ্যুল্লেখার মতো। তাই সভ্যতা সৃষ্টিকারী উন্মুখ মানুষের প্রথম অরণ্য প্রদেশ থেকে বেরিয়ে আসার ভিতর দিয়েই 'শাহনামা'র শুরু। কতকাল মানুষ অরণ্যে স্থির হয়েছিল, কবির তা বিবেচ্য নয়; একটি প্রকট বিদ্যুল্লেখা অর্থাৎ জীবন, কালেরই যা অন্য নাম, তা-ই কেবল কবির চোখে আকর্ষণীয়। এজন্যে কালের এই সঙ্কোচন বিস্তারণকে আমরা, ইতিহাস না বলে, ইতিহাস-চেতনা বলেই অভিহিত করতে চাই।

কাব্যকে কবির প্রদর্শিত পথেই অনুসরণ করতে হয়। 'শাহনামা'র কুশীলবগণের কাউকে যদি হাজার বছর রাজত্ব করতে দেখি কিংবা কাউকে যদি দেখি, তিনি চীনের খাকানকে পরাজিত করে গোটা চীন দখল করে নিয়েছেন, তবে তাতে কাব্য সত্যই বিচার্য হবে, ঐতিহাসিক তথ্যের সত্যাসত্য সেখানে আমরা বিচার করতে যাবো না। তবে, কবি কালের যে-স্রোতে ইরানের শাহানশাহদের জীবন-তরী ভাসিয়ে দিয়েছেন, ইতিহাসে তার

সমান্তরাল রেখাটি কেমন করে এগিয়েছে, কবির অপূর্ব নির্মাণ-কৌশল ও প্রতিভাকে সম্যকভাবে বুঝতে গেলে সে সম্পর্কে অবহিত হতে হবে।

প্রত্নতত্ত্ববিদগণ এ বিষয়ে প্রায় একমত যে, এশিয়া ও ইয়োরোপের সকল জাতিরই আদি বাসস্থান মধ্যএশিয়ায়। কৃষ্ণসাগর ও কাস্পিয়ান সাগরেব উত্তর পূর্বাঞ্চলেই এককালে সেমেটিক, হেমেটিক ও আর্যদের পূর্বপুরুষ একই জাতি হিসেবে বাস করতেন। সেখান থেকেই শত শত কিংবা হাজার হাজাব বছবের ব্যবধানে এক একটি মানব-গোষ্ঠী বেরিযে এসে এশিযা ইয়োরোপেব বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ঐতিহাসিক যুগে সভ্যতায উদ্ভাসিত হযে উঠেছিল।

প্রত্নতত্ত্ববিদদেব এইসব তথ্যানুসন্ধানেব স্বরূপ বিচিত্র। কখনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ (যেমন শিলাস্থি কিংবা গুহাচিত্র), কখনো ভাষাব সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য, কখনো ধর্মীয় বাধা-নিষেধেব প্রকৃতি; কখনো অর্বাচীন কালের তাৎপর্যপূর্ণ কোন কিংবদন্তী তাঁদের তথ্য সংগ্রহেব উপকবণ হিসেবে ব্যবহৃত হযেছে।

'তাওবাতে' (ওল্ডটেষ্টামেন্টের অন্তর্গত তাল্‌মুদ) বর্ণিত হযেছে যে, মহাপ্লাবনের পরে পৃথিবী নতুন কবে বসবাসের যোগ্য হলে নূহের তিনপুত্র সেম, হেম ও জেফেথেব বংশবৃদ্ধি শুরু হয়। নূহের তরী যেখানে এসে লেগেছিল সেই 'আরাবত' পর্বত কোথায় অবস্থিত, বলা সহজ নয়; কারণ ধর্মগ্রন্থের সকল কথাকেই বাস্তবের বর্ণনা হিসেবে গ্রহণ করা ঠিক নয, সেগুলির কিছু কিছু রূপক অর্থাৎ Symbol'ও বটে।

যাই হোক, ইতিহাসে যেসব জাতিকে হেমেটিক, সেমেটিক ও জাফেথীয় অর্থাৎ আর্য বলা হয়, তারা যে কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী অঞ্চলেই এক জাতিরূপে বসবাস করতো, প্রত্নতাত্ত্বিকগণ সে-বিষয়ে একমত। এইসব গোত্র ও মণ্ডলী ইতিহাস পূর্বের অন্ধকার যুগেই জনসংখ্যার চাপে ও খাদ্যের সন্ধানে ক্রমে তাদের আদি বাসস্থান থেকে স্থানান্তরে সরে যেতে থাকে। সর্বপ্রথম যে-মণ্ডলী তাদের আদি বাসস্থান থেকে বেরিয়ে আসে তারা হোল হেমেটিক। উত্তর আফ্রিকার অধিকাংশ অকৃষ্ণাঙ্গ জাতি এদের অন্তর্গত প্রাচীন মিসরীয়দের তারা নিকটতম আত্মীয়। হেমেটিক জাতির বিকশিত সভ্যতার কথা জানা যায় না। এদের পরেই যে মণ্ডলী তার আদি বাসস্থান থেকে বেরিয়ে আসে, তারাই ইতিহাসে সেমেটিক জাতি নামে পরিচিত। নীলনদের তীরবর্তী মিসরীয় সভ্যতা, দজলা-ফোরাতের তীরের ব্যাবিলনীয়

ও এ্যাসিরীয় সভ্যতা এই সেমেটিক জাতিরই দান। জর্ডন-নদী অঞ্চলে যে-হিব্রু গোত্রগুলি প্রাচীন যুগে মানুষের ধর্মীয় চিন্তাধারায় এত প্রভাব বিস্তার করেছিল, তারাও সেই একই সেমেটিক মণ্ডলীর সন্তান। সবশেষে জেফেথিক বা আর্য গোত্রগুলির নির্গমন শুরু হয়। আর্য জাতির যে শাখা সর্বপ্রথম আদি বাসস্থান থেকে বেরিয়ে আসে, তারা ইরানের পশ্চিমাঞ্চল মিডিয়াতে এসে উপনিবিষ্ট হয়। এই মিডিয়দের মধ্যেই 'আবেস্তার' উদ্ভব হয়েছিল। আবেস্তাতেই আলো অন্ধকারের দুই দেবতার পূজার বিধান রয়েছে—কারণ আবেস্তার মতে, আলো-অন্ধকার পাশাপাশিই বিরাজমান, একটি, অন্যটিকে স্থানচ্যুত করতে পারছে না। 'আবেস্তা'-যুগের ভাষার কোন নিদর্শনই আমাদের হাতে আসে নাই। বহু পরবর্তী যুগের বিখ্যাত জরোয়েষ্টার 'আবেস্তার' ধর্মের পুনরুজ্জীবনের জন্যই 'জেন্দ' লিখেছিলেন। এই 'জেন্দ'-এর অস্তিত্ব পরবর্তী যুগে 'জেন্দ' এর ভাষ্য 'জেন্দাবেস্তা' থেকে আমরা জানতে পারি।

অনুমান করা হয়, জেফেথীয় অর্থাৎ আর্যদের যে-শাখা মিডিয়ায় উপনিবিষ্ট হয়, তাদের সঙ্গে আদি বাসস্থানে অবস্থিত আর্যদের বহু যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছিল, সে যুদ্ধের চাপে ও অন্যবিধ সমস্যার উদ্ভবের ফলে আর্যদের শেষ মণ্ডলী সেখান থেকে পূব ইরানে ও তার পূর্বে সিন্ধু তীরের দিকে সরে যায়। আর্যদের এই প্রাচীন শত্রুতার কিছু কিছু প্রমাণ তাদের পরবর্তী কালের সাহিত্যে ও ধর্ম-চিন্তায় প্রতিফলিত হয়েছে। বলা আবশ্যক যে, ইরানের পূর্বাঞ্চলের আর্যগণ মিডিয়গণের ধর্ম ও সংস্কৃতি ধীরে ধীরে নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করেছিলেন এবং সেমেটিকদের একেশ্বরবাদী চিন্তার সঙ্গেও কিছুটা আপোস করে নিয়েছিলেন। তাই, প্রাচীন ইরানের ধর্মীয় চিন্তার সঙ্গে ভারতীয় আর্যদের ধর্মীয় চিন্তার বিরোধ দেখা যায়। ভাষার মূল এক থেকেও সেখানে অর্থের প্রভাবে বৈলক্ষণ ঘটে গেছে। 'অসুর বা আহুরমাজদা' যেখানে ইরানীয়দের প্রধান পূজ্য সেখানে 'আহুর বা অসুর'কে দেব-বিরোধী অসুর বলে চিহ্নিত করেছেন ভারতীয় আর্যগণ; অপরপক্ষে ইরানীয়গণ ভারতীয় আর্যদের 'দেব'কে ঘৃণিত 'দেও' বা দৈত্য রূপে অভিহিত করেছেন।

এদিকে মিডিয়দের সঙ্গে সেমেটিকদেরও যুদ্ধবিগ্রহ প্রায় লেগেই ছিল। কোন এক সময়ে সেমেটিক জাতির অন্তর্গত আসীরিয়গণ কর্তৃক মিডিয়া বিজিত হয়ে দীর্ঘদিন ধরে শাসিত হতে থাকে। মিডিয়া বা প্রাচীনতর আর্য

শাখার এই অধীনতাকালকেই ফেরদৌসী আরব জাতীয় জোহাকের দ্বারা ইরানের অভিভূত থাকার কাল বলে বর্ণনা করেছেন।

আর্যজাতির যে নবতর শাখা পূর্ব ইরানে ও দক্ষিণ ইরানে বিস্তৃত হয়, 'শাহনামায়' তাকেই ইরান বলে অভিহিত করা হয়েছে। মিডিয়া 'শাহনামায়' বর্ণিত রোম বলে এবং বল্খ বোখারা প্রভৃতি অঞ্চলকে ফেরদৌসী তূরান বলে আখ্যায়িত করেছেন।

শাহনামার মতে যে প্রাচীন নরপতি ইরানকে (মিডিয়াসহ) আরবীয় বা সেমেটিক নরপতি সর্পস্কন্ধ ঘৃণিত জোহাকের হাত থেকে উদ্ধার করেছিলেন, তিনি হলেন মহান ফারেদূন। প্রাচীন ইরানীয় সম্রাট জমশেদেরই বংশে তাঁর জন্ম, এই বংশকেই শাহনামায় মহান কেয়ানী বংশ বলে অভিহিত করা হয়েছে। অবশ্য, ফারেদূন ইতিহাসের কোন্ সম্রাটের নাম, তা সঠিক করে বলা সম্ভব নয়। কারণ, ফারেদূন ইতিহাস-পূর্ব কিংবদন্তীর অন্তর্গত বাদশাহ। তাঁর থেকেই সেম, হেম, জেফেথের অনুরূপ মানবধারাগুলি বিনির্গত হয়েছে। তাঁর তিন পুত্র, সুলম, তূর ও এরজকে তিনি তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য ভাগ করে দেন; সুলম পায় রোম, তূর তূরান ও এরজ ইরান। অর্থাৎ এদের অধিকৃত অঞ্চলগুলি এদেরই নামে অভিহিত হতে থাকে।

ঐতিহাসিক যুগে এসে যে দুটি প্রধান সভ্যতা-শক্তির সঙ্গে ইরানের সংঘর্ষ বেঁধেছিল, রোম, তূরান ও ইরানের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধগুলিতে তারই ছায়া পড়েছে।

তূরানের অধিপতি আফ্রাসিয়াব। এই আফ্রাসিয়াবের সঙ্গে ইরানের বাদশা কায়কাউস ও কায়খসরুর যুদ্ধ-বিগ্রহকে উপলক্ষ করেই 'শাহনামা'র এক বিরাট অংশ রচিত হয়েছে। ইরানের জাতীয় বীর রুস্তমের কার্যকালের প্রধান আকর্ষণ এ যুগেই। বাদশাহ কায়খসরুই রোমসহ তূরানের বিস্তীর্ণ অঞ্চল তাঁর অধিকারে আনয়ন করেন। কায়খসরুই সম্ভবতঃ ইতিহাসের দিগ্বিজয়ী সম্রাট মহান কাইরাস cyrus the great (খ্রীঃ পূঃ ৫৪৯—৫২৯)। কায়খসরুর পর থেকে শাহনামার কাহিনী মোটামুটি ইতিহাসের সঙ্গে সমান্তরাল রেখায়ই এগিয়ে গেছে।

'শাহনামা'র এই ঐতিহাসিক পটভূমি বিবেচনার পর, আমরা এবার ফারসী ভাষার উৎপত্তি, তার ধর্মীয় চিন্তার বিবর্তন সম্পর্কে একটা দিক নির্দেশ করেই ক্ষান্ত হবো। শাহনামার পটভূমি বর্ণনায় তার অধিক প্রয়োজন নয়।

ভাষার মধ্যে একটি জাতির পরিচয় যেমন সুপ্ত থাকে, তেমনই তার ধর্মচিন্তার মধ্যেও থাকে তার প্রাণরস ও সংস্কৃতির সঞ্জীবনী শক্তির পরিচয়। প্রাগ্রসর-মানুষ তার ভাষা ও ধর্মীয় চিন্তায় নতুন অনেক কিছু যোগ করে, কিন্তু ঐতিহ্যের খাত বেয়েই যে তার চলা অব্যাহত থাকে, 'শাহনামা' কিংবা তেমন যে কোন জাতীয় কাব্যই এ সত্যকে শক্তির সঙ্গে প্রকাশ করে থাকে।

[৩]

'আবেস্তা' যুগের প্রাচীন ফারসীর কোন নিদর্শন নেই। গ্রীসের প্রথম ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের (খ্রীঃ (পূঃ ৪৮৪—৪২৪) গ্রন্থে সে যুগের কয়েকটি নাম ও একটি মাত্র শব্দের উল্লেখ আছে, সে-ই শব্দটির অর্থ 'কুকুর'। আবেস্তা যুগের ইরানীয়গণ মিডিয়ায় উপনিবিষ্ট থেকে উত্তরাঞ্চলের আর্যদের সঙ্গে দীর্ঘকাল যাবৎ যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিল। তারপর আর্যরা যখন মিডিয়দের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে কিংবা অন্য কোন কারণে পূর্ব দিকে সরে যায়, তখন তারা মিডিয়দের কাছ থেকে নিয়ে যায়, আলো-অন্ধকারের দুই দেবতার ধারণা। এই ধারণার যুগেই আর্যদের মধ্যে দুটি শাখার সৃষ্টি হয় ও তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে; এক শাখা আরো পূর্বদিকে সরে গিয়ে ভারতের সিন্ধু তীরে গিয়ে উপনীত হয় ও অন্যশাখা আফগানিস্তান থেকে দক্ষিণ-ইরানের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। সম্ভবতঃ এই যুগেই পঞ্চনদের তীরে, বৈদিক ভাষা ও বৈদিক ধর্মের উৎপত্তি হয়েছিল; ইরানে প্রাচীন ইরানীয় ভাষার বিকাশ ও এই যুগেরই ঘটনা। প্রাচীন ইরানীয় ভাষার সকল নিদর্শন আলেকজাণ্ডার কর্তৃক খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল বলে যে কাহিনী প্রচলিত আছে হেরোডোটাসের সাক্ষ্য তার সপক্ষে নয়। কারণ 'পহলবী' নাম নিয়ে সে-ভাষা মুসলিম বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত ইরানের রাজভাষা ও ধর্মীয় ভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। সে-ভাষা মধ্য পারসী; জরদাশ্তের (যরোয়েষ্টারের) 'জেন্দ'-এর গাথাসমূহ ও তদীয় ভাষ্য 'জেন্দাবেস্তা'ও এই পাহলবী ভাষায়ই রচিত হয়েছিল। ভাষাতাত্ত্বিকগণ জেন্দ-এর যে গাথাগুলিকে বৈদিক ভাষায়রচিত ঋগ্বেদের সমসাময়িক বলে গণ্য করেছেন, সেই প্রাচীন পারসিক ভাষার কোন নিদর্শন মূলতঃ নেই। জেন্দ-এর গাথা থেকে দু'টি শ্লোক ও ঋগ্বেদ থেকে দুটি শ্লোকের অনুবাদ পাশাপাশি

রাখলেই বুঝতে পারা যাবে যে, 'জেন্দাবেস্তা'র ধর্মীয় চিন্তায় অনেক প্রাগ্রসর যুগের মানস-চিহ্ন অঙ্কিত রয়েছে।

'জেন্দ'-এর গাথা থেকে—

হে আহুরমাজদা। আমি বিবেকের মাধ্যমে আপনার নিকটবর্তী হচ্ছি। আমাকে দান করুন উভয় সত্তাব চেতনা—ভৌতিক সত্তা ও আত্মা-সত্তা; এবং আত্মা-সত্তাই উন্নততর সত্য। উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি এই উভয়েব মাধ্যমেই ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য সত্যকে সমুন্নত করে রাখেন।

'ঋগ্বেদ' থেকে —

হে ভগবান, আপনার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে আমরা যেন রিপুজয়ী হই; রিপুগণের সঙ্গে নিত্য সংঘটিত সংগ্রামে আমাদের বরণীয় শ্রেষ্ঠগণকে উৎকর্ষের সঙ্গে রক্ষা করুন। হে ভগবান ইন্দ্রদেব! পরমার্থরূপ শ্রেষ্ঠ ধনকে আমাদের জন্য সুলভ করুন। রিপুগণের বীর্যসমূহকে সর্বথা ভঙ্গ করুন—প্রকৃষ্টরূপে নাশ করুন। রিপুগণের সঙ্গে সংগ্রামে আমাদের জয়যুক্ত করুন এবং আমাদের সত্ত্বভাবসমূহকে অবিকৃত রাখুন।

অনুবাদগুলিতে ভ্রাতৃসম দুটি আর্যজাতির চিত্তবৃত্তির এমন প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় যে, স্থান ও কালের দূরত্বের মধ্যেও তারা যে পরস্পরের আত্মীয় চিনে নিতে কষ্ট হয় না।

'জেন্দ'-এর উদ্ধৃতির মধ্যে দেখা যায় যে, আহুর মাজদাই ইরানীয়দের একমাত্র উপাস্য,—হিব্রু ধর্মের প্রভাবে সেখানে একেশ্বরবাদী মনোভাবের স্ফূরণ হয়েছে। ফলে দেহ ও আত্মার সমবিকাশই সেখানে কাম্য। পাপ অর্থাৎ দেহকে সেখানে ধ্বংস করার প্রার্থনা জানান হয় না।; প্রার্থনা করা হয় কর্ম ও ন্যায়ের মধ্যে যেন তাকে অবিচলিত রাখা হয়।

অপরপক্ষে 'ঋগ্বেদের' উদ্ধৃতিতে শত্রুরূপ দেহকে বিনষ্ট করে আত্মার উদ্বোধন কামনা করা হয়েছে। প্রকৃতির মধ্যে উপাস্যের (ইন্দ্র) সন্ধান সেখানে শেষ হয়নি বলে, ব্যক্তি-সত্তার প্রতিষ্ঠিত কোন একক উপাস্যের ধারণার জন্মলাভ হয়নি।

বস্তুতঃ ভারতীয় ধর্ম-চিন্তায় অনাবিল একেশ্বরবাদ কোন যুগেই বিকশিত হয়নি। সর্বেশ্বরবাদ ও প্রকৃতিপূজা সেখানে পাশাপাশি চলেছে। ইরানের পশ্চিম সীমান্তবর্তী হিব্রু গোত্রগুলির মধ্যেই সর্বপ্রথম একেশ্বরবাদী চিন্তা এক সুসংহত দর্শনরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল খ্রীষ্টজন্মের প্রায় হাজার বছর পূর্বে।

বেসতূন পাহাড়ের গায়ে ক্ষোদিত মহান দারার যে নির্দেশাবলী আবিষ্কৃত হয়েছে, সেগুলিকে পণ্ডিতগণ প্রাচীন পারসীরই নিদর্শন বলে গণ্য করেন, হেরোডেটাস তাঁর গ্রন্থে যার একটিমাত্র শব্দ ব্যতীত অন্য কিছুর অস্তিত্ব লক্ষ্য করেননি। যাই হোক, পূর্বে বলা হয়েছে যে, জীবিত ভাষা রূপে যে পহলবী মুসলিম-বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত ছিল, তারই নিদর্শন 'জেন্দাবেস্তায়' পাওয়া যায়। তাই, মুসলমানগণ কর্তৃক আলেকজাণ্ডারের মতই পারসী-ভাষা ও তার সাহিত্য সমূলে বিনষ্ট করার যে অপবাদ প্রচলিত আছে, তা সত্য নয়। সত্য এই যে, আরব অভিযানের পর অভিজাতগণসহ গোটা ইরানের ধর্মান্তরিত হওয়ার কারণে পাহলবী ভাষায় যে পরিবর্তন আসে, তাকে ভাষা-তরুর নব অঙ্কুরোদ্গম বলে অভিহিত করা চলে। নতুন ধর্মের উপাসনারীতি ও নতুন-চিন্তার উপকরণের প্রকাশক হিসেবে আরবী শব্দের আমদানী যখন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠলো তখন নতুন উৎসাহে বর্ণমালা ও নির্দিষ্ট হোল পহলবীর জন্যে। দেখতে দেখতে নতুন খাতে প্রবাহিত পাহলবী ভাষা তীর প্লাবনী হয়ে উঠলো। ইরানের জন্য নতুনের প্রবর্তন ও আরবের এই সংশ্রব হোল ভাগ্য-প্রসূ। দেখতে দেখতে ফারসী সাহিত্যে সৃষ্টির বান ডাকলো। খ্রীষ্টীয় দশ শতকের পর থেকে ফারসী সাহিত্যের যে ফসল সংগ্রহ শুরু হোল, তা দুনিয়ার যে কোন সমৃদ্ধ সাহিত্যের ঈর্ষার সামগ্রী। ইরানের মার্ভ প্রদেশে আব্বাস নামীয় এক কবি নবম শতকে বাদশাহ হারুনুর রশীদ ও মামুনের উদ্দেশ্যে প্রশস্তিসূচক ফারসী কবিতা রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়। তাহিরী-বংশীয় নরপতিদের রাজসভায় বহু ইরানীয় কবি ফারসী কাব্যের পুনরুজ্জীবনে ব্রতী হয়েছিলেন; ইতিহাস তাঁদের বাণীও সযত্নে রক্ষা করেছে। তারপরে, ফেরদৌসীর পূর্ববর্তী কবিদের মধ্যে 'শাহনামা'র অংশ বিশেষের আদি রচয়িতা হিসেবে কবি দাকীকীর নাম স্মরণীয় হয়ে আছে।

ফেরদৌসীর 'শাহনামা' ইরানীয় সাহিত্যকে যে-প্রকাশভঙ্গী ও মননশীলতার অধিকারী করে গেলো, তারই ধারা অনুসরণ করে গণিতজ্ঞ ও দার্শনিক ওমর খৈয়াম রচনা করলেন তাঁর কালজয়ী 'রুবাইয়াৎ', নিজামী তাঁর 'সিকান্দরনামা' ও 'য়ুসুফ-জোলেখা', প্রাচ্যের সেক্সপীয়র শেখ সা'দী তাঁর 'গুলিস্তাঁ' 'বুস্তাঁ' ও রুমী তাঁর বিখ্যাত 'মসনবী'।

ফারসী ভাষা তখন থেকেই এক আন্তর্জাতিক ভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত

হয়েছিল। ভারতের আমীর খসরু তাঁর গীতি-কবিতার মাধ্যমে ইরানের মহত্তম কবিদের অন্তর্গত বলে বিবেচিত হয়েছিলেন ; শিরাজের কবি হাফেজের গজলরসে সুদূর বাংলাদেশেও রসের বান ডেকেছিল। বাংলার এক সুলতানের দরবারে আমন্ত্রিত হয়ে বাংলার মর্ম সাধনার দিশারী কবি চণ্ডীদাস হাফেজের গজল-সুধা পান করেছিলেন বলেও জানা যায়।

ফারসী ভাষা ভারতের রাজভাষার মর্যাদা পেয়ে প্রায় চার হাজার মাইল-ব্যাপী এক বিরাট এলাকার মানুষের সাহিত্য-সৃষ্টির প্রধান উপকরণ হয়ে দেখা দিয়েছিল। ফলে, ইরান থেকে এতদূরে অবস্থিত যে-বাংলাদেশ ইরানের অন্যান্য কাব্যের সঙ্গে ফেরদৌসীর 'শাহনামা'ও সেখানে পল্লীর ঘরে ঘরে পঠিত ও আলোচিত হতো। তার প্রভাবে পল্লীর কবিদের দ্বারা 'সোহরাব রুস্তমের' মর্মন্তুদ কাহিনী পরিবেশিত হতে থাকে বাংলার ঘরে ঘরে। মধ্য-যুগের বাংলা-সাহিত্যে যে মানবিক রসের উদ্বোধন হয়, তাতেও পড়ে ফারসী সাহিত্যেরই সরাসরি কিংবা অন্যবিধ প্রভাব। বাঙালী-মনে 'শাহনামা'র আবেদন যদি এমনভাবে ঐতিহ্যগত হয়ে না থাকতো, তবে সম্ভবতঃ বর্তমান অনুবাদেব তেমন কোন আবশ্যকতা অনুভূত হোত না। ফাবসী সাহিত্যের সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষ শত শত বছর ধরে পবিচিত।

'শাহনামার' কাহিনীও এদেশে কত না রূপে পরিবর্তিত বিবর্তিত হয়ে বিরাজ করছে।

এবার পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা 'শাহনামা'র কাহিনী সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু আলোচনা করব।

[৪]

শাহনামার কাহিনী শুরু হয়, ইরানের প্রথম বাদশা কায়ুমুরস্ দ্বারা। ব্যাঘ্র চর্ম পরিহিত অবস্থায় পর্বত থেকে তিনি এসেছিলেন। পর্বত থেকেই আসতো তাঁর জীবিকা, নূতন নূতন খাদ্য ও পরিধেয়। কবি বলেন,—

> সূর্য যখন সিংহরাশির চক্র-সীমায় এসে উপস্থিত হোল,
> তখন পৃথিবী প্রদক্ষিণরত হোল সৌভাগ্য, সমারোহ ও
> নিয়ম শৃঙ্খলাকে ঘিরে।

মেষরাশিতে তার ঔজ্জ্বল্য আরো বর্ধিত হোল,
পৃথিবী উপনীত হোল যৌবন-সীমায়।

পৃথিবীর এই যৌবন, মানুষেরই যৌবন। মানুষ যখন সভ্যতায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে স্থির হোল, তখনই প্রয়োজন হোল রাষ্ট্রের ও নিয়ম শৃঙ্খলার। কায়ুমুরস্ এই দু'টিকেই প্রতিষ্ঠিত করলেন,—

সিংহাসনারূঢ় বাদশার রূপ ছিল ভুবন-মোহন,
যেমন দেবদারুর মাথায় শোভা পায় পূর্ণচন্দ্র।

বাদশার রূপ যেমন ভুবন-মোহন, তাঁর দয়াও তেমনই। তাই,—
হরিণাদি চতুষ্পদ তাঁর দৃষ্টি দ্বারা আকর্ষিত হোত,
বনভূমি ছেড়ে তারা আসতো তাঁর কাছে বিশ্রাম লাভের আশায়।

তারা এসে অবনমিত হোত রাজাসনের পদতলে
আর তার থেকে বাদশার সৌভাগ্য ঊর্ধগামী হোত
সহস্র শিখায়।

প্রকৃতির সঙ্গে তখনো মানুষের সম্পর্ক কর্তিত হয়নি। বাদশার ঐশ্বর্য ও প্রতাপ যে মূলতঃ প্রজাকুলের স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্যের উপর, কবি কাব্যের সূচনাতে প্রথম কয়েকটি শ্লোকেই তা বলে দিলেন।

তিনি বললেন, এই আনুগত্য থেকেই সূচনা ধর্মের—

উপাসনার রীতি সেই থেকেই প্রচলিত হয়েছিল,
সেখান থেকেই ধর্ম ছাড়িয়েছিল তার শিকড়।

কায়ুমুরস মানুষের রাজা, স্বভাবতঃই আলোর দিকে তাঁর যাত্রা; কিন্তু দীর্ঘদিন যেতে না যেতেই অন্ধকারের পূজারী 'দেওঁ' (সংস্কৃতে 'দেব' শব্দের অর্থ-বৈলক্ষণ্য লক্ষ্যযোগ্য) বা দৈত্যদের সঙ্গে বাধলো তাঁর বিরোধ। সেই বিরোধে আত্মদান করলো বাদশার পুত্র সিয়ামক। প্রজাবৃন্দসহ রাজা পরাজয়ের শোকে নিমজ্জিত হলেন। কিন্তু বেশীদিন নয়, বিশ্বপ্রভু তাদের ডাক দিলেন—

শুভসন্দেশবাহী আকাশবাণী হোল,
ক্রন্দন আর নয়, এবার আত্মস্থ হও।

সেনাদল সজ্জিত কর, মান্য কর আমার ফরমান,
নিজ নিজ চক্র থেকে বেরিয়ে এসো সবাই।
দুষ্ট দানবের অত্যাচার থেকে ধরিত্রীবক্ষ পবিত্র কর,
সজ্জিত কর তাকে সকল সুষমায়।

সিয়ামক-পুত্র হোশঙ্গের হাতে নির্জিত হোল দৈত্যরাজ কিন্তু তখনও মানুষের জীবনরীতি ছিল, সভ্যতার আদি স্তরে। তবে কৃষিকার্য নিশ্চিত হোল, মানুষের ইচ্ছাশক্তিরও কিছুটা জয় সূচিত হলো। তবুও এ-সময়ে যে বিষয়টি, 'শাহ্‌নামা'র কবির কাছে সব চাইতে বেশী অর্থপূর্ণ মনে হয়েছে তা হোল, অগ্নি—সকল শিল্প-কৌশলের সৃষ্টির মাধ্যম ও প্রাচীন ইরানীয়দের কাছে দৈব-শক্তির প্রতীক। এই অগ্নি একদিন বহুরূপী দৈত্যগণের সঙ্গে সংগ্রামরত হোশঙ্গের চোখে, আকস্মিকভাবে প্রকটিত হোল—

বাদশা প্রকাণ্ড এক প্রস্তর খণ্ড দিয়ে তাকে (সর্পরূপী দৈত্যকে)
আঘাত করলেন,
ক্ষুদ্র এক পাথরের সঙ্গে তা প্রহত হোল।
দুই পাথরের ঠুকাঠুকিতে নিঃসৃত হোল আলো,
চেতনার দর্পণে পড়লো তার প্রতিবিম্ব।
কিন্তু সব চাইতে উল্লেখযোগ্য যা, তা হোল এই,
সাপ মরলো না কিন্তু সেই আগুনের রহস্য
পাথর থেকে জন্ম নিয়ে ছড়িয়ে পড়লো মানুষের মনের
সর্পিল পথে পথে।

অন্ধকারের জীবেরা রয়েই গেল, দুনিয়ায়, আলোর সন্তানদেরকে তাদের সঙ্গে যুদ্ধে সক্রিয় হতে হবে। এরই মধ্যে জন্ম নিবে, নীতি, ন্যায়বোধ, কলা-কৌশল, বীর্য-বত্তা ও করুণা। 'শাহনামা'র পরবর্তী কাহিনী ন্যায়-অন্যায়ের এই দ্বন্দ্ব ও রহস্যকেই বিচিত্রভাবে রূপায়িত ও রসায়িত করেছে। অন্যান্য 'মহাকাব্যের' মতো স্বর্গ-মর্ত্য-নরক নয়; 'শাহনামার পটভূমি এই পৃথিবীই—যেখানে মানুষের প্রেমে স্বর্গ; মোহে মর্ত্য ও অন্যায়াচরণে প্রকটিত নরকের বীভিষিকা! এই পৃথিবীতেই মানুষকে অর্জন করতে হবে নিজের বুদ্ধি, বিবেচনা, ন্যায়বোধ ও বীর্যবত্তার দ্বারা পরকালের স্বর্গ। পর-কালের কোন স্বর্গের বর্ণনা 'শাহনামা'তে নেই। আছে এই পৃথিবীরই পবিত্র ফুলবন ও ঝর্ণা, আছে মানুষের চিত্তে ন্যায়বোধ ও প্রেমের ফল্গুধারা।

বাদশা হোশঙ্গের পর মানুষের মধ্যে ভালোমন্দের তারতম্য সূচিত হোল। তারপর জমশেদের মধ্যে মানুষ তার মহিমার পূর্ণ স্বাদ পেলো। বাদশা জমশেদের নাম ছড়িয়ে পড়লো ধরিত্রীর দিকে দিকে। (পরবর্তী ইরানীয় কবিগণ জমশেদের নাম তাঁদের কবিতায় অকৃপণভাবে ব্যবহার করেছেন)। বাদশা জমশেদ জ্ঞানী; তিনি উন্মুক্ত করেছেন মানুষের জন্য সকল কলা-কৌশলের দ্বার, তিনি দূরদৃষ্টি সম্পন্ন,—তিনি তাঁর পানপাত্রে বিশ্বকে প্রতিফলিত দেখতে পান; তিনি গর্বিত—তিনি অহঙ্কারী। এই শেষের 'গুণ'টিই কাল হোল। শয়তানের মতো তিনি তাঁর সম্মানিত আসন থেকে পতিত হলেন। ইরান কবলিত হোল সর্পস্কন্ধ এক আরবীয় যুবকের: তার অকথিত নির্যাতনের মধ্যে কাটতে লাগলো ইরানের মানুষের কাল; একদিন নয়, দু'দিন নয়, হাজার বছর ধরে চললো সেই অত্যাচারীর শাসন। 'শাহনামা'র কবি একাহিনীর মাধ্যমে স্পষ্টভাবেই বললেন যে, অন্যায়-শাসনের সঙ্গে যুক্ত যে জাতি সে-ও বিশ্বস্রষ্টার শাস্তির বিধান থেকে রেহাই পায় না।

কিন্তু কাল যতই দীর্ঘ হোক অন্যায় যতই নিদারুণ হোক, সময়ে সবই অতিক্রান্ত হবে; সম্ভাবনাপূর্ণ ক্ষীণ উষালোক অন্ধকার রাত্রির অবসান সূচিত করবে। ফারেদূনের জন্ম, তার লালন ভাগ্যের কালো নিকষের বুকে তেমনই একটি শীর্ণ রেখা। কিন্তু 'শাহনামা'য় অস্বরূপে দেবতাদের আবির্ভাব ঘটে না; বিশ্বাসযোগ্য মানবিক প্রয়াস কিংবা অপ-প্রয়াস দ্বারাই ঘটনার গতি নিয়ন্ত্রিত হয়।

একরাত্রে জোহাক অশুভ এক স্বপ্ন দেখে জেগে উঠলো, তাতে তার কলিজার রক্ত যেন পানি হয়ে যাচ্ছে। স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইলো রাজা। জ্ঞানী ও জ্যোতিষীরা গণনা শুরু করে দিল। অবশেষে একজন সাহস করে জোহাককে বললো গণনার ফল,—

জেনে রাখ, তোমার পরে একজন তোমার এই তখতে বসবে,
তোমার এই ভাগ্য একদিন মিশে যাবে ধূলায়।
সেই লোক দুনিয়'য় বিখ্যাত হবে ফারেদূন বলে,
আকাশ তাকে দান করবে বহুভাগ্য।
সেই-বীর পুরুষ এই মুহূর্তে মাতৃগর্ভ থেকে জন্ম নিয়েছে,
কাজেই এই মুহূর্তে তোমার ভয়ের কিছু নেই।
বুদ্ধিমতী মায়ের শুশ্রূষায় সে ধীরে ধীরে
বৃক্ষের মতো ফুলন্ত হবে।

জোহ'কের চোখে, রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিনগুলি অন্ধকার হয়ে এলো। ফেরাউনের অনুরূপ সে-ও খোঁজ করলো ফারেদূনের। অতঃপর ফারেদূনের আবির্ভাব যখন নিকটবর্তী বলে বিবেচিত হোল, তখন জোহাক জনপ্রিয়তার শুভশক্তিকে আশ্রয় করতে চাইলো। সে লিখলো এক দলিল, তাতে রইলো জনপ্রিয়তার পক্ষে সর্বপ্রধান যে-শর্ত ন্যাযপরাযণতা, তারই অঙ্গীকার। ভয়ে সবাই তাতে স্বাক্ষর করলো। কিন্তু জনতার মধ্যে 'কওয়া' নামের এক কর্মকার সে অঙ্গীকার নামায স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করে রাজসভায়ই তা টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ফেলে দিলো। স্তম্ভিত সম্রাট তার কোন প্রতিকার করার আগেই কাওয়া বেরিয়ে এসে বিদ্রোহের নিশান উড়িয়ে দিলো; দলে দলে লোক এসে সমবেত হতে লাগলো তার চারদিকে। কাওয়ার যাত্রা এখন ফারেদূনের উদ্দেশ্যে।

ভাগ্যের সব মানবিক শর্ত পূর্ণ করে কবি জোহাকের পতন ঘটালেন। ইরানের সিংহাসনে বসলেন, ইরানেরই প্রাচীন কেযানী-রাজবংশীয় সন্তান ফারেদূন। জোহাকের উপপত্নীরূপে বন্দিনী দুই কেয়ানী বংশোদ্ভূতা রাজকন্যাকে ফারেদূন বিয়ে করলেন। তাদের নাম শাহরনাজ ও আর্নওযাজ।

সততা ও ন্যায়পরায়ণতাব সঙ্গে দীর্ঘদিন রাজত্ব করার পর ফারেদূন তাঁর পুত্রদের মধ্যে তাঁর বিশাল বাজ্যকে ভাগ করে দিলেন—

একজনকে দিলেন বোম ও পশ্চিমের এলাকা,
অন্যাকে তুর্কীস্থান ও চীন;
তৃতীয় জনকে দিলেন দিগন্তবিস্তারী প্রান্তবসহ ইবানভূমি।

এখানে বলা আবশ্যক যে, শাহনামায় বর্ণিত ঘটনাগুলি কোথায়, কোন্ স্থানে সংঘটিত হয়েছিল, তার মোটামুটি একটা ধারণা করে নিতে হবে।

'শাহনামা'র প্রথম অর্ধাংশের ঘটনা ঐতিহাসিক যুগের নয়, সেগুলি কিংবদন্তী-নির্ভর; সেজন্যে যে সব নাম সেখানে রয়েছে, সেগুলির অবস্থান ঠিক করা কঠিন। তবে ইরান ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকার যেসব নাম কবির যুগে প্রচলিত ছিল, সুপ্রাচীন কালের ঘটনায় তাদের হুবহু ব্যবহার আমাদের জানা শোনাকে চকিত করে। সুতরাং জোহাকের যুগে যখন দজলা-তীরে অবস্থিত বাগদাদ নগবীর উল্লেখ পাই, তখন বুঝে নিতে হবে যে, দজলার তীরবর্তী কোন নগরীর উল্লেখ করেছেন কবি। তেমনই, রোম, তুর্কীস্থান,

চীন, তূরান প্রভৃতি এলাকাকে মোটামুটিভাবে মনে মনে চিহ্নিত করে নিয়েই, কাহিনীর উত্থান-পতন অনুধাবনে সচেষ্ট হতে হবে। 'শাহনামা'য় রোম বলতে সিরিয়া, তুরস্ক ও ইরাকের উত্তরাঞ্চলকে সম্মিলিতভাবে বুঝিয়েছে বলে মনে হয়। তূরান বা তুর্কীস্থান বললে বুঝতে হবে যে, এই এলাকা ইরানের উত্তরাঞ্চলের বিস্তীর্ণ মধ্য এশিয়া,—বর্তমানে যেখানে তুর্কমেনিস্তান, কাজাকি-স্তান ও বুখারা-সমরকন্দ প্রভৃতি রাজ্য অবস্থিত। 'শাহনামা'য় চীন বলতে কখনো মূল চীন ভূখণ্ডকে বুঝিয়েছে, কখনো বুঝিয়েছে, মধ্য এশিয়ার সীমান্ত বর্তী কাশগড়, ইয়ারকন্দ প্রভৃতি এলাকাকে। কতকগুলি ভ্রান্তি প্রমাদপূর্ণ অবস্থান সূচক নামও শাহনামায় রয়েছে, যেমন 'আলবুর্জ' পর্বত; এই পর্বতকে যেখানে ভারতের সীমান্তবর্তী পর্বত বলে বর্ণনা করা হয়েছে; সেখানে তাকে হিন্দুকুশ পর্বত বলে ধরে নিতে হবে। প্রাচীন ইরানের রাজধানী কি ছিল, তা পরিষ্কার বুঝা যায় না, তবে প্রথম দিকে, জোহাকের রাজধানী দজলা-তীরে ছিল বলে উল্লেখ থাকায়, আমরা ধরে নিতে পারি যে, মিডিয় আর্যদের প্রভাবের যুগে ইরানের সভ্যতা পশ্চিমাঞ্চলে বিকশিত হয়েছিল। প্রাচীন রাজাদের সেই যুগে আলো অন্ধকারের দুই দেবতার ধারণা প্রচলিত ছিল, এবং সেকালের যে ধর্মের কথা 'শাহনামায়' বর্ণিত তাকে মিডিয়দের 'আবেস্তার' সঙ্গে এক করে দেখতে হবে। পরবর্তী কালে, বিশেষতঃ রুস্তমের যুগে, যখন ইরানের সামন্ত রাজাদের যুগ পরিপূর্ণরূপে বিকশিত, তখন 'গোদরজ' প্রভৃতি সেনাপতিকে যুদ্ধশেষে 'ফরসের' দিকে প্রত্যাবৃত্ত হওয়ার কথায় ফরসকে 'পার্সিপোলিস' (ঐতিহাসিক যুগের এস্তেখার) বলে কেউ যদি ধারণা করেন, তবে তাতে অন্ততঃ আমরা আপত্তি করবো না। ইরান-তূরানের মধ্যবর্তী যে-নদীর কথা 'শাহনামা'য় বলা হয়েছে, সে-নদীটি অবশ্যই আমু-দরিয়া। এবং আফ্রাসিয়াবের পশ্চাদ্ধাবনের কালে যে সাগরের উল্লেখ রয়েছে, সে-সাগরকে আমরা কাস্‌পিয়ান সাগর বলে চিনে নিতে পারি। সামন্ত রাজ রুস্তমের রাজধানী জাবুল হয়ে তুরানে অভিযানের কথা যেখানে বলা হয়েছে, সেখানে বুঝতে বাকি থাকে না যে, গোটা ইরান-সাম্রাজ্যের রাজধানী তখন দক্ষিণ ইরানের কোথাও অবস্থিত। ভূ-সংস্থানের এরূপ একটা মোটামুটি ধারণা নিয়ে 'শাহনামা' পাঠ করলে দিক-ভ্রান্তির আশঙ্কা নেই বলে মনে হয়।

বাদশা ফারেদুন পুত্রদের মধ্যে রাজ্য ভাগ করে দিলেন, জ্যেষ্ঠ পুত্র সলম, মধ্যম পুত্র তুর ও কনিষ্ঠ পুত্র এরজ। জ্যোতিষিগণ দ্বারা ভাগ্য

পরীক্ষা করা হোল, তাতে—

> সুল্‌মের ভাগ্য লক্ষণে দেখা গেলো যে,
> 'মুশ্‌তরী' তারকা ধনুক রাশির আলিঙ্গনে আবদ্ধ রয়েছে।
> ভাগ্যবান তূরের নিয়তি লক্ষণে প্রকটিত হোল—
> তরুণ সূর্য সুমঙ্গল সিংহরাশির আকর্ষণে আকৃষ্ট।
> এরজের ভাগ্য-লক্ষণে দৃষ্টিপাত করতে দেখা গেলো,
> চন্দ্র সেখানে বৃশ্চিক রাশির বন্ধনে নিশ্চেষ্ট হয়ে আছে।

বাদশা কনিষ্ঠপুত্র এরজের উপর আকাশের বিরূপতা লক্ষ্য করে তাকে নিজের চোখের সামনে রাখাই স্থির করলেন। এরজকে দেওয়া হোল ইরানের সিংহাসন। ফারেদূনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সুল্‌ম ও তূর নিজ নিজ রাজ্যে চলে গেলো। পশ্চিমের সিংহাসনে বসে সুলমের মনে এরজের প্রতি জ্বলে উঠলো ঈর্ষার আগুন। সুল্‌ম তূরের সঙ্গে আলোচনা করে তাকেও নিজের সঙ্গে নিয়ে নিলো। তারপর শুরু হলো, এরজকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র ও আলোচনা। স্থির হলো, বৃদ্ধ পিতার কাছে দূত পাঠিয়ে তাঁর পক্ষপাতিত্বের উপর কটাক্ষ করা হবে। তারপর উভয়ের মিলিত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে এরজের উপরে। বৃদ্ধ সম্রাট বয়সের ভারে ন্যুব্জ, তিনি এর কোন প্রতিকার করতে পারবেন না। বুদ্ধিমান দূত উদ্ধত যুবকদ্বয়ের বাণী নিয়ে ফারেদূনের রাজধানীতে উপস্থিত হয়ে দেখলো,—

> প্রাসাদের এক পাশে শৃঙ্খলিত ব্যাঘ্র ও সিংহ
> অন্যপাশে মদমত্ত করীদল।

দূত সম্রাটের ক্ষমা প্রার্থনা করে, শাহ্‌জাদাদের পরুষ-বাণী আদ্যন্ত আবৃত্তি করলো।

সব শুনে সম্রাট দূতকে বললেন, তোমার ক্ষমা-প্রার্থনার প্রয়োজন নেই, কারণ সুল্‌ম ও তূরতো আমার নিজেরই দুই চক্ষু। তাদেরকে বলো যে, তাদের মতো নির্লজ্জ যুবকের মুখেই এমনবাক্য শোভা পায়। পুত্রদের উদ্দেশ্য করে সম্রাট বললেন—

> মনে রেখো যে-কাল আমার দেহকে করেছে ন্যুব্জ
> সে এখনও চক্রবৎ ঘূর্ণিত হচ্ছে।

বৃদ্ধ বাদশা এরজকে ডেকে এনে সুল্‌ম ও তূরের অভিপ্রায় সম্পর্কে তাকে অবহিত করলেন। এরজ পিতাকে জানালো সিংহাসনের লালসার চেয়ে ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে সন্ধি স্থাপনেই সে বেশী উৎগ্রীব। অবশেষে সম্রাটের লিপিসহ এরজ ভ্রাতৃদ্বয়ের অভিমুখে যাত্রা করলো।

ভাইদের সমীপে এরজের বিনয় ও সুভাকাংক্ষা নিরর্থক প্রমাণিত হোল। নিষ্পাপ শাহজাদাকে হত্যা করে তারা তাঁর কর্তিত মস্তক পিতার কাছে পাঠিয়ে দিলো।

এই রক্তের প্রতিশোধই ইরান ও তূরানের মধ্যে শত্রুতার সূচনা হোল। এইশত্রুতা যুগ যুগ ধরে রক্তের নদী বহালো। 'শাহনামা'র এ অংশেই 'জাল ও রুদাবা' 'সোহরাব-রুস্তম' 'সিয়াউশ' 'বেঝন-মুনীঝা' এবং 'রুস্তমের' বিভিন্ন শৌর্যমূলক কাহিনীর জগতে আমরা প্রবেশ করি। ফলে, প্রাচীন ইরানের বর্ণনা এক বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে উদ্ভাসিত হয়, এবং কালের এক-একটা ঢেউ এসে যখন সকল মনোযোগের কেন্দ্রস্থলকে নিঃশেষে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তখনই পাঠক বুঝতে পারেন যে, ফেরদৌসীর চোখে স্থান নয়, কালই ইতিহাসের নিয়ামক শক্তি হিসাবে প্রতিভাত হয়েছিল।

বৃদ্ধ সম্রাট ফারেদূন প্রিয়তম পুত্র এরজের মৃত্যুশোক ভুলতে পারলেন না, রাজকীয় প্রতিহিংসা তার সুদিনের প্রতীক্ষায় আত্মগোপন করে রইলো। শোকাভিভূত বৃদ্ধ সম্রাট এরজের অন্তঃপুরে প্রবেশ করে দেখলেন, এরজের এক পত্নী সন্তান-সম্ভবা। সম্রাটের কল্পনা উদ্দীপিত হোল, এরজের পুত্র তার পিতার রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। কিন্তু মাহআফ্রীদের গর্ভে জন্ম নিলো কন্যা। সম্রাট সাময়িকভাবে আশাহত হলেও নিরাশ হলো না; পরম স্নেহে পৌত্রীকে লালন-পালন করে জমশেদ বংশীয় এক অভিজাত ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিলেন। এই কন্যার গর্ভেই জন্ম নিল, মনুচেহের—প্রাচীন ইরানের এক প্রধান বাদশা।

মনুচেহের বয়ঃপ্রাপ্ত হলে, সুল্‌ম ও তূর জানতে পেলো যে, এক তরুণ তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাঁকে সেই প্রস্তুতির সময় না দিয়েই ইরান আক্রমণ করা উচিত হবে। তূর ও সুল্‌মের সম্মিলিত বাহিনী ইরানের সীমান্তবর্তী নদী আমুদরিয়া পার হলে পর সম্রাট ফারেদূনের আদেশে মনুচেহের প্রখ্যাত বীর সেনাপতিগণসহ তাদের গতিরোধ করে দাঁড়ালেন। উভয়পক্ষে শুরু হলো প্রচণ্ড যুদ্ধ। মনুচেহের প্রতিদ্বন্দ্বী তূরকে খুঁজে ফিরছেন,

নৈশ-আক্রমণের সুযোগ নিয়েছিল তূর ও সুল্‌ম। তূর নিহত হোল, সুল্‌ম পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিলো আলানা নামক এক দুর্গে। পশ্চাদ্ধাবন করে মনুচেহের সেখানেও গেলেন ও সুল্‌মকে নিহত করলেন। এইভাবে এরজের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ সম্পূর্ণ হলে তিনি সম্রাট রূপে শিরে তুলে নিলেন কেয়ানী তাজ।

মনুচেহের প্রধান সামন্তদের মধ্যে নুরীমানপুত্র সামের স্থান ছিল সকলের উপরে। সাম পুত্রহীন।

একদিন দেখা গেল যে, সামের অন্তঃপুরে তাঁর প্রিয়তমা মহিষী অন্তঃসত্ত্বা। সাম আশা করলেন, তাঁর পুত্র হবে। কিন্তু পুত্রের জন্ম হলে দেখা গেল যে, এ'তো সুদর্শন যে পুত্র হয়েছে, তার মাথার চুল সব সাদা। সামকে এ সংবাদ দিতে সবাই ভীত হোল। অবশেষে এক ধাত্রী সাহসে ভর করে সামকে তার পুত্রের জন্মসংবাদ অবহিত করলে, সাম তাকে দেখতে এলেন।

পুত্রকে দেখে সাম বিস্মিত ও লজ্জিত হলেন। তাঁর মনে হোল, এ সন্তান আহরিমান বা শয়তানেরই বংশজাত, তাঁর কিছু নয়। এ ছেলেকে লোকে দেখলে সামকে কি বলবে? তারা কি প্রকাশ্যে ও গোপনে তাঁকে ব্যঙ্গোক্তি দ্বারা আহত করবে না?

নির্দয় এক চিন্তা সামের মাথায় এলো,—তিনি তাকে অরণ্যে বিসর্জন দেবেন। এই নির্দয়তার জন্য তিনি গভীরভাবে বিশ্ব-প্রভুর সমীপে প্রার্থনা করলেন। তারপর পুত্রকে লোকালয় থেকে বহুদূরে নির্জন আলবুর্জ পাহাড়ের পাদদেশে ফেলে আসার জন্য নির্দেশ দিলেন। অরণ্যঘেরা আলবুর্জ পাহাড়ের উঁচুশীর্ষে ছিল ''সীমোরগ' নামক বিরাট এক পক্ষীমাতার নীড়।

'আরব্যোপন্যাসের' (আলেফ-লায়লার) ভীষণ দর্শন ও হিংস্র সীমোরগ এখানে স্নেহময়ী ধাত্রীর রূপে দেখা দিলো। সীমোরগের নীড়ে তার শাবকদের সঙ্গে পরম যত্নে প্রতিপালিত হলেন জাল। তারপর বড় হলে জাল পিতা কর্তৃক গৃহীত হয়ে সম্রাট মনুচেহেরের দরবারে লাভ করলেন মর্যাদার আসন। এই জালই 'শাহনামা'র মহানায়ক ইরানের শৌর্য সাহসিকতার প্রতীক রুস্তমের পিতা। বিদায়কালে স্নেহময়ী ধাত্রী-সীমোরগ জালকে খুলে দিল তার গায়ের একটি পালক। বলে দিলো, কোন বিপদে পড়লে পালকটিকে আগুনে ধরতে হবে; সঙ্গে সঙ্গে সেখানে হাজির হবে সীমোরগ। জাল স্নেহময়ী পালয়িত্রীর এই দানকে মহামূল্য সম্পদরূপে নিজের কাছে রেখেছিলেন।

উত্তরাধিকার সূত্রে রুস্তমও পেয়েছিলেন সেই-পালক ও একাধিকবার তার ব্যবহার দ্বারা সীমোরগের সাক্ষাৎও লাভ করেছিলেন।

বাদশাদের যুদ্ধ যাত্রা, রাজ্য জয় ও শাসন ত্রাসনের মধ্যে ঋতুবদলের আমেজ নিয়ে যেসব প্রণয়োপাখ্যান ও হৃদয়-বিদারক ঘটনার আবির্ভাব 'শাহনামায়' ঘটেছে, তা প্রসঙ্গত হয়েও 'শাহনামা'র আবেদনকে যেমন সর্বব্যাপী করেছে, তেমনই তার পরিপ্রেক্ষিতকে করেছে বিস্তৃততর। অতি সংক্ষেপে তার কয়েকটির পরিচয় এখানে বিবৃত করার চেষ্টা করছি।

সাম কর্তৃক জাবুল-সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নির্বাচিত হওয়ার পর জাল তাঁর রাজ্যের সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহ দেখতে প্রলুব্ধ হয়ে পাত্রমিত্রসহ একদিন স্বীয় রাজধানী থেকে নির্গত হলেন। জাবুল সীমান্তেই কাবুলের অবস্থান। সেখানে রাজত্ব করতেন মেহরাব নামে এক সামন্ত রাজা। তিনি ঊর্ধতন রাজ্যাধিপতি হিসেবে সামকে কর দিয়ে থাকেন। মেহরাব জোহাকের বংশদ্ভূত ও জাতিতে আরব।

কাবুলে প্রবেশ করে জাল এক সুন্দর উপত্যকায় শিবির সন্নিবেশিত করলেন। সেকালের রীতি অনুযায়ী সেই শিবিরে চললো, অবসর যাপনের সঙ্গীরূপে ভোজোৎসব ও পানপাত্রের আবর্তন। দিনের বেলায় তাঁরা পার্শ্ববর্তী এলাকায় মৃগয়ার জন্য বের হতেন।

জাল একদিন শুনলেন, মেহরাবের অন্তঃপুরে রয়েছে তাঁর এক অনূঢ়া 'সূর্যমুখী' কন্যা। দুনিয়ায় তার রূপের তুলনা বিরল। কন্যার রূপের বর্ণনা জালকে বিচলিত করলো।

ওদিকে মেহরাব-কন্যা রুদাবা' পিতার মুখে পক্ষিণী-পালিত জালের দৈহিক সৌন্দর্য, শক্তিমত্তা ও সুরুচির কথা শুনে তাঁর প্রতি বোধ করলেন প্রেমাসক্তি।

উভয়ের মিলনে দাসীদের দৌত্য কাজ করে চললো।

এক রাত্রিতে শাহজাদা জাল মেহরাবের অন্তঃপুরে গোপনে প্রবেশ করে রুদাবার গৃহের নিকটবর্তী হলেন। পূর্ণচন্দ্র সদৃশ রাজকুমারী প্রিয়তমের জন্য তাঁর দ্বিতল গৃহের অলিন্দে অপেক্ষমানা। জাল সেখানে উপস্থিত হলে মেহরাব-কন্যা প্রলম্বিত করলেন তাঁর দীর্ঘ কৃষ্ণকেশ এবং বললেন, শাহজাদা যেন কেশ ধরে উপরে উঠে আসেন। কিন্তু বীরপুত্র বীরের আচরণ কি এমন হতে পারে? সে কি প্রিয়তমার কেশের সহায়তায় নিজেকে

করতে পারে উর্ধে উত্তোলিত? জাল তাঁর পাশরজ্জু ছুঁড়ে ফেলে তাকে প্রাসাদ-শীর্ষের সঙ্গে আবদ্ধ করলেন ও তদ্দ্বারা উঠে এলেন রুদাবার দ্বিতল কক্ষে।

নীরব রাত্রির নীলচত্বরে আকাঙ্ক্ষিত চন্দ্রসূর্যের মিলন হোল। প্রেমোৎসবে কেটে গেলো হ্রস্বরাত্রির দ্রুত ধাবমান প্রহরগুলি। প্রভাত প্রত্যাসন্ন। সামাজিক মিলনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে জাল বিদায় নিলেন।

মেহরাব-কন্যার সঙ্গে পরিণয়ে পিতা সামের অনুমতি প্রয়োজন। কিন্তু জোহাকের বংশোদ্ভূত আরব কন্যার সঙ্গে জালের পরিণয় কিভাবে সম্ভব? ইরান সম্রাটওতো এ ব্যাপারে সম্মত হতে পারেন না।

এদিকে মেহরাবের অন্তঃপুরে রুদাবা অন্তঃসত্ত্বা হলেন। তাঁর গর্ভে রয়েছে 'শাহনামা'র মহানায়ক রুস্তম। সুপুষ্ট শিশুর মাতৃগর্ভ থেকে জাত হওয়ার ব্যাপারে সঙ্কট দেখা দিল। ধাত্রীগণ বললো, স্বাভাবিকভাবে এ-শিশু ভূমিষ্ট হতে পারে না। জাল সীমোরগের শরণাপন্ন হওয়ার কথা স্থির করে অগ্নিপাত্রে সীমোরগের পাখা পোড়ালেন।

সঙ্গে সঙ্গে মেঘখণ্ডের মতো পক্ষিণীর উদয় হোল। সীমোরগের নির্দেশে রুদাবার উদর দীর্ণ করে বীর শিশুকে ভূমিষ্ট করান হোল, এবং তারই দেওয়া ঔষধির গুণে রুদাবা সুস্থও হয়ে উঠলেন। এই উদর-উন্মোচন যেন আধুনিক যুগের 'সিজারিয়ান অপারেশনের' অনুরূপ।

পুত্র, পুত্রবধু ও পৌত্র সাম কর্তৃক সাদরে জাবুলে গৃহীত হলেন। সমুন্নত দেবদারুর মতো বাড়তে লাগলো বালক রুস্তম।

কিশোর রুস্তমের সময় কাটছে তার সঙ্গীদের সঙ্গে পানোৎসবে ও ভোজ্যোৎসবে। তৎকালীন রীতি অনুযায়ী তরুণ শাহজাদাগণের জন্যও সুন্দরী পরিপূর্ণ হেরেমের ব্যবস্থা ছিল।

কিন্তু যে-রুস্তম তার সাহসিকতা ও বীর্যগুণে ইরানের মর্যাদা ও সম্মান রক্ষার জন্য বিশ্ব-প্রভু কর্তৃক নিয়োজিত, সে রুস্তম কি নারী সমাজের মধ্যে পানোৎসবে মত্ত হয়ে থাকতে পারে?

সম্রাট মনুচেহেরের মৃত্যুর পর তূরান সম্রাট পিশঙ্গ তাঁর বীরপুত্র আফ্রাসিয়াবকে ডেকে বললেন, ইরানের সিংহাসন শূন্য। ইরানকে আঘাত করার শুভ সময় উপস্থিত, সুতরাং প্রস্তুত হও।

রুস্তম আফ্রাসিয়াবকে বাধা দিবে। সাম উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন যে, রুস্তম বালক মাত্র। সে কিছুদিন পূর্বে শৃঙ্খলমুক্ত এক মত্ত হস্তীকে স্বীয় বলে নির্জিত করতে পারলেও আফ্রাসিয়াবের মতো যুদ্ধপ্রিয় সম্রাটের মুখোমুখী হওয়া তার উচিত হবে না।

রুস্তম পিতাকে জানালো, ইরানের এই দুর্দিনে কে তার মর্যাদা রক্ষায় দণ্ডায়মান হবে? রুস্তমের পক্ষে পানোৎসবে মত্ত হয়ে থাকবার একি উপযুক্ত সময়?

আফ্রাসিযাবেব সঙ্গে কয়েকটি যুদ্ধে জয়-পরাজয় নির্ধারিত না হলেও, রুস্তমের বলবীর্যের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো সাবা ইরানে।

এদিকে ইরানেব সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেন বাদশাহ কায়কাউস। কায়কাউস ছিলেন যেমন অহঙ্কারী, তেমনই উদ্ধত। রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও যুদ্ধের কলা-কৌশল সম্পর্কে তিনি তাঁর পূর্ববর্তী সম্রাট ফারেদূন কিংবা মনুচেহেরের সমকক্ষ ছিলেন না। সিংহাসনারোহণের পর যে তূরান সীমান্ত ও আফ্রাসিয়াবের দিকে তাঁর নজর দেওয়ার কথা, তিনি তা না করে মাজিন্দিরানের অধিপতিকে স্বীয় দরবারে আহ্বান করে পাঠালেন। মাজিন্দিরান রাজ সম্রাটের এই আহ্বানকে অপমানের নিদর্শন বলে গণ্য করে তা প্রত্যাখ্যান করলো। ক্রোধান্বিত কায়কাউস পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ ব্যতিরেকেই মাজিন্দিরান আক্রমণ করে সেখানে বন্দী হয়ে পড়লেন। ডাক পড়লো খ্যাতনামা বীর রুস্তমের। ইরান সম্রাটকে তাঁর বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে আনতে হবে।

রুস্তমের যাত্রা শুরু হোল মাজিন্দিরানের পথে। কঠিন সে পথ, সে-পথ বিপদসঙ্কুল। রুস্তম একাকীই সে-পথ পার হয়ে চললেন। পথে পড়লো এক দুরন্ত সিংহ; রুস্তম তাকে বধ করলেন। অগ্নি-উদ্‌গীরণকারী আজদাহাকে পরাভূত করলেন এবং মায়াবিনী নারীর কুহক অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত সফেদ দৈত্যকে হত্যা করে ইরান-শাহকে মাজিন্দিরান থেকে মুক্ত করে আনলেন।

মহাবীর রুস্তম স্বীয় রাজ্য জাবুলস্তানে প্রত্যাবর্তন করার সঙ্গে সঙ্গেই মাজিন্দিরানাধিপতি আবার যুদ্ধার্থে সজ্জিত হোল। এবারও ডাক পড়লো রুস্তমের। মাজিন্দিরানীদের সকল বলবীর্য ও কুহক ছিন্নভিন্ন করে রুস্তম তাদেরকে চিরদিনের জন্য ইরান শাহের পদানত করে দিলেন।

কিন্তু কায়কাউসের অনুরূপ অপরিণামদর্শী বাদশা আর হয় না। তিনি স্বেচ্ছায় বার বার নিজের উপর ও ইরানের উপর টেনে এনেছেন অমঙ্গল। ঐশ্বর্য, সম্পদ ও শান্তি তাঁকে সতত অন্যায়পথে বিচরণের প্রয়াসী করে তুলে। সম্রাটের সেনাপতিদের মধ্যে গোদরজ্ সব চাইতে প্রবীণ ও বুদ্ধিমান। কায়কাউস সম্পর্কে একদিন তিনি মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন যে, তিনি শিশুকাল থেকে বহু বাদশাকে দেখেছেন, দেখেছেন বহু সিংহাসন, বীর ও রাজ্যাধিপতিকে। কিন্তু তাঁদের কেউ কায়কাউসের মতো আত্মসর্বস্ব ছিলেন না। প্রজ্ঞা বলতে কায়কাউসের কিছুই নেই; বিচারবোধ ও বিশ্বাস থেকে তিনি বঞ্চিত। মনে হয়, হৃদয় ও মস্তিষ্কের কোন গুণেই তিনি গুণান্বিত নন। এই কায়কাউস থেকেই 'শাহনামার' এক করুণতম কাহিনীর উদ্ভব হয়েছিল। এক সুন্দরতম পুষ্পের পরিম্লান হওয়ার জন্য দায়ী তাঁরই অবিবেচনা। দুঃখময় সেই সিয়াউস কাহিনী শুরু করার পূর্বে, তরুণ রুস্তমের প্রণয়োপাখ্যান ও রুস্তম-পুত্র সোহরাবের দুঃখময় অকাল মৃত্যু সম্পর্কে সংক্ষেপে একটু বলে নেওয়া দরকার।

তুরান সম্রাট আফ্রাসিয়াবের সঙ্গে চলছে দীর্ঘ অমীমাংসিত যুদ্ধ। রুস্তমের সঙ্গে একযুদ্ধে আফ্রাসিয়াব পলায়িত হয়ে ফিরে গেছেন নিজ রাজ্যে। রুস্তমও ইরান-সীমান্তের কাছে কোথায়ও শিবির সন্নিবেশিত করেছেন। এক প্রভাতে রুস্তম ভাবলেন, পার্শ্ববর্তী বনভূমিতে মৃগয়া করে মন-প্রাণ সজীব করে তুলবেন। বীরের আদেশে পরিচারকগণ রাখ্শ্কে (রুস্তমের বিখ্যাত ঘোড়া) সজ্জিত করলো। যথাসময়ে তূণীরে তীর ভরে নিয়ে রুস্তম অশ্বকে উত্তেজিত করলেন। ঘোড়া প্রভুকে নিয়ে বায়ুবেগে ছুটতে লাগলো। রুস্তমের খেয়াল নেই; কখন তিনি চলতে চলতে তুরান সীমান্ত অতিক্রম করে এসেছেন। সামনে বন্যগর্দভ পরিপূর্ণ এক সুন্দর উপত্যকা। শিকারের অনুরূপ প্রান্তর বীরকে মৃগয়ায় মত্ত করলো। রুস্তম এক বন্যগর্দভ আগুনে দগ্ধ করে তাঁর ক্ষুন্নিবৃত্তি করলেন ও ক্ষীণ স্রোতস্বিণীর নির্মল জলে নিবারিত করলেন শ্রান্তি ও তৃষ্ণা। 'তারপর তৃণভূমিতে রাখ্শ্কে চরতে দিয়ে তিনি মখমল সদৃশ ঘাসের উপর নিদ্রিত হলেন।

এই সময়ে কয়েকজন তুরান সৈনিক পথাতিক্রমে রাখ্শ্কে দেখতে পেয়ে তাকে ধরবার মতলব করলো। এই সুলক্ষণে অশ্ব থেকে নতুন জাতের বীজ

পেতে হবে। রাখ্‌শের চরণাঘাতে তিনজনের মৃত্যু হলেও অবশেষে রাখ্‌শ তাদের হাতে বন্দী হোল।

এদিকে রুস্তম জাগ্রত হয়ে রাখ্‌শকে বহু খোঁজাখুঁজি করেও পেলেন না। অবশেষে স্থির করলেন, অনতিদূরে যে নগরী রয়েছে, সেখান থেকেই রাখ্‌শের অনুসন্ধান চালাতে হবে। নগরীর নাম সামানগাঁ। এই সামন্ত রাজ্যটি তুরানের অন্তর্গত। রুস্তম সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলে, সামানগাঁ-রাজ তাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন; খ্যাতিমান বীর রুস্তম তাঁর গৃহে অতিথি, এর চাইতে আনন্দের ও সম্মানের কি আছে!

রুস্তমের জন্য নির্দিষ্ট হোল রাজপুরী মধ্যে সুসজ্জিত শয়ন-কক্ষ। সন্ধ্যার পর প্রাসাদে বসলো, নৃত্য-গীত ও পানাদির আসর। পথশ্রমে ক্লান্ত রুস্তমের চোখে ঘুম নেমে আস্‌ছে, তিনি উৎসব ছেড়ে শয়নকক্ষে এসে নিদ্রিত হলেন। গভীর রাত্রে নিদ্রাভঙ্গে রুস্তম শুনতে পেলেন, কোমল শব্দে কে যেন গৃহদ্বার উন্মুক্ত করছে। সবিস্ময়ে দেখলেন, এক দাসী প্রদীপ হাতে এগিয়ে আসছে রুস্তমের শয্যার দিকে। দাসীর পেছনে প্রদীপান্তরালে চাঁদের মতো সুন্দরী এক কন্যাও বীরবরেব দিকে ধীরপদে অগ্রসর হচ্ছে। সারা কক্ষ সেই সুন্দরীর তনুগন্ধে আমোদিত হয়েছে।

রুস্তম সৃষ্টিকর্তার সহায়তা প্রার্থনা করে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে?

কন্যা জানালো, সে সামানগাঁ রাজের কন্যা তাহমিনা। রুস্তমের বীরত্বের কাহিনী তাঁকে রুস্তমের প্রতি অনুরাগিণী করে তুলেছে। সুতরাং দুনিয়ার কোন রাজপুত্রই তার স্বামী হওয়ার যোগ্য নয়। রাজকন্যা রাখ্‌শকে খুঁজে বের করার প্রতিশ্রুতিও দিলো। রুস্তম তাহমিনার কথায় প্রীত হয়ে ভাবলেন, কাল সামানগাঁ রাজের কাছে তিনি কন্যার পাণি প্রার্থনা করবেন।

যথারীতি বিবাহ পর্ব সম্পন্ন হলে রুস্তম ও তাহমিনা বাসর ঘরে একত্রিত হলেন। আনন্দে অতিবাহিত হলো রাত্রি। সকালে সূর্য যখন সমুন্নত আকাশে তার সোনালী জাল ছড়িয়ে দেওয়ার উপক্রম করছে, তখন রুস্তম তাহমিনার হাতে একটি মনি-বিখচিত কবচ দিয়ে বললেন, যদি তোমার মেয়ে হয় তবে এই মঙ্গলসূচক কবচটি চুলে বেঁধে দিয়ো। আর ছেলে হলে তার বাহুতে এই কবচই হবে তার পিতার পরিচয়-চিহ্ন।

এরই মধ্যে রাখ্‌শকে পাওয়া গেল। বীরবর তাঁর প্রিয় বাহনকে পেয়েই তাকে আদর করলেন ও যথাশীঘ্র তার পিঠে অশ্বাসন যুক্ত করে তাতে উঠে

বসলেন। বায়ুগতিতে রাখ্‌শ তূরান সীমান্ত পার হয়ে এলো। রুস্তম সীস্তান হয়ে ফিরে এলেন জাবুলস্তানে। সামানগাঁয়ের পরিণয়ের কথা দেশে কেউ জানতে পেলো না।

থেমে থেমে তুরানের সঙ্গে যুদ্ধ চলছেই। প্রতিটি যুদ্ধে রুস্তম ছিনিয়ে আনছেন তাঁর জন্য খ্যাতির মালা। সারা দুনিয়ায় রুস্তমের শৌর্যের কথা ছড়িয়ে পড়েছে। তূরানাধিপতি আফ্রাসিয়াবের চিন্তা, কোন্ তূরান বীর এই সিংহ-বীর্য রুস্তমের মোকাবেলা করবে?

ওদিকে তাহমিনার গর্ভজাত পুত্র সোহরাব তারুণ্যে উপনীত হয়েই প্রকটিত করলো অতুল বলবীর্য ও সাহসিকতার পরিচয়। আফ্রাসিয়াব ভাবলো, এই তরুণই রুস্তমের প্রতিপক্ষ হওয়ার যোগ্য। তবে হায়! সোহরাব যে রুস্তমের পুত্র। কিন্তু পুত্র কি পিতাকে চেনে? অপরপক্ষে রুস্তম ও পুত্রকে কখনো দেখেনি। সুতরাং এ পরিচয় যে করেই হোক গোপন রাখতে হবে।

'সোহরাব-রুস্তমের' করুণ কাহিনী বাংলাদেশে খুবই পরিচিত। বাংলা সাহিত্যে ডি. এল. রায় তাঁর 'সোহরাব-রুস্তম' নাটকে কাহিনীর dramatic irony কে বেশ ভাল করেই ফুটিয়ে তুলেছেন। নিয়তির উপকরণ হিসেবে এখানে যা ব্যবহৃত হয়েছে, তা রুস্তমের আত্মমর্যাদাবোধ ও সোহরাবের অনুসন্ধিৎসা। সোহরাব পিতাকে খুঁজছেন। তাই তিনি প্রতিপক্ষ রুস্তমকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি রুস্তম কি না? রুস্তমের আত্মমর্যাদায় তাতে আঘাত লাগে। এক তূরাণ বালক বিশ্ববিখ্যাত রুস্তমের সঙ্গে শৌর্যের যে পরিচয় দিচ্ছে, তার কাছে কি রুস্তম বলে নিজের পরিচয় দেওয়া যায়? তারপর অজানা অবস্থায়ই অত্যন্ত নৃশংসভাবে পুত্র নিহত হলো পিতার হাতে। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে সোহরাব তার বাহুতে বাঁধা কবচ দেখিয়ে রুস্তমকে বলছে, পিতা রুস্তম যখন শুনতে পারবেন তাঁর পুত্রকে তুমি অন্যায় যুদ্ধে নিহত করেছ, তখন তোমার আর রক্ষা থাকবে না। মৃত্যু পথযাত্রী একি বলছে! রুস্তম নিজ হাতে ঘটালেন যে মৃত্যু, সেই মৃত্যুর হাত থেকে কি এখন পুত্রকে রক্ষা করা যায় না? মানুষের দীর্ণবক্ষ কি কখনও জোড়া লাগে না?

অপত্য স্নেহের এমন করুণ প্রকাশ, বিশ্ব-সাহিত্যে আর কোথাও হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

সম্রাট কায়কাউসের প্রধান সেনাপতি তূস। একদা তূস ও গোদরজ্-পুত্র গেও মৃগয়ারত বীরবৃন্দ থেকে দূরে এগিয়ে যান। সেখানে অরণ্যমধ্যে

অপূর্ব সুন্দরী এক রমণীর সাক্ষাৎ লাভ ঘটে। জানা যায় যে, সে নেশাগ্রস্ত পিতার প্রহারের ভয়ে পালিয়ে এসেছে। সে অভিজাত। মহানুভব সম্রাট ফারেদূনের বংশোদ্ভূতা সে। তূস ও গেও-এর মধ্যে কে এই রমণীব পাণি গ্রহণ করবে, তা নিয়ে বচসা দেখা দিলে তৃতীয় ব্যক্তি জানালো, বিষয়টি স্বয়ং সম্রাটসমক্ষে পেশ করা উচিত। অভিজাত সেই রমণী-রত্নকে সম্রাট কায়কাউস নিজেই তাঁর পত্নীরূপে গ্রহণ করলেন। যথাসময়ে সেই পত্নীর গর্ভে সিয়াউশের জন্ম হলো।

সিয়াউশকে সম্রাট শিক্ষার জন্য রুস্তমেব হাতে তুলে দিলেন। রুস্তম শুধু বল-বীর্যে অতুলনীয় এবং যুদ্ধবিদ্যায় ও অসি চালনায়ই দক্ষ নন; তিনি রাজকীয় উৎসবের, আনন্দিত আসরের ও গুণীজনের সাহচর্যের রীতিনীতি সম্পর্কেও সর্বাধিক অভিজ্ঞ। রুস্তম জানেন, কি ন্যায়, আব কি অন্যায়? তিনি রাজ সিংহাসনেব সকল তাৎপর্য অবগত আছেন। রুস্তম বালক সিয়াউশকে সর্ববিধ শিক্ষায় শিক্ষিত করে ফিরিয়ে দিলেন সম্রাটের হাতে। রাজধানীতে তরুণ শাহজাদার দিনগুলি আনন্দেই কাটছে।

এমন সময় একদিন সম্রাটের প্রধানা মহিষী সওদাবা সিয়াউশকে সম্রাটেব পাশে উপবিষ্ট দেখে কাম-শরে জর্জরিত বোধ করলো। সম্রাজ্ঞীর মনে হোল, তার মখমল-কোমল বক্ষবাস যেন কর্কশ বস্ত্রে পরিণত হয়েছে, তার বুকের ঘনীভূত হিম যেন বিগলিত হচ্ছে। একজন দাসী পাঠিয়ে সওদাবা শাহজাদাকে জানালো, শাহজাদা যদি গোপনে সম্রাজ্ঞীর হেরেমে আগমন করতে চান, তবে সওদাবা আপত্তি করবে না। জবাবে পূত-চিত্ত শাহজাদা দাসীকে বললেন, হেরেমে তাঁর কোন্ প্রয়োজন?

সহজপথে কার্যসিদ্ধি হতে না দেখে সওদাবা সম্রাটের শরণাপন্ন হোল, তাঁকে সে জানালো যে, তার মাতৃহৃদয়ে সিয়াউশের জন্য রয়েছে স্নেহের সঞ্চয়। সুতরাং একবার তাকে হেরেমে পাঠালে খুবই ভালো হোত; তার বোনেরাও তাকে দেখতে পেতো।

সম্রাট তখন সিয়াউশকে ডেকে এনে বললেন, অন্তঃপুরে যাও, পুর-রমণীগণ তোমাকে দেখে প্রীত হবেন ও তোমাকে করবেন আশীর্বাদ।

জবাবে শাহজাদা বললেন হে রাজ্যাধিপতি, অন্তঃপুরে আমার কোন্ প্রয়োজন? আমাকে প্রেরণ করুন জ্ঞানীজনের মজলিসে; প্রেরণ করুন তাঁদের মধ্যে যাঁরা জানেন বিভিন্ন অস্ত্রের সুনিপুণ ব্যবহার, অথবা আমাকে

সঙ্গীত ও পানাহারের মজলিসে প্রেরণ করুন। নারীগণ আমাকে কোন জ্ঞান বিতরণ করবেন ?

সম্রাট শাহজাদার কথায় প্রীত হলেন ও বললেন, কিছুক্ষণের জন্য হলেও অন্তঃপুরে যাও, পুরকন্যাগণ তোমাকে দেখে আনন্দ লাভ করবেন।

সিয়াউশ চিন্তিত মনে অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। যবনিকা উত্তোলিত হলে শাহজাদা দেখলেন, সুসজ্জিত কক্ষে সম্রাজ্ঞীর উপযুক্ত মর্যাদায় সুন্দরী সওদাবা ; চারিদিকে স্ফুরিত হচ্ছে অপার্থিব সৌগন্ধ্য। সিংহাসন থেকে নেমে এসে সওদাবা সিয়াউশকে আলিঙ্গন করে বললো, এমন পুত্র কা'র আছে !

সিয়াউশ বুঝলেন যে, সওদাবার আলিঙ্গনে পবিত্রতার চিহ্ন মাত্র নেই। তিনি ভগ্নীদের দেখে দ্রুত অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে এলেন।

এবারে সওদাবা কাবকাউসকে জানালো, সওদাবার কন্যা সিয়াউশের ভগ্নী, তার প্রতি অনুরক্তা। সওদাবা শাহ্‌জাদাকে তার কন্যার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে বাঁধতে প্রয়াসী (প্রাচীনকালে ইরানে ভ্রাতাভগ্নীতে বিবাহ প্রচলিত ছিল)।

সম্রাট পুনরায় সিয়াউশকে অন্তঃপুরে পাঠালেন।

এইবার সিয়াউশকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে সওদাবা বললো, শাহজাদা আমি তোমাকে আমার কন্যার সঙ্গে বিবাহ দিতে চাই। কিন্তু তার আগে একটি বারের জন্য হলেও তুমি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর। গোপনে প্রথম দেখেই তোমার প্রেমে আমি মরেছি ; আমাকে তুমি বাঁচাও। তেমন করলে, তোমাকে আমি দান করবো সিংহাসন ও রাজমুকুট। অন্যথায় তোমার যৌবরাজ্যকে আমি ধূলায় লুটিয়ে দিবো।

ঘৃণায় ভরে উঠলো শাহজাদার অন্তর। ঔচিত্য ও শালীনতার উপর মন্তব্য করে শাহজাদা অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে এলেন।

মর্মাহত সম্রাজ্ঞী এবার স্বীয় বক্ষবাস বিদীর্ণ করে ও কপোল নখরাঙ্কিত করে বিলাপ করতে লাগলো। তার অভিযোগ, সিয়াউশ তার মর্যাদা হানি করেছে।

সম্রাট সব শুনলেন। শুনে বিচলিত বোধ করলেন আর ভাবলেন, সম্রাজ্ঞীর কথা সত্য হলে সিয়াউশের প্রাণদণ্ড হওয়া আবশ্যক।

সিয়াউশ সম্রাট সমক্ষে ব্যক্ত করলেন সওদাবার আদ্যোপান্ত ব্যবহার। কিন্তু সওদাবা অস্বীকার করে জানালো যে, বস্তুতঃ অন্তঃপুরে নারী সমাজের

মধ্যে সিয়াউশ তাকেই বেছে নিয়েছিলো। চিন্তিত সম্রাট ন্যায়ের সপক্ষে কার্য করার জন্য সময়কেই উপযুক্ত সাক্ষীরূপে বেছে নিলেন।

সওদাবার চক্রান্ত শেষ হলো না। জটিল গ্রন্থিতে সে আবদ্ধ করে চললো ঘটনার জাল। শাহজাদা ও সম্রাজ্ঞীর মধ্যে কে দোষী, তা প্রমাণ করার জন্য সভাসদগণ সম্রাটকে অগ্নি পরীক্ষার উপদেশ দিলেন। অগ্নি-দেবই তাদের সমস্যার সমাধান করতে পারেন।

সিয়াউশের অগ্নি পরীক্ষা কথা ঘোষণা করা হোল। স্তূপীকৃত কাষ্ঠে প্রজ্জ্বলিত করা হোল অগ্নি। হাজার হাজার দর্শক সেখানে উপস্থিত। আগুনের লেলিহান শিখা যখন বিশাল ক্ষেত্রকে আয়ত্ব করে নিয়েছে, তখন সিয়াউশ বিশ্ব-প্রভুর উদ্দেশে প্রার্থনা উচ্চারণ করে তার কালো ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করলেন। চারিদিকে উত্থিত হোল কোলাহল। সকলের চক্ষু সিয়াউশের উপর। আগুনের লেলিহান শিখা আবৃত করেছে সিয়াউশকে,—তাঁর অশ্ব অগ্নি শিখার ভিতর দিয়ে অব্যাহত রেখেছে তার যাত্রা। ওই! ওইতো! অগ্নিকুণ্ড থেকে বেরিয়ে আসছেন অনাহত যুবরাজ সিয়াউশ![৬]

সম্রাট নিশ্চিতরূপে জানতে পারলেন সিয়াউশ নিষ্পাপ ও সওদাবা অবিশ্বাসিণী। কিন্তু সিয়াউশের অনুরোধে রক্ষা পেলো সওদাবার প্রাণ। মানুষের যৌন-কামনার অন্তঃশীলা স্রোতের গতি বড় বিচিত্র! খুব বেশীদিন অতিবাহিত হতে না হতেই সওদাবা পুনরায় সম্রাটের প্রেয়সীর পূর্ব মর্যাদা ফিরে পেলো।

ওদিকে প্রতিহিংসাপরায়ণ আফ্রাসিয়াব পুনরায় লক্ষাধিক বীরসহ ইরানের দিকে মুখ করেছে। সম্রাট কায়কাউস স্থির করতে পারছেন না তাকে বাধা দিবার কি উপায় করবেন? শাহজাদা সিয়াউশ তখন দেশের স্বাধীনতা রক্ষার কাজে নিজেকে উৎসর্গ করতে চাইলেন। স্থির হোল, মহাবীর রুস্তমের অভিভাবকতায় শাহজাদা যুদ্ধ যাত্রা করবেন।

উভয় শক্তি পরস্পরের মুখোমুখী হচ্ছে। এমন সময় আফ্রাসিয়াব দুঃস্বপ্ন দেখলো। আসন্ন যুদ্ধ তার ভাগ্যের অনুকূল নয়। জ্যোতিষী ও সুহৃদ্বর্গের কথায় আফ্রাসিয়াব সন্ধির প্রস্তাব করলো। শাহজাদা সিয়াউশের মন শান্তির সপক্ষে। তিনি আফ্রাসিয়াবকে শান্তির প্রতিশ্রুতি দিয়ে রুস্তমকে পিতার

---

৬ রামায়ণে সীতার অগ্নিপরীক্ষা স্মরণীয়।

কাছে পাঠালেন। কায়কাউস এরূপ সন্ধি মানতে রাজি নন, তিনি রুস্তমকে কটূক্তি করে রাজসভা থেকে তাড়িয়ে দিলেন; ক্রোধে অভিমানে রুস্তম চলে গেলেন সীস্তানের দিকে; এবং সিয়াউশ পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হয় দেখে, ইরান-বাহিনী ছেড়ে চলে গেলেন তূরানে। সেখানে যুবরাজ অত্যন্ত আদরের সঙ্গে আফ্রাসিয়াব কর্তৃক গৃহীত হলেন। সিয়াউশের বীরত্ব ও গুণপণা আফ্রাসিয়াবকে মুগ্ধ করলো। আফ্রাসিয়াব স্বীয় কন্যা ফারেঙ্গীসকে সিয়াউশের সঙ্গে বিবাহ দিলেন। তূরান-ভূমিতে সুখেই সিয়াউশের সময় অতিবাহিত হতে লাগলো।

এদিকে যুবরাজের সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে আফ্রাসিয়াব-ভ্রাতা গারসিউজ আফ্রাসিয়াবের কান ভারী করে তুললো। সে বললো, সম্রাট শত্রুর পুত্রকে কাল সাপের মতো দুধ-কলা দিয়ে পুষছেন। অথচ একদিন সেই সাপই তাঁকে দংশন করবে।

গারসিউজের প্ররোচণায় আফ্রিসিয়াব নৃশংসতম অন্যায়ের দিকে এগিয়ে গেল। নিষ্পাপ নিরপরাধ সিয়াউশকে অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করলো। এবং সেই সঙ্গে বন্দী করলো স্বীয় কন্যা ফরেঙ্গীসকে। কন্যাকে প্রকাশ্য-ভাবে অপমান করতেও কুণ্ঠিত হোল না আফ্রাসিয়াব। এ-সময়ে তূরান-রাজের সেনাপতি ও পবামর্শদাতা মহানুভব পীরান সম্রাটকে এই হৃদয়হীন নির্মম ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করে ফরেঙ্গীসকে মুক্ত করে নিলো।

যথাসময়ে পীরানের আশ্রয়ে ফরেঙ্গীসের গর্ভে সিয়াউশের পুত্র কায়খসরুর জন্ম হলো। পীরান স্বপ্নে দেখেছিলেন, সুবর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্ট থেকে সিয়াউশ নিজ হাতে একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে তাকে উঁচু করে ধরে বললেন, আর কতদিন আলস্যে সময়াতিপাত করবে? সুপ্তি থেকে উত্থিত কর শির। আজ নতুন ভাগ্য ও নতুন উৎসবের সূচনা হবে। আজ রাত্রে জন্ম নিচ্ছেন, শাহিনশাহ কাযখসরু।

কায়খসরুর জন্ম হোল। আফ্রাসিয়াব সংবাদ শুনে চিন্তিত হয়ে ভাবলো, বড় হয়ে এই শিশু যদি তার পিতৃপ্রতিশোধে কোমর বাঁধে। সুতরাং, যে অন্যায় সিয়াউশের উপর করা হয়েছে, তা না করে, এমন কি উপায় করা যায়, যাতে সে তার অতীত সম্পর্কে সঠিক মতো অবহিত হওয়ার সুযোগ না পায়।

পীরান সম্রাটকে বললেন, শিশু যদি মেষ পালকদের মধ্যে বড়ো হয়ে উঠে, তবে কিছুই জানতে পারবে না। লোকে বলে, মানুষ পিতামাতার মতো না হয়ে হয় তার প্রতিপালকের মতো।

এইভাবে কায়খসরু মেষপালকদের মধ্যে বড় হয়ে উঠলেও যথাসময়ে কেয়ানী বংশসুলভ সকল গুণেরই আবির্ভাব হোল তার মধ্যে। কিন্তু পীরান, একথা আফ্রাসিয়াবকে জানতে দিলেন না। আফ্রাসিয়াব বরং জানলেন, সিয়াউশের পুত্র মন-মস্তিষ্ক উভয় দিক থেকেই ভারসাম্যহীন।

ওদিকে পুত্রবৎ সিয়াউশের হত্যার সংবাদ শুনে, সিংহের মতো গর্জন করে উঠলেন রুস্তম। প্রথমেই তিনি সওদাবার কেশাকর্ষণ করে এনে তাকে হত্যা করলেন। তারপর তুরানের বিরুদ্ধে পরিচালনা করলেন এক মহত্তর অভিযান। রুস্তমের আক্রমণের সামনে ক্রমে পিছু হটতে লাগলো আফ্রাসিয়াব। দীর্ঘ সাত বছর ধরে তুরান ভূমিকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করলেন রুস্তম। ওদিকে ইরান সেনাপতি গেও কায়খসরুর খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। বহু সন্ধানের পর গেও রাজকীয় ঐশ্বর্য দেখে কায়খসরুকে চিনতে পারলেন ও সাবধানতার সঙ্গে ফরঙ্গীসসহ কায়খসরুকে ইরানে নিয়ে এলেন।

কায়কাউস বৃদ্ধ হয়েছেন। রাজকীয় কর্তব্য এখন কায়খসরুকেই করতে হবে। কিন্তু রাজ সিংহাসন এত নিষ্কণ্টক নয়। ফারেদূন বংশীয় সেনাপতি তূস বেঁকে বসলেন; আফ্রাসিয়াবের দৌহিত্রকে তিনি ইরানের সম্রাট বলে মেনে নিবেন না। কায়কাউস পুত্র ফারেবুরজকে তিনি সিংহাসনের দাবীদার রূপে দাঁড় করালেন। কিন্তু কায়কাউসের কাছে তাঁদের পরাজয় ঘটলো। কায়কাউস কায়খসরুকে সিংহাসন দান করলেন। সিংহাসনে বসে কায়খসরু পিতামহের সামনে প্রতিজ্ঞা করলেন; আফ্রাসিয়াবের কাছ থেকে তিনি যেমন করেই হোক পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিবেন।

সম্ভবতঃ কায়খসরুই ইতিহাস-খ্যাত মহানুভব কাইরাস। 'শাহনামা'য় এই কায়খসরুর শাসনকালেই ইরান-বীর রুস্তম্ তার শৌর্য সম্যকভাবে প্রকটিত করার সুযোগ পান। হিন্দুস্তান, তুরান, ইরান ও চীনের সর্বত্র বিস্তৃত হয়ে পড়ে রুস্তমের শৌর্য প্রকাশের ক্ষেত্র আর সেই সঙ্গে বৃদ্ধি পায় ইরানের মর্যাদা। এ-কাল ইরানের সংস্কৃতি-সভ্যতারও পূর্ণ বিকাশের কাল। বেঝন্ ও মুনীঝার প্রণয়োপাখ্যানের মাধ্যমে কবি যেন তাকেই রমণীয় করে দেখাতে চেয়েছেন।

শেষ পর্যন্ত কায়খসরুর হাতে পরাজিত হয়ে নিহত হন আফ্রাসিয়াব। তূরানের অস্তিত্বও লোপ পেয়ে ইরানের সঙ্গে এক হয়ে যায়। কর্তব্য শেষে দিগ্বিজয়ী সম্রাট কায়খসরুর মহাপ্রয়াণের সময় হোল। খসরু যথারীতি বীর-বৃন্দকে ডেকে তাঁদের কাছে বিদায় চাইলেন ও লুহ্‌রাসপ্‌কে নির্বাচিত করলেন, ইরানের পরবর্তী সম্রাটরূপে। এইবার তাঁর বিদায়ের পালা। 'মহাভারতে'র মহাপ্রস্থানের অনুরূপ কায়খসরু তাঁর সাম্রাজ্যের সীমান্তের দিকে অগ্রসর হলেন ও এক তুষার ঝঞ্ঝার ভিতর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন পর্বতাঞ্চলে।

লুহ্‌রাস্‌প পুত্র গুশ্‌তাস্‌প রোম-সম্রাটের কন্যা কাতায়ূনকে বিবাহ করলেন। সম্রাটরূপে এ-বিবাহ হয়নি। আত্মনির্বাসিত শাহজাদা কর্তৃক রোমক রাজকন্যার বরমাল্য লাভের ঘটনাটি আবার 'মহাভারতে'র দ্রৌপদীর সয়ম্বরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

এই গুশ্‌তাস্‌পেরই শাসনকালে জর্‌দাশতের (জরোয়েষ্টর) আবির্ভাব হয়। এই জরদশ্‌তের দ্বারাই ইরানে একেশ্বরবাদী ধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়। তিনি বলেন যে, অন্ধকারের দেবতা আহ্‌রিমেন আহূরমজ্‌দার সমকক্ষ নয়, আহ্‌রিমেন কুপ্ররোচণা দানকারী শয়তান মাত্র। ধর্মক্ষেত্রে আলো-অন্ধকারের চিরন্তন দ্বন্দ্বের অবসান হয়ে আলো নিঃসংশয়িতভাবে শ্রেষ্টত্বের মর্যাদা লাভ করলো। আহ্‌রিমেনের চেলা আফ্রাসিয়াবের পতনের পর রাত্রিশেষে ভোরের উদয়ের মতোই জরদশ্‌তের আবির্ভাব। এই জরদশ্‌তী ধর্মের উৎসাহী প্রচারকরূপে দেখা দিলেন সম্রাট গুশ্‌তাস্‌পের পুত্র শাহজাদা ইস্‌ফন্দিয়ার। ইস্‌ফন্দিয়ার যেমন সত্যবাদী তেমনই সরল ও বীর-বিক্রম। ধর্মের প্রসার ও ইরানের মর্যাদাবৃদ্ধির অধীর আকাংক্ষায় শাহজাদা পিতার কাছে সিংহাসনের প্রার্থী হলেন। পিতা তাঁর শত্রু আর জাসপের পরাজয় ও তার ভগ্নিগণের উদ্ধারের উপর শাহজাদার সিংহাসনলাভ নির্ভর করে বলে যে ইঙ্গিত প্রদান করেছিলেন, শাহজাদা তা সম্পূর্ণ করেন। মাতা কাতায়ূন পুত্রকে বুঝালেন—ধৈর্য ধর, বৃদ্ধ সম্রাটের পরে তুমিইতো সিংহাসনের মালিক হবে। কিন্তু শাহজাদা ইস্‌ফন্দিয়ার তা মানবার পাত্র নয়।

গুশ্‌তাস্‌পের দ্বিতীয় শর্ত: জাবুলের সামন্তরাজ রুস্তম দীর্ঘকাল ধরে ইরানের রাজসভার দিকে পিঠ করে আছে; তাকে বন্দী করে রাজসভায় নিয়ে আসতে হবে। এই শর্ত পরিপূরিত হলে ইস্‌ফন্দিয়ারের সিংহাসন প্রাপ্তিতে আর কোন বাধাই থাকবে না।

তরুণের রক্ত টগবগ করে উঠলো। জগদ্বিখ্যাত রুস্তমকে মাথা নোয়াতে বাধ্য করা!—ইস্‌ফন্দিয়ার জাবুলের পথে যাত্রা করলেন।

রুস্তমের সঙ্গে ইস্‌ফন্দিয়ারের কথোপকথনে, উভয়ের সন্ধির ইচ্ছায়, ব্যবহারের সৌজন্যে ইরানের সংস্কৃতি-সভ্যতার এক অসামান্য চিত্র ফুটে উঠেছে। ইস্‌ফন্দিয়ার স্বীয় ধর্মে ও সত্যে অবিচলিত,—রুস্তম স্বীয় আত্ম-মর্যাদায়। রুস্তম লোক দেখাবার মতো করেও নিজের পায়ে শিকল পরতে পারেন না। জীবিতাবস্থায় কারো হাতে বন্দী হওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব। অবশেষে, দ্বন্দ্বযুদ্ধেই এর মীমাংসা হবে, স্থিরীকৃত হোল।

একদিকে ইরানের মহত্তম বীর রুস্তম, অন্যদিকে ইরানের ভাবী সম্রাট। যে রুস্তম ও তাঁর পিতৃপিতামহের জীবন ইরান-সম্রাটের জন্য উৎসর্গীকৃত ছিল, সেই রুস্তম আজ ইরান-শাহ্‌জাদার প্রতিদ্বন্দ্বী। ইতিহাসের অধোগতি শুরু হয়েছে। যে শৌর্য, চরিত্র, ঐকান্তিকতা ও কেন্দ্রীয় সম্ভ্রমকে ইরান আশ্রয় করেছিল, তাদের পতন যেন আসন্ন হয়েছে।

দ্বন্দ্বযুদ্ধে ইস্‌ফন্দিয়ার নিহত হলেন। মৃত্যুর সময় ইস্‌ফন্দিয়ার রুস্তমকে অনুরোধ করলেন যে, পুত্র বহ্‌মনের শিক্ষা-দীক্ষার ভার রুস্তমকে নিতে হবে। রুস্তম স্বীকৃত হলেন। ইরানের পতন যেন কিছুদিনের জন্য স্থগিত রইলো।

এদিকে কবি আমাদের জানালেন যে, জালের ঔরসে দাসীর গর্ভজাত 'শাগাদ' নামে এক ভাই ছিল রুস্তমের। সে কাবুল রাজের দুহিতাকে বিয়ে করে সেখানেই বসবাস করছিল। কাবুলরাজ বস্তুতঃ জাবুলের অনুগত সামন্ত। কাবুলে বসে শাগাদ স্বীয় ভ্রাতা রুস্তমের জগৎ-জোড়া যশের কথা শুনতে পেয়ে ঈর্ষান্বিত বোধ করছিল। ভাইকে ধ্বংস করে, নিজে খ্যাতি লাভ করবে, এই আশায় শাগাদ কাবুল-রাজের সঙ্গে পরামর্শ করলো, কি করে রুস্তমকে ধ্বংস করা যায়। ষড়যন্ত্রের জাল নিখুঁতভাবে পাতা হোল। রুস্তমের বংশমর্যাদাবোধে আঘাত করেই সে ষড়যন্ত্রকে সফল করতে হবে।

উদ্ধত কাবুল-রাজকে শায়েস্তা করতে রুস্তম স্বীয় রাজধানী থেকে নির্গত হলেন। ষড়যন্ত্র অনুযায়ী নতি স্বীকার করলো রাজা। এইবার উৎসব ও মৃগয়ার পালা। রুস্তম চিরদিন মৃগয়া-পাগল। ভ্রাতা জাওয়ারাসহ রুস্তম স্বীয় রাখ্‌শ্‌কে চালিত করলেন মৃগয়া ভূমিতে। কাবুল-রাজের রক্ষিত মৃগয়াভূমি শিকারে পরিপূর্ণ। ইতস্ততঃ বিচরণ করতে লাগলেন রুস্তম। ভ্রাতৃশত্রু শাগাদ সেখানেই রুস্তম ও রাখশের জন্য ক্ষুরধার ছুরিকা, তীক্ষ্ণ-বল্লম

ইত্যাদি পরিপূর্ণ কূপ খনন করে রেখেছে। নতুন-তোলা মাটির গন্ধ পেয়ে বেঁকে বসলো রাখ্‌শ্‌, সে আর এগুতে চায়না। কিন্তু এই রম্য-কাননে রুস্তম কি নিষ্ক্রিয় থাকতে পারেন? কষে চাবুক মারলেন রাখশের পিঠে; উত্তেজিত দুরন্ত রাখ্‌শ্‌ বায়ুবেগে ছুটলো। সামনেই মৃত্যু-কূপ। বীর ও বাহন কেউ রক্ষা পেলো না। রাখ্‌শ্‌তো গেলোই, বীরেরও বক্ষদেশ সহ সর্বাঙ্গ মারাত্মকভাবে ক্ষতবিক্ষত হোল। রুস্তম চেয়ে দেখলেন, অদূরে দাঁড়িয়ে অবিশ্বাসী শাগাদ তাঁর দিকে চেয়ে আছে। মরতে মরতে বীর টেনে নিলেন স্বীয় তূণীর থেকে একটি তীর ও তাই ধনুকে সংযোজিত করে শেষ আঘাত হানলেন বিশ্বাসঘাতকের প্রতি। শাগাদ মরলো।

ফেরদৌসী যেন রুস্তমের মৃত্যুর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে ইরানের সামাজিক অবক্ষয়কেই দেখিয়ে দিলেন। রুস্তম ইরানের প্রধানতম বীরই নন, রুস্তম ইরানের স্বর্ণযুগেব প্রতীক। সেই স্বর্ণযুগের সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, সামাজিক চরিত্রের অধোগতি সূচিত হয়েছে। শাগাদ ও কাবুল-রাজের ষড়যন্ত্র যেন বিশাল শাখা কেয়ানী তরুর মূলে কুঠারাঘাত করলো।

ইস্‌ফন্দিয়াব পুত্র বহমন আরদেশীর উপাধি নিয়ে রাজ্যশাসন করতে লাগলেন। তাঁর এক পুত্র ও এক কন্যা। কন্যা হুমায় পরমাসুন্দরী। তৎকালীন রীতি অনুযায়ী আরদেশীর স্বীয় কন্যা হুমায়কে বিয়ে কবলেন। এই কন্যাই উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করলো পিতার সিংহাসন। আরদেশীরের ঔরসে হুমায়ের গর্ভজাত পুত্রের নাম দাবাব। শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত দারাবের জীবন রূপকথার কাহিনীর মতো বিস্ময়কর। মাতা হুমায় নিজ হাতে দারাবকে ইরানের সিংহাসনে বসালেন।

এই দারাবের পুত্রের নামই দারা। ইতিহাসে সিকান্দরের সঙ্গে ইরান-রাজ এই দারারই যুদ্ধ হয়েছিল। 'শাহনামা'য় বলা হয়েছে সিকান্দর বা আলেক-জাণ্ডারকে গ্রীকরাজ ফীলকূসের (ফিলিপস্‌) উত্তরাধিকারী বলে প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হলেও, তিনি বস্তুতঃ ফীলকূস কন্যা দারাবের পরিত্যক্তা স্ত্রীর গর্ভে দারাবেরই ঔরসজাত পুত্র ছিলেন। এই কাহিনীর মাধ্যমে ফেরদৌসীর দেশাত্মগত মন কি আলেকজাণ্ডারকে ইরানীয় বলে আপন করে নিতে প্রলুব্ধ হয়েছিল? কিন্তু সে যাই-হোক, ইরানীয় সমাজ জীবনের অবক্ষয় রোধ করা সম্ভব হয়নি। আলেকজাণ্ডার এক বিদেশী আক্রমণকারী রূপেই চিত্রিত হয়েছেন। তাঁর মৃত্যুতে তার সেনাপতিগণের হাতেই ইরান নির্জীত হতে

থাকে। এই সময়টাকে কবি প্রায় তিন শতকের শূন্যতা বলে অভিহিত করেছেন, এবং বলেছেন যে, এই সময় কালের মধ্যে ইরানের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন স্বাধীন নরপতি রাজত্ব করেছেন।

অতঃপর দারাবের পলায়িত পুত্র সাসানও বংশানুক্রমে তার অধস্তন চারপুরুষ, নামগোত্রহীন উষ্ট্রের রাখাল ও মেষচারকরূপে হিন্দুস্তানে কাটিয়ে দেয়। অতঃপর সাসান নামেই দারা-বংশীয় একজনের দ্বারা সাসানীয় রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠা হয় ইরানে। সাসানীয়দের অধীনে ইরানের কেন্দ্রীয় শক্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে।

আগেই বলা হয়েছে যে, দারা-সিকান্দরের আমলেই ইরান ঐতিহাসিক যুগে প্রবেশ করেছিল। সাসানীয় আমলের চারশো বছর ইতিহাসের আলোয় সম্পূর্ণ আলোকিত। এই আমলের শেষদিকে ইরান ও রোমের শত্রুতা চরমে পেঁাছায়। সাসানীয় বংশের মহত্তম সম্রাট কাসরা নওশেরওয়ানের সময়ে রোমকরা ব্যাপক পরাজয় স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়।

সাসানীয় যুগে ইরানের প্রাচীন শৌর্য স্তিমিত হয়ে এলেও, সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে ইরান স্বীয় আধিপত্য বজায় রাখতে সক্ষম ছিল। কাস্‌রা নওশের-ওয়ানের উজির বুজুরচেমেহেরের মধ্যে ইরানীয় প্রতিভা যেন প্রতীকরূপে আরোপিত। জ্ঞান-বিজ্ঞানের দেশ হিন্দুস্তানের প্রেরিত 'শৎরঞ্জ' বা দাবা-খেলার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এই বুজুরচেমেহেরই বুঝতে পেরেছিলেন। নওশেরওয়ানের ন্যায়পরায়ণতা, শৌর্য ও তাঁর দরবারে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা যেন বিশ্বের সামনে ইরানী সভ্যতা ও সমুন্নতিকে সর্বোচ্চে তুলে ধরেছিল। নওশেরওয়ানের অন্তর্ধানের পর থেকেই ক্রমাবনতি শুরু হয়ে যায়।

কাসরার পুত্র হরমুজদের রাজত্বকালে ইরান যুগপৎ তুর্কী ও রোমীয় আক্রমণের সম্মুখীন হয়; এই সময় এক সামন্তরাজ বাহ্‌রাম চূবীনা প্রকটিত করেন তাঁর শৌর্য; ইরান আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা পায়।

বাহ্‌রাম চূবীনার সঙ্গে ইরানের সিংহাসন নিয়ে বিবাদ বাঁধে খসরু পারভেজের। কবি এখানে শিরীঁ-খসরুর প্রণয়োপাখ্যান বিবৃত করেন। শিরীঁর যে প্রেমোপাখ্যান বাংলায় প্রচলিত 'শাহনামা'র কাহিনীর সঙ্গে তার সর্বাংশে মিল নেই।

নওশেরওয়ানের পরে দ্রুত সম্রাটের পর সম্রাট ইরানের সিংহাসনে বসতে থাকেন। রুচির বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে বিলাস ও অন্যায়াচরণ সমাজে বিস্তার লাভ

করে চলে। অবশেষে বাদশাহ ইয়াজদেগুরদের সময়ে কাদেসীয়ার রণাঙ্গণে নবোদিত ইসলামী শৌর্যের সামনে ইরান তার দীর্ঘদিনের স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে বাধ্য হোল। এই যুদ্ধে হরমুজদের পুত্র দ্বিতীয় রুস্তমকে ইরান-বাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়েছিল। রুস্তম নক্ষত্র গণনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি দেখলেন যে, কাদেসীয়া-প্রাঙ্গণে আরবগণ যখন যুদ্ধের দামামা বাজিয়েছে, তখন ইরানের ভাগ্য-নক্ষত্র অপ্রসন্ন। তিনি তখনই জ্যোতিষী গ্রন্থ টেনে নিয়ে আবার নক্ষত্রের অবস্থান পাঠ করে নিলেন, তারপর মাথায় হাত দিয়ে সবিলাপে বললেন,—ইরানের দুর্দিন অত্যাসন্ন এবং সাসানীয় বংশের পতনের আর দেরী নেই। রুস্তম (দ্বিতীয়) বীরদ্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে কাদেসীয়ায় প্রাণত্যাগ করলেন।

ইয়াজদেগুর্দ দজলা তীরের রাজধানী ছেড়ে পালিয়ে গেলেন দূর খোরাসানে, সেখানে থেকেই রাজ্যোদ্ধারের সঙ্কল্প নিলেন বাদশাহ। চীনের ফগফূরের সাহায্যও পাওয়া যেতে পারে।

কিন্তু সকল আশায় বাদ সাধলো জনৈক তুর্কী অভিজাত। ইরানের এই দুঃসময়ে ইরানের সিংহাসনের স্বপ্ন দেখলো সে। ইয়াজদেগুর্দ অত্যন্ত নৃশংসভাবে মাহুয় নামক সেই তুরানের হাতে নিহত হলেন। এই নৃশংসতার প্রত্যুত্তরে বীর সেনাপতি বেঝানের হাতে মাহুয়ও পরাজিত ও নিহত হোল।

'শাহনামা'র কাহিনী এখানেই শেষ হয়েছে। ফেরদৌসী অনাগত ভবিষ্যতের মুখের দিকে চেয়েই মহাকাব্যের পরিসমাপ্তি টানলেন। কবি অবশ্য এখানে কোন আশার বাণীই শোনাতে পারেন না, কারণ বাস্তব তার সমর্থক নয়,—কবির জীবনেরও অস্তগমনের কাল তখন ঘনিয়ে এসেছে। কিন্তু প্রশ্ন রইলো, কাল কি স্বস্থানে দাঁড়িয়ে থাকে কোনদিন? সূর্যাস্ত কি সূর্যোদয়ে পরিবর্তিত হয়ে আবার দুনিয়াকে নবজীবনে উদ্ভাসিত করে না?

[৫]

বীররস-প্রধান 'শাহনামা'র মধ্যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা ও শূর-সিংহদের হুঙ্কার অব্যাহত থাকবে, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু যুদ্ধ ও রাজনীতির উচ্চনিনাদ মাঝে মাঝে থেমেও গেছে; তখন শোনা গেছে, উৎসবের কলরব, মৃগয়া ভূমিতে শিকারের পশ্চাদ্ধাবনরত অশ্ব ক্ষুরের

ধ্বনি, বসন্ত-বাসিত উপবনে বিশ্রম্ভালাপ কিংবা কোন জনমনোহারী নায়কের মৃত্যুতে মর্মান্তিক আর্তনাদ।

'শাহনামা'র জগৎ যেমন বাস্তব, তেমনই বিস্ময়কর। কাব্যময় সেই-জগতে দীর্ঘ পরিভ্রমণ ও তার উপভোগের সকল ব্যবস্থাই যেন কবি করে রেখেছেন। তাই কাব্যের উপবন-উপত্যকায় একবার প্রবেশ করলে আর ফিরে আসতে ইচ্ছা হয় না। মনে হয়, আমরা এক সহৃদয় বন্ধুর হাত ধরে কলনাদিনী স্রোতস্বিণীর তীর বেয়ে কত কি দেখে শুনে ও উপভোগ করে এগিয়ে চলেছি।

তাই, আমরা দেখি যে, ইতিহাসের চলমানতা, বর্ণনার আবেদন, নাটকের বিস্ময়কর দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও গীত ধ্বনির নিনজ্ঞন ইত্যাদি বৈচিত্র্য একাধারে 'শাহনামা'য় পরিবেশন করা হয়েছে। মনে হতে থাকে, ফেরদৌসী যেন কবি-প্রতিভার গোটা সম্ভাবনাকেই তাঁর মহাকাব্যে উন্মোচিত করেছেন, কোন কিছুই বাকী রাখেননি। কবির উদ্দেশ্য হোল, তাঁর স্বদেশের মহত্ব, বীরত্ব ও সৌন্দর্যকে ক্রমান্বয়ে উন্মোচিত করা। ইরান তাঁর স্বদেশ, কিন্তু সে ইরান কালের স্রোতে অবগাহন করে নিয়ত নবীভূত হচ্ছে। এই নবীভবনের সত্যই 'শাহনামা'র সব চাইতে বড় সত্য। তাই মহানায়ক রুস্তমের পরে যখন আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের মুখে ইরানভূমি অসহায়,—আলেকজাণ্ডারের জ্ঞানচর্চা ও অনুসন্ধিৎসা কবির সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শুধু তাঁর মনে হয়, এই বিশ্ববরেণ্য আলোকজাণ্ডারের সঙ্গে তাঁর স্বদেশের 'যেন' রক্ত সম্পর্ক রয়েছে। অন্ধ আবেগে স্থানকে আঁকড়ে থাকার জড়তা নয়, জ্ঞানের পথে কালের প্রবাহ ধরে অগ্রসর হওয়ার আনন্দই 'শাহনামা'র প্রধান আনন্দ। সেজন্যই সম্ভবতঃ 'শাহনামা'য় প্লটের কোন একত্ব নেই। শিথিল সূত্রে সম্পর্কিত কাল সমুদ্রে ভাসমান দ্বীপপুঞ্জের বিরামহীন চলচ্চিত্রই তার বৈশিষ্ট্য।

সমালোচকগণ 'শাহনামা'কে 'এপিক'-গোত্রের মহাকাব্য বলেছেন। কালের দিক দিয়ে অর্বাচীন ও একক প্রতিভার মহদান হওয়া সত্ত্বেও 'এপিক' কাব্যের স্বতঃস্ফূর্ততা ও বহুমুখীতা একে 'এপিকের'ই পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। বীররসাশ্রিত এই কাব্যের নায়কগণ কোন নিয়তি-নির্দেশকে বাস্তবায়িত করার জন্যে নয়, বাস্তব অবস্থারই চাপে ও মানবিক মূল্যবোধের সংরক্ষণে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হন। সত্যের সঙ্গে মিথ্যার সংগ্রামকে

রহস্যাবৃত রেখে নাট্য-সম্ভাবনাকে ঝুলিয়ে রাখার অভিপ্রায় 'শাহনামা'র কুত্রাপি দেখা যায় না। বরং সত্য না মিথ্যা কোন্‌টা জয়ী হয়,—জয় সাময়িক, না সত্য সমর্থিত?—'শাহনামা'র নাটকীয়তা এমন সব প্রশ্নের উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করে।

আগে বলেছি, ফেরদৌসী তাঁর মহাকাব্যে সবল সম্ভাবনাকেই উন্মোচিত করেছেন। বীররসের সঙ্গে বাৎসল্যরস, করুণ রস, আদিরস, বীভৎসরস সব কিছুই এসেছে। কিন্তু 'শাহনামা'য় বীররসের বিপরীত রস হোল করুণ রস। এই করুণ রসই সেখানে বৈচিত্র্য এনেছে। এই রসের অবতারণার দ্বারাই কবি, তাঁর চরিত্রগুলোকে সম্পূর্ণ ও বলয়িত করেছেন। 'রামায়ণে' করুণ রস আছে; 'মহাভারতে' ও 'ইলিয়ড-ওডীসীতে'ও আছে। কিন্তু 'শাহনামা'র বিষাদাত্মক অংশগুলিতে মানবিক আবেদন এত অনাবিল, সার্বজনীনতা এত অবারিত যে, মানব-জীবনের অনিত্যতার স্মারক হয়েও, তা পাঠকের হৃদয়-মনকে সর্বকলুষমুক্ত এক সমুন্নতিতে সমাসীন করে দেয়।

আমরা এরজ ও সিয়াউশের মৃত্যুর মধ্যে যখন ফুলের মত পবিত্র ও নিষ্কলুষ প্রাণের রক্ত প্রবাহিত হতে দেখি, তখন তূর-সুল্‌ম ও আফ্রাসিয়াবের অন্যায়কে আঙুল দেখিয়ে দিতে হয় না। যে কোন মানুষের মন তখন পবিত্রতার অন্তর্ধানে হাহাকার করতে থাকে। বালক সোহরাবের জন্য মাতা তহমিনার বিলাপ দুনিয়ার সকল দেশের মানুষেরই বিলাপ হয়ে দেখা দেয়। কেবলই মনে হতে থাকে, রুস্তম যদি অহঙ্কারের বশবর্তী হয়ে তাঁর পরিচয় গোপন না রাখতেন, তবে এই মহাসর্বনাশ ঘটতো না। গুশতাস্‌প্‌-পুত্র ইস্‌ফন্দিয়ারের জন্য দুঃখ হয় এজন্যে যে, তার বীরত্ব, সৌজন্য ও ধর্মপ্রাণতা অনাবিল। তিনি শুধু স্বার্থপর পিতার আনুগত্যবশেই তরুণ বয়সে সে-জীবন বিসর্জন দিলেন। পাঠকমাত্রই এরজ ও সিয়াউসের পবিত্রতার; সোহরাবের পিতৃ-সন্ধানী দৃষ্টির ও ইসফন্দিয়ারের ন্যায়পরায়ণতার সমুন্নতিতে নীত হয়। 'শাহ-নামা'র মধ্যে করুণরসের এই অপরূপ রূপায়ণ বিশ্ব-সাহিত্যে বিশিষ্ট হয়ে আছে।

চরিত্র-চিত্রণে ফেরদৌসী দক্ষ শিল্পী। দুনিয়ার যে কোন মহাকবির সৃষ্ট চরিত্রের চাইতে সংখ্যায় তারা কম নয়; মানবিক দোষে-গুণে হীন নয়, শৌর্য-বীর্যে খাটো নয় ও প্রেমে সহানুভূতিতে অনুজ্জ্বল নয়। এইসব চরিত্রের গতিতে কবি মানব-জীবনকে সম্পূর্ণভাবে আবর্তিত করেছেন। বাইরের

ঐশ্বর্যের সঙ্গে ভিতরের দীনতা ; বাইরের প্রতিকূলতার মধ্যে ভিতরের সৌন্দর্য, সমান দক্ষতার সঙ্গে অবারিত হয়েছে। অবিশ্বাস করার এতটুকু অবকাশ কোথাও নেই।

কিংবদন্তীর মধ্যমনি বাদশাহ জমশেদ পৃথিবীকে দান করেছিলেন আইন ও শৃঙ্খলা। জ্ঞান ও শিল্পের সম্পর্কে তাকে তিনি সাজিয়েছিলেন। অশুভ ও অকল্যাণের শক্তিগুলি তাঁর শাসনে পরাভূত ও শৃঙ্খলিত হয়েছিল। কিন্তু এই সর্বপ্রাপ্তির মধ্যেও তাঁর অন্তরে লুকিয়েছিল যে আদি পাপ—তাই হয়েছিল তাঁর পতনের কারণ। তিনি নিজেই শুধু তাতে মরেননি, মেরেছিলেন গোটা ইরানকে। দীর্ঘদিনের জন্য ইরানের ভাগ্যসূর্য রাহুগ্রস্ত হয়েছিল, বিদেশী পাপাচারী জোহাকের দ্বারা।

অতঃপর সর্পস্কন্ধ জালেম জোহাকের পতন হোল তারই দুষ্কর্মেব জন্য। তারই কর্মফল থেকে মস্তকোত্তলন করলেন মহামতি ফারেদূন। এই মহানুভব সম্রাট ফারেদুনের মধ্যেই আবার কেয়ানী রাজবংশের জয়যাত্রা সম্ভব হোল।

ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের পতন—এই মূল্যবোধের সচেতন প্রযোগ যে শাহনামার কোন চরিত্রকেই মানবিক দিক থেকে এতটুকু খাটো করেনি, কবির অসীম শক্তিমত্তা তারই নিদর্শন। গ্রীক মহাকাব্যের নিয়তি ও অলিম্পিয়ান দেবতাদের ইচ্ছার স্থান দখল করেছে, ফেরদৌসীর মূল্যবোধ। এখানে বাইরের হস্তক্ষেপের কোন প্রয়োজন হয়নি, চরিত্রের দুর্বলতাই নায়ক নায়িকার অন্তরে তাদের সর্বনাশের বীজ উপ্ত করেছে, তাকে টেনে নিয়ে গেছে মহতী বিনষ্টির দিকে। শক্তিমান চরিত্রগুলিরও পতন তখন অনিবার্য হয়ে উঠেছে। এখানে ফেরদৌসীকে সফক্লেস ও শেক্সপীয়রের সমগোত্রীয় প্রতিভা বলে মনে হয়। কোন চরিত্রের প্রতিই কবির কোন পক্ষপাতিত্ব নেই ;—স্রষ্টার মমত্ববোধ ও সহানুভূতি নিয়েই তিনি তাদের অনুসরণ করেছেন। এই তন্ময় দৃষ্টিই ফেরদৌসীকে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কবিদের সমমর্যাদা দান করেছে। ইরানের পরম শত্রু পাপাচারী যে আফ্রাসিয়াব, তাকেও শেষ পর্যন্ত স্বীয় কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত দেখা যায়। তার অসহায় অবস্থাও পাঠকের মনে সহানুভূতির সঞ্চার করে। কিন্তু পাপ তাকে রেহাই দেয়নি। মূল্যবোধের 'নিয়তি নির্ধারিত' পথে তাকেও দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হয়েছে। এরজের মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ হয়েছে, মনুচেহেরের বিজয়ের দ্বারা। সিয়াউশের নিষ্কলুষ রক্ত প্রক্ষালিত হয়েছে কায়খসরুর মহিমান্বিত

ব্যক্তিত্বের স্পর্শে। কায়কাউসের পাপীয়সী মহিষী সুন্দরী মোহিনী সওদাবার শাস্তি কেউ ঠেকাতে পারেনি। অথচ জোহাকের শোণিত যার ধমনীতে প্রবাহিত সেই রুদাবা পুরস্কৃত হয়েছেন তাঁর নিষ্কলুষ প্রেমের জন্য। তিনি হয়েছেন 'শাহনামার' মহানায়ক রুস্তমের সম্মানিতা জননী। সাধ্বী তহ্‌মিনার জন্য কবি আমাদের মনে চিরকালের জন্য জ্বালিয়ে রেখেছেন সহানুভূতির সূর্যকান্ত মণি।

বিশ্ব যেমন সুন্দর; প্রতিদিনের সূর্যোদয় যেমন রাত্রির কালিমাকে বিদূরিত করে, তেমনই মানব নিয়তি পাপের খোলস ত্যাগ করে বার বার নবরূপে আবির্ভূত হয়। আশাবাদী কবির অন্তর যেন এক মরমীয় অনুভূতির স্পর্শে বার বার উত্তিষ্ঠত জাগ্রত। তাই 'শাহনামা'য় সূর্যোদয়ের কত ছবি। প্রত্যেকটি সূর্যোদয় বিশিষ্ট, প্রত্যেকটি অর্থবহ ও ইঙ্গিতময়।

'শাহনামা'র মহানায়ক রুস্তম। কবি তাঁকে শৌর্যে-বীর্যে, শক্তিমত্তায়, সুবিবেচনায় ও আড়ম্বরে মহিমান্বিত করে চিত্রিত করেছেন। কিন্তু তাঁকেও মূল্যবোধের কাঠগড়ায় এনে তিনি দাঁড় করিয়েছেন। স্বীয় চরিত্র থেকে উৎসারিত পাপের শাস্তি রুস্তমকেও পেতে হয়েছে। সোহ্‌রাবের শৌর্যের সামনে তিনি আতঙ্কিত হয়েছেন, অহঙ্কারে জ্বলে উঠে গোপন করেছেন আত্ম-পরিচয়। এ পাপের শাস্তি বড় নির্মম, বড় হৃদয় বিদারক—রুস্তম পুত্রহন্তা ও আত্মনীপিড়ক হয়ে তার ভার নিজের শিরে বহন করেছেন।

মূল্যবোধের প্রতি এই শ্রদ্ধা 'শাহনামা'র সর্বত্র অনুস্যূত। কিন্তু এই মূল্যবোধ কোন চরিত্রেই আরোপিত নয়, অথচ কোন চরিত্রই তার প্রভাব-বলয় অতিক্রম করে যেতে পারেনি।

ইসলামের মূলনীতি একেশ্বরবাদের দিকে ফেরদৌসীর দৃষ্টি ছিল নির্ণিমেষ। ইরানের প্রাচীন ধর্ম জরোয়েস্ট্রীয়বাদও 'শাহনামা'র ইসলামী একেশ্বরবাদেরই অন্যরূপ হয়ে দেখা দিয়েছে। ইরানের সম্রাটগণ জোতিষী গণনায় যে-তথ্য প্রকটিত করেন, তা ন্যায়পর ভবিষ্যতের ইঙ্গিতকেই সূচিত করে। 'শাহনামা'র পাপাচারী চরিত্রগুলি নিজের প্রবৃত্তির তাগিদেই পাপ-পথে বিচরণের প্রয়াসী হয়—নক্ষত্রবিচার ও স্বপ্নদর্শনের ইঙ্গিতকে তারা প্রবৃত্তির বশেই অস্বীকার কিংবা পাশ কাটিয়ে চলতে চেয়েছে।

'শাহনামা'র রণক্ষেত্রগুলি বিপুল-প্রসার। সেখানে দক্ষিণ ও বাম—এই দুই বাহুতে সৈন্যদলকে যুদ্ধার্থ সজ্জিত করা হয়, মধ্যভাগে বিরাজ করেন

সম্রাট স্বয়ং কিংবা প্রধান সেনাপতি। যুদ্ধারম্ভের পূর্বে নামকরা বীরদের দ্বৈরথ যুদ্ধ হয়; তারপর শুরু হয়ে যায় সম্মিলিত সংগ্রাম। বড় ভয়াবহ সেই রণক্ষেত্র—সেখানে রক্তের নদী প্রবাহিত হয়; সৈন্যদের পদতাড়ির ধূলায় আকাশে মেঘ করে আসে; প্রহরণ ও তরবারি বিদ্যুতের মতো চমকাতে থাকে; তীর ও বর্শার বারিবর্ষণ শুরু হয়ে যায়। দুর্গে সুরক্ষিত থেকে যুদ্ধ করার বর্ণনাও 'শাহনামা'য় আছে। সে যুদ্ধে 'মুন্‌জনীক' যন্ত্র দ্বারা অগ্নিবর্ষী গোলা-গুলীর সাহায্যে নগর-প্রাচীর ভগ্ন করতে হয়। বিজিত নগরীর গৃহগুলি অগ্নি সংযোগে ভস্মীভূত করাও সেখানে দোষের বলে বিবেচিত হয় না।

অবসর সময়ে ও যুদ্ধজয়ের পর যখন পানাহারের উৎসব বসে, তখন সম্রাট ও বীরগণ মৃগয়ায় বহির্গত হওয়ার কথাও ভাবেন। 'শাহনামা'র প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় মনোরম। সেখানে উপত্যকায় ও বন্য উপবনে হরিণদল বিচরণ করে। কোথাও প্রবাহিত হয় কুলুকুলু নাদে স্রোতস্বিনী। ঢেউ তোলা বড় নদী আমুদরিয়া পার হতে হলে নৌকার প্রয়োজন হয়। দুর্গম অরণ্যে আজদাহা ও দৈত্যরা বাস করে বলে প্রকৃতির বদান্যতা কখনো কখনো ভয়ে সঙ্কুচিত। কিন্তু মানুষের শৌর্যের সামনে দানবীয় সকল শক্তিই শেষ পর্যন্ত পরাভূত হয়। পথ চলার জন্য সেকালের লোকে অশ্ব ও উষ্ট্রের ব্যবহার করতো। যুদ্ধক্ষেত্রেও সম্রাটদের 'জুলুসে' ব্যবহৃত হোত মদমত্ত করীদল।

ইরানের রাজকন্যা ও অভিজাতকন্যাগণ প্রায়শঃই প্রেমময়ী হতেন; তাঁরা পবিত্র ও অপাপবিদ্ধ। কুটিল ও দুশ্চরিত্রা নারীরা তাদের পাপের শাস্তি অবশ্যই ভোগ করতো। কুমারী কন্যাগণ অন্তঃপুরবাসিণী হতেন। সম্রাটের মহিষীগণ মাঝে মাঝে সম্রাটের পরামর্শদাত্রীরূপে কাজ করলেও কখনো যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে যুদ্ধ করতেন না। হুমায়ের মতো উচ্চাকাঙ্ক্ষী মহিষী কদাচিৎ সিংহাসনে উপবিষ্টা হয়ে রাজকার্য পরিচালনা করলেও সম্রাটের পুত্রগণই উত্তরাধিকারী রূপে বিবেচিত হতেন। উজির, সভাসদ ও সামন্ত রাজগণের মাধ্যমে সম্রাটগণ প্রজাপালন করতেন। ঐতিহাসিক যুগে সম্রাট নওশেরওয়ানের সময় ভূমির জরীপ হয়ে ভূমি-রাজস্ব এক স্থির ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়েছিল।

'শাহনামা'য় দরিদ্র ও প্রজাসাধারণ মানবীয় দোষে-গুণে মানুষ। কবি তাঁদেরকে অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। 'শাহনামা'য় বলা

হয়েছে যে, সেকালে সুগন্ধদ্রব্য ও মৃগনাভি ব্যবহৃত হোত। সম্রাট ও রাজন্যবর্গ রেশমের তৈরী ও স্বর্ণসূত্রে বোনা কিংখাবের পর্দা ব্যবহার করতেন। তাঁদের নিদ্রার জন্য রচিত হোত সুকোমল শয্যা। সুরাপান ভোজের অঙ্গস্বরূপ ছিল। নৃত্যগীতের জন্য সুন্দরী নারীগণ নির্দিষ্ট ছিল। হেরেমে তারা রক্ষিতা রূপে অবস্থান করতো। 'শাহনামা'য় ইরানীয় সম্রাটগণ রোমক দেশীয় কিংখাব, চীনদেশীয় কৌশিক ও হিন্দুস্তানী তরবারিকে মূল্যবান বলে মনে করতেন। দাস-দাসীদের সঙ্গে সম্রাট ও অভিজাতগণ সহৃদয় ব্যবহার করতেন।

পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকলেও হিন্দুস্তানের সঙ্গে ইরানের কোন শত্রুতা ছিল না। হিন্দুস্তান জ্ঞান-বিজ্ঞানের দেশ বলে ইরানে পরিচিত ছিল। হিন্দুস্তানের রাজন্যবর্গ শৌর্যেবীর্যে খ্যাতিমান না হলেও তাঁদের অতিথি-বাৎসল্য প্রশংসনীয় ছিল। ইরানের কোন শাহজাদা রাজ্য হারালে হিন্দুস্তানে গিযে আশ্রয় নিতেন। সম্রাট নওশেরওয়ানের সময়ে যে-হিন্দুরাজার উল্লেখ দেখা যায়, তিনি যেমন তীক্ষ্ণধী ছিলেন তেমনই ছিলেন শান্তিপ্রিয়। জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ আলবেরুনীর হিন্দুস্তান বিবরণ সম্ভবতঃ ফেরদৌসীর উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

'শাহনামা' কাব্য ষাট হাজার শ্লোকের এক বিরাট গ্রন্থ। এই গ্রন্থে আগাগোড়া একই ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। প্রত্যেকটি শ্লোক সমিল। এই সমিল ছন্দ 'শাহনামা'য় বর্ণনা, সংলাপ, স্বগতোক্তি, পত্রালাপ সর্বত্রই সমান কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায়' দেখা যায় যে, পাশ্চাত্যের পাঠকদের কাছে এই ছন্দ একঘেঁয়ে বলে মনে হয়েছে। কিন্তু বস্তুতঃ তা কি সত্য? প্রবহমান এই ছন্দে শব্দের বৈচিত্র্য যে-ধ্বনির ঝঙ্কার ও মাধুর্য সৃষ্টি করেছে, তা সকল রকম বর্ণনা ও ভাব প্রকাশেরই সহায়ক হতে পেরেছে। যুদ্ধের বর্ণনায় যে-চিত্র নির্মিত তার সঙ্গে ধ্বনির সংঘাত এমন ব রে বেজেছে যে, মনে হয়েছে তরবারির চলন আমরা শুনতে পাচ্ছি; তীরের উড়ে যাওয়া কানে বাজছে, দুন্দুভির আওয়াজ বায়ু-মণ্ডলকে প্রকম্পিত করছে। ঠিক তেমনি করে ধ্বনিত হয়েছে মৃগয়াক্ষেত্রে হরিণের গতিবেগ,—স্রোতস্বিণীর কলনাদ ও প্রেমালাপের মাধুর্য। শব্দ সংগঠনের নিপুণতার মধ্য দিয়ে কান ও মন উভয়কেই সচকিত ও সঞ্জীবিত করে শব্দিত ও ঝংকৃত হয়েছে 'শাহনামা'র এই প্রবহমান ছন্দ। তাই, এর বিপুল দৈর্ঘ্য এতটুকুও পীড়াদায়ক বলে আমাদের মনে হয়নি।

কাব্যের ভাষান্তর সহজ নয়। কারণ কবির ভাব ও বর্ণনা প্রধানতঃ শব্দকে আশ্রয় করে থাকে। একথা গীতি-কাব্যের বেলায় যেমন সত্য, বর্ণনামূলক মহাকাব্যের বেলায়ও তেমনই। 'শাহনামা' এক বিশ্ব-বিশ্রুত মহাকাব্য ; তার শব্দ ও ছন্দ-মাধুর্য অনুপম। আমার ধারণা, এসব ক্ষেত্রে অনুবাদকের উচিত, নিজের মধ্যে মূল কাব্যের ভাব-বস্তুর পুনঃনির্মাণ দ্বারা যে ভাষায় অনুবাদ তা করতে হবে তার গোটা শব্দ সম্পদকে কাজে লাগাবার প্রস্তুতি গ্রহণ করা। অনুবাদ গদ্যে হোক কিংবা পদ্যে, এ ছাড়া গত্যন্তর নেই। বর্তমান অনুবাদে আমি প্রতিটি শ্লোক ধরে তেমনভাবেই অগ্রসর হতে চেষ্টা করেছি।

'শাহনামার ভাষা ক্লাসিক্যাল ফারসী। পরবর্তীকালে এই ভাষায়ই নিজামী, রুমী, জামী প্রমুখ কবিগণ তাঁদেব কাব্য রচনা করেছেন। তবে বিষয়বস্তুর গুণে ফেরদৌসীব ভাষায় আরবী শব্দ কম এসেছে। ফারসীর যেসব পারিভাষিক শব্দ মুসলমানী রীতি-নীতির প্রকাশক হয়েছিল, 'শাহনামা'য় সেগুলি মূল অভিধানিক অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন 'নমাজ' শব্দ। 'নমাজ' দ্বারা ফেরদৌসী বাদশাদেব সামনে 'মাথা নত করা' কিংবা 'দণ্ডবৎ হওয়া' অর্থই বুঝিয়েছেন।

অনুবাদে মূলের প্রতিটি শ্লোককে দু পংক্তিতে সাজিয়েছি ; তবে কদাচিৎ অর্থের সংহতির জন্য একটি শ্লোককে চারটি পংক্তিতে কিংবা দু'টি শ্লোককে দু'টি পংক্তিতে বিন্যস্ত করেছি ; কিন্তু এমন উদাহরণ খুব কম।

ভাষান্তরে আমরা গাম্ভীর্য বক্ষার প্রয়োজনে তৎসম শব্দ একটু বেশী ব্যবহার করেছি। প্রাচীন ইরানীয় অস্ত্রশস্ত্র সংস্কৃত মহাকাব্যগুলিতে বর্ণিত আয়ুধেরই প্রায় অনুরূপ, কাজেই পাশ, গদা, তীর-ধনুক এসেছে। 'মুন-জনীকে'র কোন সংস্কৃত আয়ুধের কথা আমার জানা নেই ; সেটিকে অন্যরূপে ভাষান্তর করতে হয়েছে। কৌশিক বস্ত্র ভারতীয় সাহিত্যে পরিচিত হলেও স্বর্ণসূত্র নির্মিত 'কিংখাব' এদেশে প্রচলিত ছিল না বলেই মনে হয়েছে। 'রুস্তম' 'জোহাক' 'জমশেদ' 'তহমিনা' প্রভৃতি শাহনামার চরিত্রগুলি বাংলায় পরিচিত। প্রচলিত উচ্চারণগুলিতে গ্রাম্যতা দোষ নেই বলে মনে হয়েছে। তাই 'জাহহাক' না লিখে আমি 'জোহাকই' লিখেছি ; 'রুস্তাম' না লিখে লিখেছি রুস্তম।

অনুবাদের জন্য আমি 'শাহনামা'র ইরানীয় সংস্করণটিই ব্যবহার করেছি। তবে যেখানে সংশয় দেখা দিয়েছে, সেখানে ভারতীয় সংস্করণ আলোচনা করে উপকৃত হয়েছি।

'শাহনামা'র মতো বিরাট এক গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে বাংলা একাডেমী একথাই আবার প্রমাণ করেছেন যে, তেমন দায়িত্ব একমাত্র তাকেই শোভা পায়।

মনিরউদ্দীন ইউসুফ

সূচীপত্র

বিশ্ব-প্রভুর প্রশংসা

প্রাণ ও প্রজ্ঞার প্রভুর নামে শুরু করি,
অতিক্রম করতে পারে না কল্পনা তাঁর নামের সীমা।
প্রভু তিনি নামের, প্রভু তিনি স্থানের,
তিনিই আহার্য দান করেন, তিনিই পথ দেখান।
তিনি প্রভু পৃথিবীর ও ঘূর্ণ্যমান আকাশের,
চন্দ্র-সূর্য ও শুকতারা আলো পায় তাঁর থেকে।
বর্ণনা, ইঙ্গিত ও ধারণার ঊর্ধ্বে তাঁর অবস্থান,
চিত্রকরের সৃষ্টির তিনি মূলতত্ত্ব।
সৃষ্ট জীবের রক্ষণে তিনি সদাতৎপর,
তাঁর অস্তিত্বে সংশয়াপন্ন ব্যক্তির দুঃখও তিনিই দূর করেন।
কল্পনা পথ পায় না তাঁর মধ্যে ;
কারণ, নাম ও স্থানের বাইরে তিনি।
কিন্তু বাণী থেকে নাম ও স্থান অন্তর্হিত হলে
প্রাণ ও প্রজ্ঞা দুই-ই স্তব্ধ ও নিশ্চল হয়ে যায়।
তাই, প্রজ্ঞা ভাষাকে নিয়োজিত করে
অমূর্তকে চাক্ষুষ করার জন্যে।
তিনিই রক্ষা করেন প্রাণ ও প্রজ্ঞার ভারসাম্য ;
ঊষর চিন্তায় কি তাঁকে ধারণ করা সম্ভব ?
তাঁর প্রশংসা কীর্তনের রীতি কারো জানা নেই,
সন্তুষ্ট থাকতে হয় তাঁর বন্দেগীর মধ্যেই।
এইমাত্র উপকরণ ও ভঙ্গুর প্রাণকে সম্বল করে
কে পারে রচনা করতে প্রশংসাবাণী স্রষ্টার জন্য ?
প্রফুল্ল হও তুমি তাঁর অস্তিত্বে
নিরর্থক বাক্-বিস্তার থেকে মুক্ত হয়ে।

জ্ঞানের গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে

শ্রদ্ধান্বিত হও ও পথ অন্বেষণ কর
এবং তাদের নির্দেশে গভীর অন্তর্দেশে কর দৃষ্টিপাত।
জ্ঞান যে আহরণ করেছে সেই হয়েছে ক্ষমতাবান,
জ্ঞানের দ্বারা জরাগ্রস্ত প্রাণ ফিরে পেয়েছে তার যৌবন।
কবিতার আসর এই মহলের বাইরে নয়,
কল্পনা জ্ঞানেব পরিধির বাইরে কখনো পা রাখতে পারে না।
এই সীমার ভিতরেই ওগো বুদ্ধিমান,
বাণীর সঙ্গে কর দৃষ্টি-বিনিময়।
বল, কি আছে?—নিয়ে এসো জ্ঞান থেকে,—
শ্রবণ তার সঙ্গে মিলনের জন্য অস্থির।
বিশ্ব-প্রভুর দানের মধ্যে জ্ঞান সব চাইতে বেশী মূল্যবান,
জ্ঞানের গুণ কীর্তন বদান্যতার পথে শ্রেষ্ঠ উপায়ন।
জ্ঞান সম্রাটদেরও সম্রাট,
জ্ঞান সম্মানিতগণের অলঙ্কার।
জেনে রাখ, জ্ঞান জীবন্ত ও চিরঞ্জীব,
জেনে রাখ, জ্ঞান জীবনের পুঁজি।
জ্ঞান পথের দিশারী ও হৃদয়-মুক্তকারী,
জ্ঞান হস্তধারণকারী বর্তমানে ও ভবিষ্যতে।
তার থেকে আনন্দ, তার থেকেই দৃষ্টি,
তার থেকে উৎকর্ষ, তার অভাব থেকেই খর্বতা।
জ্ঞান অন্ধকার ও জড়ত্বকে দান করে আলো ও চলমানতা,
কাল উৎফুল্ল হয় না জ্ঞানের স্পর্শ না পেলে।

কি সুন্দর বলেছেন তত্ত্বজ্ঞ ও ধীমান ব্যক্তিগণ—
ভাষার পক্ষ তাড়নেই জ্ঞান হয় উর্ধ্বগতি।

জ্ঞানকে যে বিদায় করেছে নিজের সামনে থেকে
সে তার অন্তরকে করেছে দুষ্টক্ষতের আগার।

ভাবোন্মাদ ও স্থির-বুদ্ধি দুই-ই তাকে করে আহ্বান,
দুই-ই তার সঙ্গে সখ্যসূত্রে আবদ্ধ।

জ্ঞানের মধ্যে নিহিত রয়েছে বর্তমান ও ভবিষ্যতের ভাগ্য,
শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রজ্ঞা তার সাহায্যেই লাভ করে মুক্তি।
জ্ঞান প্রাণের চক্ষুস্বরূপ;

এই দুনিয়ার ভোগ-নন্দনে জ্ঞান ছাড়া তুমি অন্ধ।

প্রত্যক্ষ কর জ্ঞানকে—সৃষ্টির প্রথম দিনেই যার জন্ম;
রক্ষক সে প্রাণের, প্রহরী সে ত্রিপথের।

তোমার ত্রিপথ চক্ষু কর্ণ ও রসনা,

এই তিন পথেই পুণ্য ও পাপ প্রবেশ করে অন্তরে।

চেতনা ও প্রাণের প্রশংসা কে কীর্তন করবে?
যদি আমি করি, তবে কে করবে তা কর্ণগত?
প্রকাশহীন জ্ঞানরাজি কোন কাজে লাগবে না,

আনো তবে বাণী;—সৃষ্টি তো প্রকাশেরই নামান্তর।

ওগো উদ্বেলিত বাণী তুমি বিশ্ব-স্রষ্টার শিল্প-কর্ম,

গোপন ও প্রকাশ উভয়কেই তুমি আলিঙ্গন করে আছ।

জ্ঞানের সহায় চিরকাল তুমিই,
অজ্ঞানতার অক্ষমতাকে তুমিই কর বিদূরিত।

বাণীর সহায়তায় জ্ঞানীগণ করেন নূতন পথের অন্বেষণ—

পথ হাঁটেন পৃথিবীর, ও মানুষের চেতনাকে করেন আলোকিত।

তাই জ্ঞানীদের মুখ থেকে যখন বাণীর সম্পদ কর কর্ণগোচর

তখন গুঞ্জিত কর কালকে সুললিত সঙ্গীতের ধ্বননে।

বাণীর শাখা যখন ফুল্ল দেখ

তখন জেনো, জ্ঞান আর সংগোপনে থাকবে না।

বিশ্বের সৃষ্টি প্রসঙ্গে

সূচনাতেই জেনে রাখা চাই
সৃষ্টির মূলতত্ত্ব।
প্রকটিত করেছেন প্রভু সৃষ্টিকে অনস্তিত্ব থেকে,
অপ্রাণ থেকে উদ্ভূত করেছেন প্রাণ ও শক্তিকে।
তার থেকে এসেছে চারটি মূলবস্তু—
লালিত হয়েছে তারা নিরালম্ব নিঃসম্বল।
প্রথমটি অগ্নি –উজ্জ্বল ও তাপ বিকীরণকারী,
দ্বিতীয় বাতাস, তৃতীয় পানি, চতুর্থ অন্ধকার মৃত্তিকা।
প্রথমে অগ্নিতে সৃষ্টি হোল কম্পন ও সে হোল গতিমান,
তার তাপে পানিতে জাগলো শুষ্ক তটভূমি।
তার থেকে ধীরে ধীরে শীতলতা মাথা তুললো,
পরে জন্ম নিলো আর্দ্রতা—ছড়িয়ে পড়লো সে দিকে দিকে।
যখন এই চারটি মূলবস্তু স্থিতিলাভ করলো এইভাবে,
তখন বসবাসের যোগ্য হোল এই ধরিত্রী।
একটি মূলবস্তু অন্যটিতে প্রবিষ্ট হোল,
ফলে মাথা তুললো আরো অনেক নব নব বিস্ময়।
জন্ম নিলো এই অচিন্ত্যনীয় গতিশীল গগন-গম্বুজ,
বিকশিত হয়ে চললো কত না নতুন কীর্তি!
সজ্জিত হোল ধূমায়মান মেঘমালা বরের বেশে,
উপযুক্তা ধরিত্রী-কন্যাদের করলো পাণিগ্রহণ।
বেদনা করুণা ও বদান্যতা জন্ম নিলো,
বদান্যতা দানের হস্ত প্রসারিত করলো দুর্বলের দিকে।

মহাকাশ তার মহা আলিঙ্গনে ধারণ করলো স্তরপরম্পরা,
তাদের ঘূর্ণনের সঙ্গে দৃঢ়বদ্ধ হোল কর্ম।
নদী পর্বতমালা সমভূমি ও মরুপ্রান্তর—
ধরিত্রী সুশোভিত হোল শিল্প-সুষমায়।

পর্বত-শৃঙ্গে লগ্ন মেঘের নীচে মাথা তুললো
সবুজ পত্রমঞ্জরীতে সুশোভিত বৃক্ষরাজি।
পৃথিবীর ছিল না কোন আকাশ,
সে ছিল অন্ধকার ও কৃষ্ণতার এক কেন্দ্রবিন্দু।
গ্রহ-নক্ষত্র তার মাথার উপরে যখন ফুটলো
তখন আলোর বিভায় হেসে উঠলো সে।

জলের নীচে থেকে উঠে এলো অগ্নি,
সূর্য শুরু করলো তার রোজকার প্রদক্ষিণ পৃথিবীকে ঘিরে।
কত না বিচিত্র বৃক্ষ সুপ্ত ছিল,
তাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হোল সূর্যের কিরণ-সম্পাতে।
এই শক্তির সহায়তা ব্যতিরেকে সম্ভব ছিল না কোন বিকাশ,
সম্ভব ছিল না প্রাণের ইতস্ততঃ বিচরণ।
এই শক্তি থেকেই জন্ম নিলো প্রাণ,
উদ্ভিদ-জগৎ পা রাখলো প্রাণের সীমায়।
প্রাণ তখন উদ্ভিদের মধ্যে নিজেকে আটকে রাখলো না,
দৃষ্টি উন্মুক্ত করলো কঠিন প্রয়াসের দিকে।
ভোগ বিশ্রাম স্বপ্ন সে আকাঙ্ক্ষা করলো,
আকাঙক্ষা করলো জীবনের আনন্দ।
রসনায় ছিল না ভাষা, জ্ঞানে ছিল না অন্বেষণ,
কণ্টক ও আবর্জনা থেকেই মিটাতে হোত দেহের প্রয়োজন।
ভালো-মন্দ ও কর্মের পরিণাম ছিল অজ্ঞাত,
স্রষ্টার উপাসনার ইচ্ছাও জাগতো না কারো মনে।

যখন জ্ঞান ও শক্তি বিনিময় করলো পরস্পরের মধ্যে
নিজেদের ভাব,

তখন উঠে এলো গুপ্ত ছিল যে কলা-কৌশল।

তা থেকে জন্ম নিলো কর্ম ও তার পরিণাম,

জন্ম নিলো গোপন ও প্রকাশের অজ্ঞাত মহিমা।

মানুষের জন্ম-কথা

অতিক্রান্ত এই যুগেই জন্ম হোল মানুষের,
এবং কলাকৌশলের বন্ধ দুয়ার গেল খুলে।
ঋজু দেবদারু বৃক্ষের মতো সোজা হোল প্রাণের মেরুদণ্ড,
খুলে গেলো কর্মের স্রোত বাক্ ও জ্ঞানের সহায়তায়।
আপন করে নিলো সে অনুভূতি, জ্ঞান ও বুদ্ধিকে,
তারপর ফরমান জারি করলো হরিণাদি চতুষ্পদ
বন্যজন্তুদের উপর।

জ্ঞানের পথে তুমি ধীরে ধীরে দেখতে পাবে,
মানব-জন্মের সার্থকতা কোথায়!
তুমি জানবে, কি করে দিকহারা মানুষ
জ্ঞানের সাহায্যে পেলো পথের নিশানা।
কি করে তোমাকে সে দান করলো মাহাত্ম্য দু'জগতের উপর,
এবং লালন করলো তোমার প্রতিভাকে বাণী বহনের উপযুক্ত
করে।

প্রকৃতি তার আদিমতম সৃষ্টিকে গণনা করে শেষতম পরিণতির
দিক থেকে,
কাজেই তুমি তোমার জীবনকে খেলারূপে গ্রহণ করো না।
শুনেছি, অতীতকালে বুদ্ধিমানরা বলতেন,
বিশ্ব-প্রভুর সৃষ্টি-রহস্য গোপন রয়েছে পরিবর্তনের মধ্যে।
দৃষ্টি নিক্ষেপ কর পরিণামের দিকে, নিজেকে দেখ,
তাহলেই হতে পারবে সফলকাম ও বরণীয়।
দুঃখকে বরণ কর, দুঃখ দ্বারা স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আন দেহের;
দুঃখের আগুনেই জ্ঞান হয় পরিপক্ক ও বিকার-মুক্ত।

যদি সকল অকল্যাণ থেকে কামনা কর মুক্তি,
ও বিপজ্জাল থেকে রেহাই পেতে চাও,
তবে ঝাঁপ দাও দুঃখ ও বিপদরাশির মধ্যে
দুঃখ ব্যতিরেকে শ্রেয়োলাভ সম্ভব নয় কারো জন্যে।
চেয়ে দেখ দ্রুত ঘূর্ণ্যমান আকাশের দিকে,
তার থেকে আসছে দুঃখ ও দুঃখের প্রতিকার দুই-ই।
কাল বিনষ্ট হয় না তার ঘর্ষণে,
বিনষ্ট হয় না দুঃখ কিংবা সুখ।
তার ঘূর্ণনের ফলে আনন্দ ও শ্রীবৃদ্ধি চিরস্থায়ী হয় না,
এবং দুঃখ ও অধঃপতনও নিত্যকালের ব্যাপার নয়।
তার থেকে যেমন বৃদ্ধি তেমনি তার থেকেই ক্ষয়,
মঙ্গল-অমঙ্গলের রহস্য দুই-ই তার কাছে প্রকটিত।

সূর্যের সৃষ্টি প্রসঙ্গে

নীল আকাশ লালকান্তমনির আভায় উজ্জ্বল হোল,
এই উজ্জ্বলতা বাতাস পানি কিংবা ধূম্ররাশি থেকে নয়।
এতো দীপ্তি ও দীপান্বিতা নিয়ে
সে যেন বসন্তের উপবনে পরিণত হয়েছে।
মনোরঞ্জিনী রত্নাবলী তার অন্তর থেকে উৎসারিত হয়ে
আলোময় করছে দিনকে।
প্রতিটি ঊষা যেন স্বুবর্ণ নির্মিত ঢালের মতো মাথা তোলে
প্রাচীমূল থেকে,
আর ধরিত্রী আলোর পরিধেয় গায়ে পরে অন্ধকার থেকে
আবির্ভূত হয়।
পূবদিক থেকে সে যখন অগ্রসর হয় পশ্চিমের দিকে,
তখন কালো রাত পূবের পথে মস্তকোত্তোলন করে।
একজন করে না আরেকজনের পথরোধ,
এর চাইতে ত্রুটিহীন পর্যায়ক্রম আর সম্ভব নয়।
ওগো, সূর্য,
তুমি কি আমাকে দান করবে না তোমার আলো?

চন্দ্রের সৃষ্টি প্রসঙ্গে

একটি প্রদীপ অন্ধকার রাতের পথ ধরেছে;
ওগো, নৈরাশ্যের আবরণে আর নিজেকে ঢেকে রেখো না।
দুই দিন ও দুই রাত্রি সে গোপন রাখবে তার মুখ,
কালের ঘর্ষণে সে তখন ক্ষীণ-প্রাণ।
তারপর শীর্ণতা ও হলুদ বর্ণের আলম্বনে তার আবির্ভাব হবে,
যেন কারো বিচ্ছেদ-বেদনায় কৃশ হয়ে যাচ্ছে তার সুন্দর তনু।
দূর থেকে কেউ তখন তার দিকে দৃষ্টিপাত করলে
মনে হবে, এই বুঝি সে মিলিয়ে গেলো।
পরের রাতে তার দর্শন হবে পূর্ণতর,
দান করবে সে অধিকতর আলো।
দু সপ্তাহ গত হলে পরিপূর্ণ হবে তার অবয়ব,
তারপর আবার প্রত্যাবর্তন করবে সে তার জন্মলগ্নে।
দিন দিন সে সরু হবে,
এবং নিকটবর্তী হবে উজ্জ্বলতম সূর্যের।
এই বিচিত্র চলনভঙ্গী তাকে দান করেছেন স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা,
এই চাল তার অব্যাহত থাকবে চিরদিন।

পয়গম্বর (সাঃ) ও তাঁর বন্ধুগণের প্রশংসা

তোমার জ্ঞান ও ধর্মকে কর কুসংস্কার থেকে মুক্ত,
মুক্তির পথ অন্বেষণ করাই হোল তোমার কাজ।
অধঃপতিত জীবন থেকে উঠে আসার যদি বাসনা থাকে
যদি বাসনা থাকে চিরদিনের দুঃখ থেকে রেহাই পাওয়ার,—
তবে তোমার পয়গম্বরের বাণী নিয়ে কর পথের অন্বেষণ—
হৃদয়ের অন্ধকার গুহা সকলকে কর তার আলোয় আলোকিত।
'ওহী' ও প্রেরণার প্রভু—
আদেশ ও নিষেধের বিধিকর্তা কী সুন্দর বলেছেন,—
সূর্যসদৃশ পয়গম্বরগণের পর কোন চন্দ্রই
আবুবকরের মতো এতো দীপ্তি ছড়ায়নি মানুষের উপর।
ওমর ইসলামকে করেছেন প্রকটিত দূর দুরান্তে—
এবং ধরণীকে করেছেন সজ্জিত বসন্তের ফুলবনের মতো।
এঁদের পরে নির্বাচিত হয়েছেন ওসমান—
লজ্জার প্রতিমূর্তি ও ধর্মের অধিষ্ঠানভূমি।
চতুর্থ আলী—সংসার বিরাগিনী ফাতেমার স্বামী,
যাঁর গুণকীর্তন করেছেন স্বয়ং রসূলুল্লাহ্।
"আমি জ্ঞানের শহর ও আলী তার সিংহদ্বার"—
রসুলের এই বাণী সত্য ও সন্দেহাতীত।
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এই বাণী বহন করে তাঁর চরিত্রের মর্ম,
এর ব্যাখ্যা পূর্ণ করে আমার শ্রবণদ্বয়।
উপযুক্ত সম্ভ্রম ও ভক্তির সঙ্গে গ্রহণ কর তোমরা আলীকে
এবং তাঁদেরকেও,
কারণ, এঁদেরই সাহায্যে ক্রমান্বয়ে শক্তিলাভ করেছে ধর্ম।

নবীবর সূর্য ও তাঁর সাহাবীগণ চন্দ্রসদৃশ,
সবাই তাঁরা সরল পথের সহযাত্রী।
আমি নবী-পরিবারের দাস,
আমি প্রশংসাকীর্তনকারী আলীর[১] পদধূলির।
অন্যকে অস্বীকার করা আমার কাজ নয়;
আমার বাণী সহজেই ধাবিত হয় তাঁর পথে।
এই জগৎকে জ্ঞান কর এক সমুদ্র বলে,
যেখানে গর্জন করে ফিরছে প্রবল ঝঞ্ঝা ও ক্রুদ্ধ ঊর্মিদল;
যেখানে সত্তরটি অর্ণবযান অনুকূল হাওয়ায়
তুলে দিয়েছে তাদের প্রসারিত বাদবান।
তার মধ্যে একটি জলযান সজ্জিতা কনের বেশে
রাজহংসের গতিতে এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে।
তার মধ্যে রয়েছেন মুহম্মদ ও আলী
এবং নবী ও আলী-পরিবারের সকলে।
দূরে দাঁড়িয়ে জ্ঞানীজন দেখতে পায়—
এই সমুদ্র অসীম—তার তটরেখা অদৃশ্য।
তারা বুঝতে পারে উত্তাল তরঙ্গ যখন হানবে তার অভিঘাত,
তখন হয়ত নিমজ্জন থেকে কেউই রক্ষা পাবে না।
কিন্তু হৃদয়ের অধিবাস যদি হয় নবী ও আলীর সঙ্গে,
যদি নিমজ্জমান আমি সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হই
তাঁদের সাহায্যের উপর
তবে অবশ্যই তাঁরা বাড়িয়ে দিবেন আমার দিকে
তাঁদের হাত—
তাঁরাই মালীক সিংহাসন ও রাজকীয় ঝাণ্ডার।

---

১ মূলে 'ওসী' শব্দ আছে। 'ওসী' অর্থ—যার উপর 'ওসীয়ত' (মৃত্যুর বা যাত্রার প্রাক্কালে যে আদেশ করা হয়) করা হয়েছে। শিয়াগণ বিশ্বাস করেন যে, মৃত্যুকালে রসূলুল্লাহ্ আলীকেই তাঁর প্রতিনিধি নির্বাচিত করে যান। ফিরদৌসী শিয়া মতাবলম্বী ছিলেন।

তাঁরা সুপবিত্র সুরা, সুপেয়-জলরাশি ও সুধার অধিকারী,
সঞ্জীবনী পানীয় ও অমৃতের উৎসও তাঁরাই।
যদি থাকে অন্তর্দৃষ্টি তবে আর সব পান্থশালা ছেড়ে—
বসবাস প্রতিষ্ঠিত কর নবী ও আলীর মধ্যে।
আমার পাপের মার্জনা তাঁদের থেকেই আসবে বলে
আমি বিশ্বাস করি,
এই আমার ঈমান এই আমার ধর্ম।
জন্ম আমার অভিজাত, মৃত্যু আমার সম্মানিত,—
যেহেতু আমি জেনেছি, আমি আলী হায়দরের পদধূলি।
তোমার হৃদয় যদি হয় তাঁর প্রতি অসম্ভ্রম-যুক্ত,
তবে জেনো, এই দুনিয়ায় তুমিই তোমার দুশমন।
অজ্ঞাত-পিতৃ-পরিচয় ছাড়া আর কেউ হতে পারে না তাঁর শত্রু,
কারণ, তেমন লোকের দেহকেই বিশ্ব-প্রভু করবেন আগুনে দগ্ধীভূত।
যার হৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে আলীর প্রতি শত্রুতা
কে তার চেয়ে বেশী অপমানিত এই দুনিয়ায়?[২]
দেখ, এই জগৎকে মনে করে না মায়া কিংবা লীলা বলে,
এখানে পথাতিক্রম করো না সৎসহযাত্রীদের সঙ্গ ব্যতিরেকে।
সততা সর্বত্র সফলকাম ও বিজয়ী হয়,
সততার সঙ্গে কর জীবন যাপন ও পাপাচার থেকে লজ্জায়—
ফিরিয়ে নাও তোমার মুখ।
সর্বরকম সততার সূচনা হোক তোমার মধ্যে।
যাতে যশস্বীদের সঙ্গে করতে পার তোমার যাত্রা শুরু।
এই অল্প দুয়েকটি কথা বলে শুরু করলাম আমি
আমার পথ যাত্রা,
জানি না, কোথায় রয়েছে এই পথের শেষ।

২ এই দু'টি পংক্তি শাহনামার কোন পাক-ভারতীয় সংস্করণে নেই; ইরানীয় সংস্করণে আছে।

শাহ্‌নামা সম্পাদনা প্রসঙ্গে

বাণী উৎসারিত হয়েছে অনেক, কিন্তু একটি অন্যটির অনুরূপ নয়,
আমি তোমাদের কাছে যে কাহিনী বলতে যাচ্ছি
তা তোমাদের মধ্যে প্রচলিত।
যা কিছু আমি বলবো, সব বলা হয়েছে আগেই,
জ্ঞানের নন্দন-কাননে সবাই করেছেন ভ্রমণ।
যদি যুঁই গাছের ফুলভারনত্র শাখার উপর করি দৃষ্টিপাত
তবে হবো বঞ্চিত।
কিন্তু কেউ যদি আশ্রয় নেয় উচ্চ কোন বিটপীর তলায়—
তবে তার সুশীতল ছায়া অচিরেই দূর করবে তার ক্লান্তি।
আমি উড়ন্ত জলধর, কিন্তু পদযুগ বিন্যস্ত করেছি
সেই ছায়াচ্ছন্ন দেবদারুর উন্নত শাখায়।
কারণ, যশস্বী নরপতিগণের এই ইতিকথা
দুনিয়ায় আমার স্মারক হয়ে থাকবে।
তুমি এ'কে অলীক কাহিনী বলে মনে করো না,
গণ্য করো না তাকে যুগ-চিত্তের উৎসার মাত্র বলে।
এর কিছু কাহিনীতে রয়েছে বুদ্ধির ও জ্ঞানের দীপ্তি,
অন্যরা নিজেদের মধ্যে বহন করছে রহস্যময় তাৎপর্য।
অতীত কালে ছিল পুরাকীর্তি সম্বলিত এক গাথা,
তার মধ্যে সন্নিবেশিত ছিল অনেক উপাখ্যান।
প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তির মুখে মুখে তা ছড়িয়েছিল,
সেগুলি থেকে তারা সংগ্রহ করত প্রজ্ঞা ও তত্ত্বের সম্পদ।
কোন নিভৃত গ্রামাঞ্চলের এক বীর সন্তান
বর্ষীয়ান সাহসী জ্ঞানী ও দানশীল—

আদিম যুগের সেই ইতিকথার খোঁজে তৎপর হোল,
কাহিনীগুলোর উদ্ধার-মানসে সে ঘুরে বেড়ালো বহুদিন।
ফিরলো সে বহু নগরীর পথে পথে,
ফলে সংগৃহীত হোল এই গাথা।
সবারই কাছে সে জিজ্ঞাসা করেছে
কেয়ানী বংশের আদিম ইতিহাস,
জেনেছে সে তাদের থেকে যশস্বী সেই নক্ষত্রের পরিচয়।
জেনেছে, সেই আদিম যুগে রাজারা কেমন করে শাসন
করতেন পৃথিবী,
আর আজ কেমন করে লুপ্ত হয়েছে সেই কীর্তিকলাপ ?
প্রশ্ন করেছে সে, কেমন করে অস্ত গেলো সেই সুভগ নক্ষত্র,
কাল কেমন ছিল সেই বীরবৃন্দের উপর ?
দলপতিগণ একে একে বিবৃত করেছেন তার কাছে
রাজ-রাজড়াদের কীর্তিগাথা ও জগতের পরিবর্তনের ইতিহাস।
সেই বীর-জ্ঞানী তাঁদের কাছ থেকে জেনেছে অতীতের সব কীর্তি,
তারপর সেই সংগ্রহ থেকে রচিত হয়েছে এক মহান পুরাণ কথা।
জগতে সেই গাথাই হয়ে আছে অতীতের স্মৃতি,
সর্বত্র জ্ঞানী ও ধর্মবেত্তা জানিয়েছে তাকে স্বাগতম্।

কবি দাকীকীর কাহিনী[৩]

এই সংগ্রহ থেকে অনেক কাহিনী
কথকগণ তাদের শ্রোতাদেরকে পড়ে শোনাতো।
জগতের হৃদয় যেন এই সব উপাখ্যানের মধ্যে
সযত্নে রক্ষিত ছিল,
তাই জ্ঞানী ও মূর্খ সবারই মনোরঞ্জন করতো এই গাথা।
একদা এক মুক্ত-রসনা যুবকের আবির্ভাব হোল,
সে ছিল কবি, সুন্দর স্বভাব ও উজ্জ্বলমনা।
আমাকে সে বললো, এই গাথাকে আমি সাজিয়েছি
কবিতার মালায়,
সেই কবিতা মনোরঞ্জন করছে আসর ও মণ্ডলীর।
কিন্তু কবির যৌবন ছিল সেই অসৎ বন্ধুবর্গের অনুরক্ত—
যারা সর্বদা লিপ্ত থাকতো ঝগড়া ও কলহে।
একদিন সহসা তারা কবিকে আক্রমণ করলো এক লৌহদণ্ড নিয়ে
ও তদ্দ্বারা মাথায় আঘাত করে করলো তার প্রাণ সংহার।
এইভাবে অসতের প্রতি অনুরক্তির মূল্য শোধ হলো
এক মধুময় জীবনের বিনিময়ে,
জগতের সুখ-ভোগ সেই কবির ভাগ্যে স্থায়ী হোল না দীর্ঘদিন।
সহসাই যেন অস্তমিত হোল তার ভাগ্যের সূর্য,—
এক উন্মাদের হাতে হোল তার জীবনের অবসান।

৩ কবি দাকীকীর রচিত অসম্পূর্ণ শাহ্নামার অংশবিশেষ ফিরদৌসী তাঁর শাহ্নামার অন্তর্ভুক্ত করেছেন বলে জানা যায়। তবে কোন্ অংশটি দাকীকীর রচিত তা জানা যায় না। মনে হয়, সেই রচনা ফিরদৌসী কর্তৃক সংস্কৃত হয়ে আত্মগত হয়েছে।

গুশ্‌তাসপ ও আরজাস্‌পের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত
কত না লোক হয়েছে গত,
দিয়েছে তারা বাণী, আর প্রয়াণপর হয়েছে কালের পথে।
দাকীকীও চলে গেলো আর রেখে গেলো এই অসমাপ্ত গাথা ;
তার জাগ্রত ভাগ্য হোল চিরনিদ্রায় অভিভূত।
হে খোদা, তুমি তার স্খলন ও ত্রুটি মার্জনা করো,
এবং সমুন্নত করো তার পদমর্যাদা হাশরের দিনে।

গ্রন্থের ভিত্তি স্থাপন প্রসঙ্গে

আমার অন্তর আলো লাভ করলো দাকীকীর থেকে,
এবং বাদশার সিংহাসনের দিকে করলো দৃষ্টিপাত।
তার গাথা যখন আমার হাতে এলো
তখন উপাখ্যানদল গ্রন্থ থেকে উঠে এসে সমাসীন হোল
আমার রসনায়।

আমি জ্ঞান লাভে তৎপর হলাম কত না লোকের কাছ থেকে,
এবং সন্ত্রস্ত হলাম কালের গতির দিকে চেয়ে।
আমার বিলম্বের কথা চিন্তা করে
এই কর্তব্য অন্যকে সমর্পণ করতে চাইলাম।
কিন্তু অপর কারো জন্যে অনুকূল হোল না নক্ষত্র,
দেখলাম, আমার দুঃখের ক্রেতা কেউ নেই।
যুদ্ধবিগ্রহে পরিপূর্ণ ছিল যুগ,
অন্বেষণকারীর জন্য দুনিয়া ছিল অতীব সংকীর্ণ।
এইভাবে কাটিয়ে দিয়েছি এক যুগ,
বাণীকে লুক্কায়িত রেখেছি নিজের মধ্যে।
পাইনি কাউকে সহানুভূতিশীল,
পাইনি কাউকে আমার কাব্যের সমঝদার।
সুন্দর বাণীর আদর আছে কি এই জগতে?
সম্মানিতগণ কি জানান তাকে সাদর সম্ভাষণ?
বিশ্ব-প্রভুর কাছ থেকে যদি না আসতো বাণীর সমাদর,
তবে নবীবরের আশীর্বাদ করে আমাদের ভাগ্যে ঘটতো?
আমাদের নগরীতে ছিলেন আমার এক সহৃদয় বন্ধু,
লোকে বলে, আমরা ছিলাম এক-দেহ-এক-আত্মা।

একদিন তিনি বললেন, তোমার বাসনাকে আমি স্বাগত জানাই,
আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ কর তুমি এই দায়িত্ব।
এক পহ্লবী গাথা[৪] তুমি রচনা কর আমার জন্যে,
আমি তোমার সামনে এনে উপস্থিত করছি আগের দিনের
সকল গীতিকা।

তুমি মুক্ত-রসনা ও নব-যৌবনশালী,
বীররসমূলক কাব্য-বাণী কর উৎসারিত।
বাদশাদের প্রাচীন কীর্তি আবার তুমি নতুন করে
কর উজ্জীবিত,
এবং তদ্দ্বারা সম্মানিতগণের কাছ থেকে লাভ কর
সম্মান ও মর্যাদা।
এইভাবে সেই গাথা যখন আমার সামনে এলো,
তখন সহসা উদ্দীপ্ত হোল আমার প্রাণের অন্ধকার গুহা।

৪. প্রাচীন ফারসীকে পহ্লবী বলা হয়। ফিরদৌসী তাঁর রচনাকে আরব-প্রভাব মুক্ত করে প্রাচীন পহ্লবীর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন বলে দাবী করতেন। ফারসী ভাষাকে সাধারণভাবেও পহ্লবী বলা হয়ে থাকে।

আবু মুহম্মদ বিন মনসুরের প্রশংসায়[৫]

এই গাথা রচনায় যখন আমি হাত দিয়েছি
তখন এদেশে বাস করতেন এক আত্মপ্রত্যয়শীল সম্মানিত ব্যক্তি।
তিনি ছিলেন যৌবনের অধিকারী ও বীর-বংশোদ্ভূত,
তাঁর সজাগ এবং উজ্জ্বল হৃদয় ছিল জ্ঞানের আকর।
তাঁর বিবেকবান ব্যক্তিত্ব ছিল লজ্জার প্রতিমূর্তি,
তাঁর বাক্‌ভঙ্গী ছিল মৃদু ও মনোরম।
একদিন তিনি আমায় বললেন, তোমার বর্ণনা শক্তি যদি
কাব্যকেই করে থাকে আশ্রয়, তবে বল, কি আমায় করতে হবে?
আমার নিকট রয়েছে এক মূল্যবান মুক্তা সেই আমার পুঁজি,
তোমাকে তাই করছি সমর্পণ—এ বস্তু আমি কোন মানুষের
থেকে, পাই নি।
এই মুক্তা ঠিক একটি তাজা আপেলের মতো --
বিশ্বাস করো, লুণ্ঠন কিংবা রাজকোষ থেকেও আসে নি সেই রত্ন।
আমি মৃত্তিকাতল থেকে উত্থিত হলাম সপ্তাকাশের শনি গ্রহে,
সেই ভাগ্যবান মহাপুরুষের স্পর্শ যেন আমাকে রূপান্তরিত করলো।
তাঁর দৃষ্টিতে পরিবর্তিত হোল আমার ধূলি রজতে ও কাঞ্চনে,
মাহাত্ম্য তাঁর থেকে সংক্রমিত হয়ে হোল সুন্দর মহনীয়।
পৃথিবী যেন তাঁর তুলনায় তুচ্ছ মনে হোল,
আহা, তিনি ছিলেন যৌবনশালী ও প্রেমদাতা!

৫. কবির জন্মভূমি তূস নগরের কোন ধনিক ব্যক্তি—ফিরদৌসীর প্রথম পৃষ্ঠপোষক। তুস নগরেই কবি শাহ্‌নামা রচনায় হাত দেন। সুলতান মাহ্‌মুদের আদেশে শাহ্‌নামা রচনার যে-ধারণা প্রচলিত আছে, এই কারণে তা সংশয়াতীত নয়।

এইরূপ যশস্বী মহাপুরুষও একদিন আসর থেকে অন্তর্ধান করলেন,
যেন বাতাঘাতে উন্মূলীত হোল সুদর্শন দেবদারু।
হায়, আর তাঁকে দেখতে পেলাম না—জীবন্ত কি মৃত,
মানুষ-ধরা কুমীরদের হাতে তাঁকে দিতে হোল প্রাণ।
তখন থেকেই হৃদয়ে আমার হতাশা প্রবিষ্ট হোল,
উচ্চাশা প্রকম্পিত হোল স্রোতাহত বেতসের মতো।
ধিক্ সেই অশুভ লগ্ন ও বর্ষ,
ধ্বংস হোক সেই স্থান যেখানে এই রাজ-সদৃশ মহাপুরুষের উপর
পতিত হয়েছিল শত্রুদল।

সেই মহাপুরুষের একটি উপদেশ আজ আমার মনে পড়েছে,
তারি সাহায্যে আমি উত্তীর্ণ হলাম নিরাশা থেকে আশার উপকূলে।
তিনি বলেছিলেন, বাদশাদের এই গাথা
যদি কাব্যাকারে লিখবার বাসনাই করে থাক,
তবে বাদশাদেরই করো তা উৎসর্গ
যখন তাঁর এই উপদেশ বাণী স্মরণে এলো
তখন ধরলাম সেই পথ,
হৃদয় আমার শান্ত হোল, হোল তা আবার সুখী ও স্বচ্ছন্দ।
এই 'নামা' (শাহ্‌নামা) তখন উৎসর্গ করলাম
সেই উচ্চশির বাদশার নামে—
যিনি অধীশ্বর তাজ ও তখতের
যিনি বিজয়ী ও শাহানশাহ এবং অধিকারী এক জাগ্রত ভাগ্যের।

সুলতান মাহমুদের প্রশংসায়[৬]

বিশ্ব-স্রষ্টা যখন থেকে সৃষ্টি করেছেন এই বিশ্ব
তখন থেকে এমন বাদশা আর আবির্ভূত হয় নি।
কালের দিগন্তে সূর্যের মতো তাঁর রাজমুকুট যখন মাথা তুললো
তখন তাঁর কীর্তির আভায় শুভ্রোজ্জ্বল হোল ধরণী।
কে এই দীপ্তিমান সূর্য—
যার থেকে ধরণীতে ক্রমান্বয়ে বিস্তৃতি লাভ করেছে আলোকরাশি ?
তিনি জাগ্রত-ভাগ্য সম্রাট আবুল কাসেম—
সূর্যসদৃশ রাজমুকুট শিরে তিনি তখ্‌তে সমাসীন।
পূব থেকে পশ্চিম সর্বত্র তাঁর রূপের আভায়
প্রকটিত হয়েছে সোনার খনি।
আমার ঘুমন্ত নক্ষত্রও হয়েছে জাগ্রত,
মস্তিষ্কে আমার চিন্তারাশি হয়েছে চঞ্চল।
বুঝলাম, কবিতার যুগ সমাগত হয়েছে,
প্রাচীন ও বৃদ্ধ কাল এখন লাভ করবে নবযৌবন।
এই দুনিয়াপতির কল্পনায় যেন আমি ঘুমিয়েছিলাম
এক অন্ধকার রাত্রির মতো, ভোরের সম্ভাবনা নিয়ে।
সেই কুহেলী রাতে প্রবিষ্ট হোল তাঁর আলো,
খুলে দিলো তা আমার ঘুমের বাতায়ন ও মুক্ত করলো রসনার গ্রন্থি।
স্বপ্নে আমায় দেখা দিল তাঁর উজ্জ্বল দিঠি,

৬. সুলতান মাহমুদের উপর অপমান-সূচক যে-বিখ্যাত ব্যঙ্গ কবিতাটি কবি লিখে-ছিলেন পাক-ভারতীয় সকল সংস্করণেই তা শাহ্‌নামার ভূমিকা হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু ইরানীয় সংস্করণে তেমন নেই। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, মাজান্দিরানের অধিপতি শাহ্‌রিয়ার সুলতানের দুর্নাম অপনোদনের প্রয়াসে কবির

যেন সাগর থেকে ধীরে ধীরে উঠে আসছে এক প্রভাময় প্রদীপ।
সারা পৃথিবীর জমরুদ বরণী রাত
সেই দীপালোকে ফুটে উঠলো সূর্যকান্ত মণির মতো।
সমস্ত দ্বার বাতায়ন সজ্জিত হোল উৎসব-সাজে,—
আরোহণ করেছেন বিজয়ী রাজা তাঁর বজ্র সিংহাসনে।
তিনি বসেছেন যেন পূর্ণচন্দ্র,
তাঁর শিরে শোভিত হচ্ছে আভাময় মুকুট।
সৈন্যদল ক্রোশাবধি পথ জুড়ে সারি বেঁধে দণ্ডায়মান রয়েছে,
এবং তাঁর বাঁয়ে সজ্জিত রয়েছে সাতশো মদমত্ত করী।
তাঁর সমীপে কার্যকরী হচ্ছে এক পবিত্র বিধি—
ন্যায়পরতা ও ধর্মের পথে সে-ই হোল সম্রাটের পথ-প্রদর্শক।
বাদশার এই সমারোহ দেখে আমার মস্তিষ্ক ঘূর্ণিত
ও চক্ষু অন্ধকার হোল,—
এতো মদমত্ত হস্তী এতো সৈন্য!
বাদশার প্রভাবশালী মুখ সন্দর্শন করে
আমি একজনকে প্রশ্ন করলাম,—
একি পূর্ণচন্দ্র শোভিত আকাশ না রাজসভা,
একি তারাদল না সৈন্যশ্রেণী?
বন্দী উচ্চারণ করলো, ইনিই রোম ও হিন্দুস্তানের সম্রাট,
রাজ্য তাঁর বিস্তৃত কনৌজ থেকে সিন্ধুনদের পাদদেশ পর্যন্ত:
ইরান ও তুরান তাঁর পদানত,
তাঁরই ফরমান থেকে তারা লাভ করছে জীবন।

কাছ থেকে কবিতাটি মূল্য দিয়ে কিনে নেন। বস্তুতঃ শাহনামা রচনার পরবর্তী এক দুর্ঘটনা থেকেই তার উৎপত্তি বলে গ্রন্থ মধ্যে তা সন্নিবেশিত করার পক্ষপাতী আমরাও নই। কিন্তু এই অনুবাদের 'ভূমিকায়' শাহ্‌নামার ঐতিহাসিক ভিত্তিভূমি আলোচনা প্রসঙ্গে কবিতাটির পুরোপুরি অনুবাদই দেওয়া হোল।

তাঁর ন্যায় বিচারে ধরণীতল সুন্দর হয়েছে,
শোভিত হয়েছে তাঁর শিরে ন্যায়ের রাজমুকুট।
জগৎপতি মহান বাদশা মাহ্‌মুদ—
তাঁর শাসনে একই জলাশয়ে জলপান করে নেকড়ে ও মেষ শাবক।
কাশ্মীর থেকে চীন সাগব পর্যন্ত
সকল রাজা কীর্তন করেন তাঁর গুণাবলী।
শিশু তার মাতৃস্তন-জাত দুগ্ধে সিক্ত ওষ্ঠাধরে
দোলনা থেকে প্রথমবাব উচ্চারণ করে যে-শব্দ
তা 'মাহ্‌মুদ'।
যদি হয়ে থাক কবি তবে তুমিও কীর্তন কর তাঁর গুণাবলী,
সেই চিরজীবীর নাম নিয়ে তৎপর হও তোমার প্রচেষ্টায়।
কেউ মুখ ফিরায় না তাঁর আদেশের আনুগত্য থেকে,
তাঁর শাসনকালে কেউ প্রত্যক্ষ করেনি ধ্বংস কিংবা বরবাদী।
আমি জাগ্রত হয়ে শুরু করলাম আমার অন্বেষণ
তাঁরই সমীপ থেকে,
আহা, আমার অমানিশি কি সম্পদই না রেখেছিল
গোপন করে।
এই মহান সম্রাটের প্রতি আমি কি জানাব না স্বাগত সম্ভাষণ?
আমার প্রাণের ঐশ্বর্য কি ঢেলে দেব না তাঁর পদতলে?
হৃদয়কে বললাম,' ওগো হৃদয়, তোমার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে,
কেননা তাঁর সম্ভাষণ দুনিয়ায় সূচনা করে সৌভাগ্যের।
সম্পূর্ণ কর তোমার আমন্ত্রণসূচক গুণকীর্তন তাঁরই উপর,
ভাগ্য সুপ্রসন্ন তাঁর প্রতি—তিনি রাজমুকুট ও অঙ্গুরীয়ের স্রষ্টা।
তাঁর সমারোহে ধরণী রূপান্তরিত হয়েছে মাধবী বনে,
বাতাসে ভাসমান হয়েছে মেঘদল ও পৃথিবী হয়েছে
সুচিত্রিত বর্ণ-সুষমায়।

মেঘেরা টেনে এনেছে সজল প্রাবৃট্
আর পৃথিবীকে দিয়েছে নন্দন বনের ঘনগৌরব।
ইরানের সকল সৌন্দর্য তাঁরই দান,
সর্বত্র লোক সকল তাঁরই বদান্যতায় সুরঞ্জিত।
আসরে তিনি বিশ্বস্ততা ও উদারতার মহাকাশ,
রণভূমিতে তিনি আজদাহার ভয়ঙ্কর থাবা।
দেহে তিনি মদমত্ত করী—প্রাণে স্বর্গীয় দূত জিব্রাইল,
হাতে তাঁর বসন্ত কালের শুভ বাদল—অন্তরে প্রবাহিত
নীলনদের ধারা।

অসূয়ক তাঁর ভয়ে পলায়নপর,
স্বর্ণমুদ্রা তাঁর চোখে ধূলিবৎ।
কোন বীরই ছিনিয়ে নিতে পারে না তাঁর থেকে রাজমুকুট
ও রাজসম্পদ,
কোন দুঃখ কিংবা যুদ্ধের ভয়াবহতা তাঁর হৃদয়কে করতে পারে না
অন্ধকার।

প্রজাদের মধ্যে সবাই—
স্বাধীন নাগরিক কিংবা অনুগত দাস—
সম্রাটকে ভালবাসে অন্তর দিয়ে,
সবাই উদ্বুদ্ধ হয় তাঁর আদেশে।
প্রত্যেক রাজা তার রাজ্যে
নিশ্চিত মনে রাজ্য শাসন করে তাঁর নাম নিয়ে।
তাঁর অনুজ—সুলতানের এক বছরের ছোট তিনি';—[৭]
অনুপম তাঁর চরিত্র ও গুণাবলী।
বাদশার গুণকীর্তন করাই নসরের বৈশিষ্ট্য,
যুগ-সম্রাটের রাজদণ্ডের ছায়াতলে নিত্য বর্ধিত হয় তাঁর আনন্দ

৭. তাঁর নাম আমীর নসর। তিনি সুলতান মাহ্মুদের অনুজ ছিলেন। বারোটি পংক্তিতে কবি তাঁরই প্রশংসা কীর্তন করেছেন।

তিনি ছিলেন পিতা নাসিরুদ্দীনের বুকের মানিক—
সেই নাসিরুদ্দীন যাঁর সিংহাসন ছিল সপ্তর্ষির শিরোপা।
তিনি বীর, জ্ঞানী ও প্রতিভাবান,
তাঁর সান্নিধ্যে আনন্দ লাভ কবেন আমীর ওমরাগণ—
বিশেষ করে তূসেব সেনাপতি তার প্রিয়পাত্র,
সিংহেব সঙ্গে যুদ্ধে যে প্রদর্শন করেছিল অদ্ভুত ক্রীড়াকৌশল।
যোগ্যদের সবাইকে তিনি দান করেছেন স্বর্ণমুদ্র,
এবং যারাই আকাঙক্ষা করেছে কীর্তি তারাই পেয়েছে তাঁর
পৃষ্ঠপোষকতা।

বিশ্ব-প্রভুর কাছ থেকে আসবে নির্দেশ মানুষের প্রতি,
সেই নির্দেশকে তারা লাভ করবে বাদশার সমীপ থেকে।
হে খোদা, পৃথিবী যেন সম্রাটের রাজমুকুট থেকে কভু বঞ্চিত না হয়,
বাদশা যেন যুগ যুগ ধবে তরুণ ও উৎফুল্ল থাকেন।
তাজ ও তখত নিয়ে তিনি চিবকাল জীবিত থাকুন,
দূর হোক তাঁর থেকে দুঃখ বেদনা, হোন তিনি চিরজয়ী।
এবার আমি প্রত্যাবর্তন করছি আমার কাহিনীর সূচনার দিকে,
যশস্বী বাদশাদের কীর্তিমূলক শাহনামা শুরু করছি।

কাহিনীর সূচনা

[ইরানের প্রথম বাদশা কায়ুমুর্‌স্‌ ত্রিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন]

আদিম কালে এক গ্রাম্য কবি প্রশ্ন করেছিল,
পৃথিবীতে কে প্রথম অন্বেষণ করেছে মাহাত্ম্যের রাজমুকুট?
কে সে, যার শিরে শোভিত হয়েছিল তাজ?
সেই সুদূর অতীতের কথা আজ কি কারো মনে আছে?
কিন্তু ছেলে তার পিতার মুখ থেকে শোনে বিগত দিনের কথা,
তারপর সে তোমাকেও বলে যায় হুবহু সে-মতোই।
কোন্‌ সেই পুরুষ যিনি মাহাত্ম্যকে করেছিলেন লোক-চক্ষুর গোচর?
কার প্রতিপত্তি ও সুনাম সকলকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল?
ওগো প্রাচীন দিনের সত্য অন্বেষণকারী,
বল, বীরদের মধ্যে কোন্‌ মহৎ প্রতিভা সূচনা করেছিল কাহিনীর?
লোকে বলে, এই তখ্‌ত ও তাজ দুই-ই এনেছিলেন কায়ুমুর্‌স্‌,
তিনিই ছিলেন দুনিয়ার প্রথম বাদশা।
সূর্য যখন সিংহরাশির চক্র-সীমায় এসে উপস্থিত হোল,
তখন পৃথিবী প্রদক্ষিণরত হোল সৌভাগ্য সমারোহ ও নিয়ম-
শৃঙ্খলাকে ঘিরে।
মেষ রাশিতে তার ঔজ্জ্বল্য আরো বর্ধিত হোল,
পৃথিবী উপনীত হোল যৌবনের সীমায়।
কায়ুমুর্‌স্‌ হোলেন পৃথিবীর অধিস্বামী,
প্রথমে পর্বত ছিল তাঁর নিলয়।
সেই পর্বত থেকেই সূচনা হয়েছিল তাঁর সৌভাগ্যের
এবং সিংহাসনের,

ব্যাঘ্রচর্ম-পরিহিত অবস্থায় এসেছিলেন তিনি ও

তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ।

পর্বত থেকেই আসতো জীবিকা,

নূতন নূতন খাদ্য ও পরিধেয়।

ধরণী-বক্ষে প্রবল প্রতাপে তিনি রাজত্ব করেছিলেন

ত্রিশ বছর ধরে—

যেমন সূর্য শাসন করে তার অধিকৃত অঞ্চল।

সিংহাসনারূঢ় বাদশার রূপ ছিল ভুবন-মোহন,

যেমন দেবদারু বনের মাথায় শোভা পায় চতুর্দশ যামিনীর পূর্ণচন্দ্র।

হরিণাদি চতুষ্পদ তাঁর দৃষ্টি দ্বারা আকর্ষিত হোত,

বনভূমি ছেড়ে তারা আসতো তাঁর কাছে বিশ্রামলাভের আশায়।

তারা এসে অবনমিত হোত রাজাসনের পদতলে,

আর তার থেকে বাদশার সৌভাগ্য ঊর্ধ্বগামী হোত

সহস্র-শিখায়।

উপাসনার রীতি সেই থেকেই প্রচলিত হয়েছিল,

সেখান থেকেই ধর্ম ছড়িয়েছিল তার শিকড়।

কায়ুমুর্সের এক সুদর্শন পুত্র ছিল,

পিতার মতোই সে ছিল বুদ্ধিমান ও যশঃকামী।

সেই ভাগ্যবানের নাম ছিল সিয়ামক,

তার দর্শনে কায়ুমুর্স্ পেতেন জীবনের স্বাদ।

পৃথিবী তার সুন্দর মুখ দেখে ফুল্ল হোত,

এবং বৃক্ষশাখা অবনমিত হোত ফুলভারে।

তার প্রশ্বাস আকর্ষণ করে আনতো ধরণীতে সজল বর্ষাঋতু,

তার বিচ্ছেদের আশঙ্কায় তাপদগ্ধ হোত প্রান্তর ও উপত্যকা।

দুনিয়ার রীতি অনুযায়ী এই পুত্রের দ্বারা

পিতার বাহু অধিকতর শক্তিশালী হয়েছিল;

এবং দীর্ঘদিন ধরে কৃতকার্যতা ও উজ্জ্বলতা
তাকে অনুসরণ করেছিল বিশ্বস্ত বন্ধুর মতো।
দুনিয়ায় তার কোন শত্রু ছিল না,
কেবল অন্তরালে গুপ্ত ছিল এক কুটিল দানবের নখ-দন্ত।
অনিষ্টকামী সেই দানবের মধ্যে একদিন ঈর্ষার সঞ্চার হোল,
যুদ্ধ-মানসে সে উদ্বেলিত করলো তার কেশর-কলাপ।
দানব-দলপতির এক পুত্র ছিল – নেকড়ের মতো
বিদ্যুৎগতি ও বলবান,
অভিজ্ঞ সৈনিকের কাছেও তার সাহস ও বীর্যবত্তা লক্ষণীয় হোত।
সেই দানব-সন্তান একদিন যুদ্ধবেশে সজ্জিত হয়ে বের হোল,
এবং অভিযান করলো বাদশার দেশ ও সিংহাসনের অভিমুখে।
দানবের পদধূলিতে ধরণীর আকাশ অন্ধকার হোল,
অন্ধকার হোল সিয়ামক ও বাদশা দুয়েরই ভাগ্য।
পথে পথে সে ব্যক্ত করে চললো তার গূঢ় অভিপ্রায়,
পৃথিবীর সর্বত্র সে প্রতিধ্বনিত করলো তার কণ্ঠস্বর।
কায়ুমুর্স তার অভিযানের কথা জানতে পেলেন,
জানতে পেলেন তার অসাধু অভিপ্রায়ের লক্ষ্যের কথাও।
এমন সময় সহসা আকাশ-বাণী হোল,
এবং সঙ্গে সঙ্গে আবির্ভূত হোল পরীদল ও ব্যাঘ্রচর্মধারী দেবযোনীগণ;
তারা রাজ-পিতাকে বললো,
শত্রু তোমার পুত্রের দেখা চায়।

দানবের হাতে সিয়ামকের নিধন

এই সংবাদ সিয়ামকের কর্ণগোচর হোলে
সে দুষ্ট দানবের অভিপ্রায় বুঝতে পারলো।
সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনায় উদ্বেলিত হোল যুবরাজের অন্তর,
সৈনিকদের উপস্থিতিতে সে ধারণ করলো যোদ্ধৃবেশ;
দেহ সজ্জিত করলো ব্যাঘ্রচর্মে,
কারণ, বর্মদ্বারা অঙ্গ আচ্ছাদিত করা সেকালে যুদ্ধের রীতি ছিল না।
তারপর যুদ্ধকামী দানবকে সে আহ্বান করলো,
প্রতিপক্ষও রণসাজে সজ্জিত ছিল।
সিয়ামক নেমে এলো,—তনু তার অনাচ্ছাদিত;
দানব-সন্তানকে সে ধারণ করলো যুদ্ধালিঙ্গনে।
কৃষ্ণকায় দানব তখন পাঞ্জা বিস্তার করে কুমারকে ধরলো,
আর উবু হয়ে তুলে নিলো তাকে শূন্যে।
তারপর সে ছুঁড়ে মারলো কুমারের দেহ মাটির উপরে,
এবং তীক্ষ্ণ নখরে ছিন্নভিন্ন করে দিল তার কলিজা।
এইভাবে সিয়ামক দুষ্ট দানবের হাতে নিহত হোলে,
তার বন্ধু-আসর নির্জীব ও প্রাণহীন হোল।
বাদশা শুনতে পেলেন পুত্রের মরণ সংবাদ
তাঁর চোখে অন্ধকার হোল দশদিক।—
তিনি কাঁদতে কাঁদতে সিংহাসন থেকে নেমে এলেন,
ও স্বীয় বক্ষ নখের আঁচড়ে ক্ষত-বিক্ষত করলেন।
তাঁর দু'গণ্ডে প্রবাহিত হোল অশ্রুর ধারা
তাঁর দেহ ও রাজ্য হতশ্রী হোল।

সৈন্যগণ উত্থিত করলো বিলাপধ্বনি ও অশ্রুবন্যা
প্রবাহিত করলো,
শোকের আগুনে পুড়ে খাক হোল তাদের কলিজা।
তাদের মধ্যে হতাশা নেমে এলো।
সারি বেঁধে তারা এসে দণ্ডায়মান হোল প্রাসাদের দ্বারে ;—
পরিচ্ছদ তাদের শোক-চিহ্ন প্রকাশক নীলবর্ণে চিত্রিত,
চোখে রক্তাশ্রু ও মুখমণ্ডলে গভীর বেদনার ছায়া।
হরিণাদি চতুষ্পদ ও বিহঙ্গদল একত্রিত হয়ে
ক্রন্দনরত অবস্থায় পর্বতাভিমুখে এগিয়ে গেলো।
শোক ও বেদনা ভাবাক্রান্ত মন নিয়ে
সৈন্যদল রাজপ্রাসাদ থেকে নির্গত হোল।
দীর্ঘ একটি বছর সবাই শোকে মুহ্যমান হয়ে বসে রইলো,
তারপর বিশ্ব-প্রভুর কাছ থেকে এলো সান্ত্বনা।
শুভসন্দেশবাহী আকাশবাণী হোল,—
ক্রন্দন আর নয়, এবার আত্মস্থ হও।
সেনাদল সজ্জিত করো এবং মান্য কর আমার ফরমান,
নিজ নিজ চক্র থেকে বেরিয়ে এসো সবাই।
দুষ্ট দানবের অত্যাচার থেকে ধরিত্রীবক্ষ পবিত্র কর,
সজ্জিত কর তাকে সকল সুষমায়।
আকাশ-বাণী পেয়ে বাদশা আকাশকে উৎসর্গ করলেন
তাঁর সকল দুঃখ ও বেদনার ভার।
তিনি বিশ্বপ্রভুর মহান নাম উচ্চারণ করলেন,
আর সেই নাম-মহিমায় মুছে নিলেন চোখ থেকে অশ্রু।
তারপর সিয়ামকের রক্তের প্রতিশোধ-প্রয়াসে ত্বরান্বিত হয়ে
তিনি দিবা-রাত্রির বিশ্রাম ও ঘুমকে বিসর্জন দিলেন।

কৃষ্ণকায় দৈত্যের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য কায়ুমুর্‌স্‌ ও হোশঙ্গের যাত্রা

সিয়ামকের এক ভাগ্যবান পুত্র ছিল,
পিতামহের কাছে সে-ই ছিল যুবরাজস্থানীয়।
তার নাম ছিল হোশঙ্গ,—
সে ছিল জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার জীবন্ত প্রতিমূর্তি।
পিতামহের চোখে সে তার পিতার স্মৃতি,
পিতামহের প্রতিপালিত সে এক সিংহ-শাবক।
পিতামহের অন্তরে তার স্থান ছিল পুত্রেরই মতো
কখনো তিনি তাকে চোখের আড়াল করতেন না।
যখন বাদশার হৃদয়ে যুদ্ধাকাঙ্খা প্রবল হোল,
তখন তিনি সুযশ হোশঙ্গকে কাছে ডাকলেন।
এবং তার কাছে বিবৃত করলেন সকল বৃত্তান্ত,
তার অজানা সকল গোপন কথা অবারিত করলেন।
তারপর বললেন, এক সৈন্যদল আমি তোমায় সোপর্দ করতে চাই,
আমার শোক সমর্পণ করতে চাই তোমার উপর।
তুমি গ্রহণ করবে আমাদের নেতৃত্ব,
নূতন সেনাপতির অধীনে আমরা যুদ্ধযাত্রা করবো।
পরীদল ও ব্যাঘ্র আমরা জমায়েত করবো,
হিংস্র নেকড়ে ও সিংহদল করবে তোমার অনুগমন।
বাদশার আদেশে সবাই এলো—
এলো সৈন্যদল ও বন্য পশুবল, এলো উড়ন্ত বিহঙ্গ শক্তি ও দ্রুতধাবমান অশ্ব।
সৈন্য-সামন্ত ও পশুদল, উড্ডীয়মান বিহঙ্গ ও পরীদল—
অভিজ্ঞ সেনাপতি ও সাহসী বীরবৃন্দ নিয়ে যুবরাজ যাত্রা করলেন।

সৈন্যদলের পশ্চাতে রইলেন বাদশা কায়ুমুরস্,
আর বীরবৃন্দের মাঝখানে শোভাবর্ধন করলো স্নেহাশীষ-শিরে
স্বয়ং রাজ-পৌত্র।

ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে কৃষ্ণকায় দৈত্য বেরিয়ে এলো,
সেই দৃশ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হোল ধূলিরাশি।
হিংস্র পশুদলের ভীম গর্জনে দৈত্যের তীক্ষ্ণ নখর
নৈরাশ্যে থাবার মধ্যে প্রবিষ্ট হোল।
দুইদল পরস্পরের সম্মুখীন হোলে
পশুদলের বীর্যবত্তায় পর্যুদস্ত হোল দৈত্যদল।
যুবরাজ হোশঙ্গের হাতে ব্যাঘ্র-নখর দৈত্য-রাজ বন্দী হোলে
দুর্জয়-দানবের জন্য ধরণী আবার সঙ্কুচিত সঙ্কীর্ণ হোল।
যুবরাজ দৈত্যকে কঠিন বন্ধনে বন্দী করলেন,
এবং অচিরেই তাঁর আদেশে দৈত্যের কণ্ঠচ্ছেদ পর্ব
সমাপ্ত হোল।

পদদলিত অপমানিত ও ছিন্নভিন্ন দৈত্যরাজ;—
বিদ্রোহের পরিণতি স্বরূপ মাটির উপর পড়ে রইলো তার
নিষ্প্রাণ দেহ!

এইভাবে জিঘাংসা পরিতৃপ্ত হোলে
কায়ুমুরসের জীবন-সূর্য অস্তমিত হওয়ার লগ্ন এলো।
তিনি চলে গেলেন। তাঁর মতো প্রজানুরঞ্জক কোন্ নরপতি—
এবার তথ্‌তে আসীন হোলেন, চল তাই আমরা
এখন দেখতে যাই।

দুনিয়া কপটাচারীর আড়ম্বরকে ধূলিসাৎ করে,
সে লাভের পথে পা বাড়ায় কিন্তু পরিণামে তাকে হারাতে হয় মূলধন।
জগৎ কাহিনী বৈ নয়,
ভালো-মন্দ দুই-ই এখানে অচিরস্থায়ী।

হোশঙ্গ

[বাদশা হোশঙ্গ চল্লিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন]

বাদশা হোশঙ্গ জ্ঞান ও ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে
পিতামহের তাজ নিজের শিরে ধারণ করলেন।
তাঁর মস্তকের উপর আবর্তিত করলো আকাশ চল্লিশটি বছর,
এই দীর্ঘ-সময় বিজ্ঞতা ও হৃদয়ের উদারতায় ভরপুর হয়ে রইলো।
জাতির নেতার আসনে বসে
তখ্‌তের উচ্চতা থেকে তিনি ঘোষণা করেছিলেন,—
আমি সপ্তরাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি,
সর্বত্র আমি জয়ী, সকল দেশে আমি ফরমান-দাতা।
বিশ্ব-প্রভুর আদেশে আমি বিজয়ী,
তাঁর করুণা ও দয়ায় আমি সকল কাজে উৎসাহী।
তারপর তাঁরই ইচ্ছায় তিনি ধরণীকে আবাদ করেছিলেন,
বদান্যতায় উৎফুল্ল করেছিলেন তাঁর সুন্দর মুখ।
প্রথমেই এক মূল্যবান বস্তু তাঁর লাভ হয়েছিল
শিখেছিলেন তিনি লৌহের ব্যবহার,—প্রস্তর থেকে বিলক্ষণ করে।
সেই ধারালো লৌহের সাহায্যে
কর্তিত হয়েছিল কঠিন শিলা।
এইভাবে লৌহের সাক্ষাৎ পেয়ে লৌহজীবী কর্মকার সম্প্রদায়ের উদ্ভব হোল,
তৈরী হোল কুঠার কাস্তে প্রভৃতি উপকরণ।
তারপর ফসলের উপযোগী পানি
নদী ও জলাশয় থেকে নীত হোল মাঠে ও প্রান্তরে।

স্রোতস্বিনীর কোল ছেড়ে জলধারা পথ ধরলো প্রান্তরের,
বাদশার সৌভাগ্যের দীপ্তিতে মানুষের দুঃখ লঘু হোল।
এইভাবে মানুষ বস্তুর গুণাগুণ অবহিত হয়ে ছড়িয়ে পড়লো জলে-স্থলে
ও নিজের বংশ বৃদ্ধি করে চললো।
প্রত্যেকেই তখন তৎপর হোল স্বীয় জীবিকার অন্বেষণে,
সাধনা এনে দিলো তার হাতে বিভিন্ন সামগ্রী।
জীবিকায় সে প্রতিষ্ঠিত করলো নিজের কর্তৃত্ব,
স্বীয় প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অধিকার ও কৃষিকর্ম হোল নিশ্চিত।
এর পূর্বে মানুষের ইচ্ছার ভূমিকা ছিল নগণ্য,
খাদ্য ছিল তার গাছের ফলমূল মাত্র।
সমস্ত কর্মেই তখন উপকরণের অভাব ছিল,
বৃক্ষপত্র ছিল মানুষের পরিধেয়।
পিতামহের কালেও, জীবন-রীতি এমনি ধরনের ছিল,
মানুষ পূজা করতো বিশ্ব-প্রভুকে।
কিন্তু যখন পাষাণের উপর প্রতিহত হোল আঘাত
তখন তা থেকে বেরিয়ে এলো নৃত্যপরা অগ্নিশিখা।
তার রূপ-গৌরব তখন থেকেই
দুনিয়ার দিক-দিগন্ত আলোকিত করে ছুটলো

অগ্নি-উৎসবের সূচনা

বাদশা একদিন তাঁর পাত্রমিত্র সমভিব্যাহারে
পর্বতসঙ্কুল এক অরণ্য-প্রদেশে ভ্রমণরত আছেন,
এমন সময় সহসা দূরে এক দীর্ঘ বস্তু পরিদৃষ্ট হোল,—
কৃষ্ণবর্ণ, অন্ধকার-কায় ও দ্রুতগতি।
তার দুই চক্ষু থেকে প্রবাহিত হচ্ছে রক্তের দুই ধারা,
আর মুখ-গহ্বর থেকে বিনির্গত ধূম্ররাশিতে
ধরণী অন্ধকার হচ্ছে।
হোশঙ্গ স্থিরমস্তিষ্কে ও দৃঢ়চিত্তে তার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন,
এবং একটি প্রস্তর খণ্ড নিয়ে অবতীর্ণ হলেন সংগ্রামে।
তখন বিশ্ব-অন্বেষণকারী বাদশার সামনে থেকে
বিশ্ব-দহনকারী সর্প লম্ফ প্রদানে প্রয়াণপর হোল।
বাদশা প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ড দিয়ে তাকে আঘাত করলেন,
ক্ষুদ্র এক পাথরের সঙ্গে তা প্রহত হোল।
দুই পাথরের ঠুকাঠুকিতে নিঃসৃত হোল আলো,
চেতনার দর্পণে পড়লো তার প্রতিবিম্ব।
সাপ মরলো না, কিন্তু সেই আগুনের রহস্য
পাথর থেকে জন্ম নিয়ে ছড়িয়ে পড়লো মানুষের মনের
সর্পিল পথে পথে।
তারপর থেকে যে-কেউ পাথরে মারলো লৌহদণ্ড
তার থেকেই বিনির্গত হোল আলো।
পৃথিবীর বাদশা বিশ্ব-প্রভুর সমক্ষে
উচ্চারণ করলেন স্তোত্র ও প্রশংসাবাণী।

ভাবলেন, বিশ্বপ্রভু স্বয়ং আলোময়, এ তাঁরই দান,
আমাদের পূজার উপকরণ রূপেই তিনি তা আমাদের দিয়েছেন।
বললেন, এই জ্যোতিঃ তাঁরই জ্যোতির প্রকাশ ;
এই আগুনের পূজাই বিধেয়।
তারপর রজনী সমাগত হলে প্রজ্জ্বলিত করা হোল অগ্নিকুণ্ড,
বাদশা ও তাঁর লোকজন এসে জমায়েত হোল তার চারদিকে।
সেই রাত্রে এক উৎসবের গোড়াপত্তন হোল, সুরা পানে
নিরত হোল সবাই,
এবং সেই প্রখ্যাত উৎসবের নাম রাখা হোল 'সদ্দা' বা
অগ্নি-উৎসব।
এই উৎসব গাঁথা হয়ে রইলো হোশঙ্গের নামের সঙ্গে,
পরবর্তী বহু বাদশা এর সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন নিজেদের নাম।
এইভাবে দুনিয়াকে আবাদ করে তিনি লোকরঞ্জনের কারণ হলেন,
দুনিয়া তাঁকে মনে রাখলো যুগ যুগ ধরে।
বিশ্ব-প্রভুর থেকে জ্ঞান লাভ করে বাদশা দুনিয়ায় পত্তন করলেন
নিয়ম-শৃঙ্খলার,
বিভক্ত করলেন হিংস্র-ব্যাঘ্রাদির থেকে হরিণাদি চতুষ্পদকে।
দলে দলে আলাদা করলেন গবাদি পশু, খরগোশ ও গর্দভ
এবং প্রয়োজনীয় পশুকে গ্রহণ করলেন চাষাবাদের উপকরণ রূপে।
পৃথিবীর বাদশা হোশঙ্গ বললেন,—
এইসব পশুকে তোমরা জাতে জাতে আলাদা করে রাখ।
এইগুলো তোমরা খাবে আর এইগুলো দ্বারা চাষাবাদ করবে,
আর এইগুলো রাজস্ব হিসেবে রাজসরকারে সমর্পণ করার জন্য
পালন করবে।

পশুদের মধ্যে যাদের লোম সুন্দর ও উত্তম,
তাদেরকে মেরে তাদের চর্ম আকর্ষণ করে নিবে।

সেইসব পশু হোল সঞ্জাব, কাকুম এবং সমূর—
এদের লোম মসৃণ ও তাপ-সঞ্চারক।
এদের চর্ম দ্বারা তৈরী করে নিবে
মানুষের দেহ-সজ্জারূপী সুদর্শন পোশাক।
এইভাবে মানুষকে খাদ্য, পরিধেয় ও জীবন ধারণোপযোগী
উপকরণাদি দান করে
হোশঙ্গ পরলোকগামী হলেন, পেছনে পড়ে রইলো তাঁর
সুনাম ও যশোরাশি।
তাঁর চল্লিশ বছরের রাজত্ব দক্ষতা ও সফলতার
নিদর্শন হয়ে রইলো ;
বদান্যতা ও মহানুভবতা সম্পৃক্ত হোল তাঁর নামের সঙ্গে।
বহু ক্লেশ ও যত্নে রচিত এক সংহিতা তিনি রেখে গেলেন—
মন্ত্র ও জ্ঞানগর্ভ সন্দর্ভে তা ভরপুর।
এইভাবে মহাপ্রয়াণের শুভলগ্ন সমাগত হলে
রাজ-সিংহাসন তাঁর ব্যক্তিত্ব থেকে বঞ্চিত হোল।
কাল আর তাঁকে মুহূর্ত মাত্র অবসর দিলো না,
আহা, জ্ঞানী গুণী স্থিরচিত্ত বাদশা হোশঙ্গ !
দুনিয়া আর তোমায় প্রেমের সঙ্গদান করবে না,
সে আর দেখতে পাবে না তোমার সুদর্শন বদনমণ্ডল !

তহ্‌মুরস

[দানব-দমন বাদশা তহ্‌মুরস ত্রিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন]

বাদশা হোশঙ্গের এক বুদ্ধিমান পুত্র ছিল,
তার নাম ছিল দানব-দমন তহ্‌মুরস।
পিতার সিংহাসনে অধিরূঢ় হলেন সেই সুযশ নায়ক
রাজকার্য পরিচালনায় দৃঢ়তাব সঙ্গে প্রস্তুত হলেন।
দেশেব জ্ঞানী, গুণী ও সৈন্যদেবকে তিনি ডাকলেন,
তাবপর বাগ্মিতার সঙ্গে সম্বোধন করলেন তাদেবকে।
বললেন, আজকের এই দিন, এই সিংহাসন, এই আলয়,
এই বাজদণ্ড ও রাজমুকুট আমাব জন্য শোভন হয়েছে।
এদের সাহায্যে আমি দুনিয়াকে সুপথে পরিচালিত করবো,
এবং এই সিংহাসন থেকেই পৃথিবীকে করবো আমার পদানত।
দুনিয়ার প্রতিটি প্রান্ত সঙ্কুচিত করবো দৈত্যদের জন্য,
কারণ, আমিই হবো দুনিয়ার একচ্ছত্র অধিপতি।
এই পৃথিবীর প্রতিটি কল্যাণকর বস্তুকে
অজ্ঞানতার বন্দীদশা থেকে আমি মুক্ত করে আনবো।
ফলে, ভেড়া ও দুম্বার চিক্কন লোমরাজি
কর্তিত হয়ে প্রবর্তিত হোল পরিধেয় তৈরীর শিল্প।
নিয়ত অনুশীলনে পরিদৃষ্ট হোল তার নব নব বিকাশ,
গালিচা ও সুদর্শন আচ্ছাদনী নির্মিত হোল।
পশুদের মধ্যে যারা ছিল দ্রুতগামী
তাদের খাদ্যের জন্য নির্দিষ্ট হোল সবুজ ঘাস, নাড়া ও যব।
হরিণাদি চতুষ্পদ যা-কিছু দৃষ্টিগোচর ছিল,
তাদেরকে বেছে নেওয়া হোল নেকড়ে ও চিতাদি হিংস্র জন্তু থেকে।

ফাঁদ পেতে তাদেরকে ধরা হোল পর্বত ও বনভূমি থেকে,
দল থেকে বিচ্ছিন্ন করে আনা হোল তাদেরকে বন্ধন রজ্জুতে
আবদ্ধ করে।
বিহঙ্গদল থেকে আনা হোল সৌভাগ্য মূলক হুমাপক্ষী,
উন্নতশির শ্যেন ও শিকারী বাজপাখী।
আনা হোল বুলি-কওয়া-শুক ও কাকাতুয়া—
মানুষের জগতে তারা রচনা করলো আরেক জগৎ।
তাদের আওয়াজে সৃষ্ট হোল সুরের মধুরিমা,
মাধুর্য ও মিষ্টত্ব হোল রসনার লক্ষ্য।
যখন এই পোষা সুকণ্ঠ পাখীদল
লোকালয়ের বাশিন্দা হোল,
তখন ক্ষত-লাঞ্ছিত মানুষের বেদনা-চীৎকার পেলো
সান্ত্বনার স্পর্শ।
এইভাবে যেখানে যা সাজে তা উপস্থিত করে
গুপ্ত কল্যাণকর বস্তু সকল একত্রিত করা হোল।
তারপর বলা হোল, এই সব দানের জন্য শোভন হবে
স্রষ্টার প্রতি প্রণিপাত,
বিশ্ব-প্রভুর প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করা হবে মানুষের ধর্ম।
কারণ, তিনিই আমাদের দিয়েছেন হরিণ ও গবাদি চতুষ্পদ,
তাঁরই স্তোত্রপাঠ আমাদেরকে দেখাবে নতুন নতুন পথ।
তাঁর প্রদত্ত পবিত্র নীতিই হবে আমাদের শরণীয়
কারণ সেই নীতি কর্মের অমঙ্গল থেকে আমাদের রক্ষা করবে।
তাঁর নামে তোমরা আনন্দিত হও সর্বত্র,
সৎকার্য দ্বারা তাঁর নৈকট্য লাভ করে নির্ভয়ে বিচরণ কর।
তাঁর দেয় আহার্য গ্রহণ করে নিত্য তাঁকে স্মরণ কর,
রাত্রির গভীরতার মধ্যে হও তাঁর সমীপবর্তী।
যাঁর হৃদয়ে আছে তাঁর জন্য প্রেম,

দিবা-রাত্রির উপাসনা তার পক্ষে কর্তব্যের মধ্যে গণ্য হয়েছে।
বাদশার ভাগ্য ছিল সুপ্রসন্ন,—
অচিরে দেশ থেকে দূর হোল দুর্নীতি ও দুশ্চারিতা।
বাদশার সমীপ হতে নির্গত হয়ে চললো সততার ধারা,
সরল নীতিজ্ঞান থেকে সদিচ্ছা অগ্রগতির পথ ধরলো।
এইভাবে বাদশা নিজেকে পবিত্র করলেন সমস্ত ত্রুটি থেকে,
বিশ্ব-প্রভুর সমারোহ ও দীপ্তি তাঁর উপব প্রতিবিম্বিত হোল।
এমনি করে তাঁর সৎকর্মের কাফেলা যখন এগিয়ে চললো ধর্মের পথে,
তখন জ্ঞান তাঁর কাছে আরো সুলভ হোল।
একদিন তিনি আহ্‌রিমন্[৮] (শয়তান)-কে পদচ্যুত করে
মন্ত্রদ্বারা তাকে বন্দী করলেন,
সে তখন অত্যন্ত দ্রুতগামী এক ঘোড়ার উপর সওয়ার ছিল।
যুগ যুগ ধরে কালকে তার অনুগামী করার জন্যে
পৃথিবীর চারদিকে সে ছুটিয়ে নিয়ে চলছিল তার বাহন।
দৈত্যদল যখন বাদশার এই কীর্তিব কথা শুনতে পেলো,
তখন তারা তাদের গ্রীবা সরিয়ে নিলো তাঁর আনুগত্যের থেকে।

সকল দৈত্য একত্রিত হয়ে বললো,
খসিয়ে আনতে হবে বাদশার স্বুবর্ণ মুকুট তাঁর শির থেকে।
তহ্মুরস দৈত্যদের এই কথা শুনতে পেয়ে
অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলেন ও তাদের পরাভূত করতে তৎপর হলেন।
দৈত্যদের সঙ্গে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হলেন তিনি
শাহী জাঁকজমকের সঙ্গে;
এবং কাঁধে তুলে নিলেন ভারী গদা।

৮. জরোয়েস্ত্রীয় ধর্মমতে ভালো-মন্দ আলো-অন্ধকারের দুই দেবতা কল্পনা করা হয়েছে। আহুরমজদা সৎ ও আলোব দেবতা এবং আহ্‌রিমন অসৎ ও অন্ধকারের দেবতা। সেইমতে সৎ-অসৎ ও আলো-অন্ধকাবের দ্বন্দ্ব চিরন্তন।

বর্ষীয়ান দৈত্য ও যাদুকররা মিলে
যাদুর বলে গড়ে তুললো এক বিরাট দানব-বাহিনী।
কৃষ্ণকায় দৈত্য হোল তাদের সেনাপতি,—
এই দৃশ্য হতাশ দৈত্যদের মনে সাহস এনে দিলো।
তাদের পদধূলিতে বাতাসের রঙ্ হোল কৃষ্ণবর্ণ, ধরণী হোল অন্ধকার,
চক্ষু ও বাতায়ন সকল অন্ধ হোল।
বাদশা তহ্মূরস সৈন্যদল সহ
রোষ-কশায়িত দৃষ্টিতে রণভূমিতে অবতীর্ণ হলেন।
একদিকে গর্জনরত দানবদল,
অন্যদিকে পৃথিবী-পতির সাহসী সেনাদল।
অনতিবিলম্বে যুদ্ধ শুরু হোল,
কিন্তু শীঘ্রই হোল জয়-পরাজয়েব দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবসান।
দৈত্যদলের একাংশ মন্ত্র দ্বারা বন্দী হয়ে পড়লো,
অন্য অংশ গুরুভার মুষলের আঘাতে ধ্বংস হতে লাগলো।
আহত, বন্দী ও অপমানিত দৈত্যদল তখন
প্রাণভিক্ষা চেয়ে সন্ধির প্রস্তাব পেশ করলো।
বললো, হে রাজন, আমাদের প্রাণ-সংহার করো না,
আমরা তোমার অনুগত শিক্ষার্থীরূপে তোমার সমীপে
নতশির হচ্ছি।
সুযশ বাদশা দৈত্যদের প্রার্থনা মঞ্জুর করে তাদের দান করলেন
স্বীয় শরণ,
ফলে তাদের ভাবের গভীরতায় সাড়া জাগলো।
বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়ে দৈত্যগণ
বাদশার সমীপে মিত্রতার প্রার্থনা জানালো
বাদশার বরাবরে তারা এক প্রার্থনাপত্র লিখলো,
তাদের হৃদয় বাদশার জ্ঞান থেকে আলো লাভ করার জন্য
ব্যাকুল হয়ে উঠলো।

বাদশার আদেশে এক হুকুমনামা লিখিত হোল,—
রোমক, আরবীয় ও ইরানের সকল দৈত্যের উপর
তা সমানভাবে প্রাযোজ্য।
সমরকন্দী, চীনদেশীয় কিংবা পহলবী ভাষী,
যে এই হুকুমনামা শুনলো সে-ই বিনা বাক্যব্যয়ে আনত করলো
তাব মস্তক।
এইভাবে দুনিয়াপতি হোশঙ্গ ত্রিশটি বছরকে
শিল্প ও জ্ঞান-গরিমার সামগ্রীতে ভবে তুললেন।
তাবপব তিনি পবলোকগত হলে
তাঁর স্মৃতির বেদনায় ভরপুর হোল সকলেব অন্তব।
যদি লোকের আশীর্বাদ তোমাব কাম্য হয়,
তবে, মনে রেখো, দুনিয়া অবশ্য পূর্ণ করবে তোমার কামনা।
কর্ম কাউকে নিয়ে যায় আকাশের উত্তুঙ্গতায়,
আব কাউকে অপমানিত অবস্থায় নিক্ষেপ কবে ধূলিতলে।

জমশেদ

[বাদশা জমশেদ সাতশো বছর রাজত্ব করেছিলেন]

সুযশ বাদশা হোশঙ্গের পর
পিতার স্থানে এলেন কীর্তিমান পুত্র।
তাঁর সুভগ নাম জমশেদ,
তিনি বীর্যবান ও বুদ্ধিমান।
কেয়ানী বংশের রীতি অনুযায়ী তাঁকে পরানো হোল
সুবর্ণ মুকুট,
যশস্বী পিতার সিংহাসন হোল তাঁর উপবেশন।
রাজকীয় আড়ম্বরের সঙ্গে তাঁর বাদশাহী শুরু হোল,
সারা দুনিয়া তাঁর জন্য খুলে দিলো তার শরণি।
কাল উৎফুল্ল হোল তাঁর সামনে,
তাঁর আদেশের অনুগামী হোল দৈত্য, বিহঙ্গম ও পরীদল।
দুনিয়া তাঁর থেকে লাভ করলো বৃদ্ধি,
রাজসিংহাসন তাঁর ব্যক্তিত্বের স্পর্শে উজ্জ্বল হোল।
তিনি বললেন, আমি বিশ্ব-প্রভুর ঔজ্জ্বল্যের প্রতিবিম্ব,
বাদশাহী আমারই জন্য,—জ্ঞান আমাতেই হয়েছে শোভন সুন্দর।
অমঙ্গল আমার বাহুবলে নির্জীব হয়েছে,
কল্যাণ আমার ইঙ্গিতে হয়েছে সম্মুখবর্তী।
প্রথমে যুদ্ধাস্ত্রসকল উদ্ভাবনের মানসে
রাজকীয় প্রচেষ্টা করলো বহু বহু দিগ্দেশ যাত্রা।
তারপর বাদশার তেজঃদীপ্তিতে লৌহ কোমল হোল,
তদ্দ্বারা নির্মিত হোল লৌহ-শিরস্ত্রাণ বর্ম ও সাঁজোয়া।

আরো তৈরী হলো তনুত্রাণ, কবচ ও প্রতিরোধ ফলক,—
উদ্ভাসিত-হৃদয় বাদশার নির্দেশে তৈরী হোল এইসব সমরোপকরণ।
পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এইভাবে বহু ক্লেশে
তিনি রাজকীয় কোঁষাগারের ভিত্তি পত্তন করলেন।
পরবর্তী পঞ্চাশ বছর তিনি মগ্ন রইলেন পোশাকেব আবিষ্কারে,—
মানুষ যা পববে উৎসবের দিনে ও বিজয়েব শুভলগ্নে।
তুঁতপোকার লালাজাত তন্তু থেকে তৈবী হোল বেশম,
যা দিয়ে প্রস্তুত হতে পারে মূল্যবান কৌশিক পরিধেয়।
শিক্ষা দিলেন তিনি প্রজাগণকে সুতাকাটা ও কাপড় বোনার
কৌশল,—
কি করে তাঁতেব উপব পরিয়ে দিতে হয় তানা পড়েন।
যখন লোকে এইসব কৌশল শিখে নিলো,
তখন বেশমী পরিধেয় তৈরী ও সীবন বিদ্যাও তিনি তাদের আয়ত্ত
করালেন।
এই কাজ সমাপ্ত করে তিনি অন্যান্য উপকরণ
আবিষ্কারেব দিকে মন দিলেন,
কাল তাঁকে নিয়ে ও তিনি কালকে নিয়ে সুখী ও আনন্দিত হলেন।
প্রতিটি শিল্প গড়ে তুললো এক-একটি সম্প্রদায়,
এবং এই পর্যায় সৃষ্টিতে চলে গেল আরো পঞ্চাশটি বছর।
তারপর পূজারীদের এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করা হোল,
প্রচলিত হোল তাদের দ্বারা ভগবৎ-পূজার রীতি।
অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে আলাদা করে·
পূজকদের উপাসনার জন্য নির্দিষ্ট করা হোল পর্বতের নির্জন স্থান
সেই থেকে পূজা-উপাসনা হোল তাদের কর্ম,
বাদশার আদেশে এই জীবন-বিধানই তাদের জন্য নির্দিষ্ট হোল।
গোড়াপত্তন হোল আরো এক সম্প্রদায়ের,
তার নাম হোল শূর সম্প্রদায় বা ক্ষত্রিয়।

এই সম্প্রদায় থেকেই এলো রণভূমির সাহসী বীরবৃন্দ,
জন্ম নিল সৈন্য ও সেনাবাহিনী।
এদেরই শৌর্যবীর্যে নির্বিঘ্ন হোল বাদশার সিংহাসন,
এদেরই মধ্যে চিরজীবী হয়ে রইলো বীর্যবত্তা ও পৌরুষের সুনাম।
সমাজের তৃতীয় অংশ,
যার উপস্থিতি ব্যতিরেকে মানুষের সুখ নেই—
সে হোল কারিগর, কৃষিজীবী ও পণ্য নিয়ে ভ্রমণকারীদল,
এদের প্রচেষ্টায় জীবিকা হোল নিশ্চিত[৯]
বাদশার নির্দেশের ফলে নগ্ন ও ছিন্নকন্থাধারী মানুষ
দেখলো সুখের মুখ ;
তাঁর কণ্ঠস্বর ঘুচিয়ে দিল অপমানিতের মর্মপীড়া।
বাদশার এইসব বিধানের ফলে মানুষ অভাব থেকে মুক্ত হোল,
তাঁর শাসনে ও বাণীতে দুনিয়া পেলো নিরাপত্তার সাক্ষাৎ।
মুক্ত মানুষের কবি কি সুন্দর বলেছেন,—
নিষ্ক্রিয়তাই স্বাধীন মানুষকে করে রাখে বন্দী।
সমাজের চতুর্থ অংশ—যারা মানুষকে দান করে আনন্দ ও সেবা,
তাদের দ্বারা কৃষককুল লাভ করলো নিরাপত্তা।
এইভাবে সর্বত্র মানুষ গ্রহণ করলো কোন না কোন বৃত্তি,
সর্বত্র প্রবাহিত হোল জীবনের ধারা জ্ঞান ও কৌশলকে
আয়ত্ত করে।
এইভাবে আরো পঞ্চাশ বছর কেটে গেলো,
এলো বহু সামগ্রী ও অনেক রকম খাদ্যবস্তু।
এক থেকে দুই—এইভাবে এগিয়ে গেলো সভ্যতা,
গৃহীত হোল যেখানে যা সাজে, এবং দেখা দিলো এগিয়ে চলার পথ।
মানুষ দেখতে পেলো স্বীয় প্রয়োজনের সামগ্রী,
এবং জানতে পেলো অল্প ও বেশীর পার্থক্য।

৯. এই শ্রেণীবিভাগ প্রাচীন ভারতীয় শ্রেণীবিভাগের অনুরূপ।

অপবিত্র দৈত্যদের উপর আদেশ হোল
পানির সঙ্গে মাটি একত্রিত করে কাদা তৈরী কর।
কাদার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর
তাকে কাঠামোতে রেখে তৈরী করা হোল পাতলা ইট।
পাথর ও গাড়ার সাহায্যে তখন দৈত্যদের দ্বারা তৈরী করান হোল
প্রাচীর,

এবং তারই সঙ্গে গোড়াপত্তন হোল স্থাপত্যের।
এলো স্নানাগার এলো উঁচু অট্টালিকা,
তৈরী হোল প্রাসাদ ও দুর্গ যাতে আশ্রয় নেওয়া যায়
বিপদের দিনে।

একদিন আবিষ্কৃত হোল কঠিন মাটির বুক থেকে মূল্যবান মণি,
যার ফলে উজ্জ্বলিত হোল বাসনার মঞ্জুষা।
হাতে এলো কত না রত্ন,—
নীলা, সূর্যকান্ত মণি, রজত ও কাঞ্চন।
একবার যখন মানুষের মন্ত্রশক্তিতে কঠিন মাটির বক্ষ
উন্মুক্ত হোল,

তখন একেবারেই খুলে গেলো রত্নগৃহের বন্ধ দুয়ার।
কত না সুগন্ধ হিল্লোল তুললো বাতাসের বুকে,
মানুষের আনন্দ হোল তাতে শতগুণ বর্ধিত।
লোবান, কর্পূর ও অপ্রাপ্য মৃগনাভি,
ধূপ-ধুনা ও সুদর্শন গোলাপ ছড়ালো তাদের সুরভি নির্যাস।
চিকিৎসা ও আরোগ্য-বিধি
খুলে দিল স্বাস্থ্য ও বেদনা-নিরসনের বাতায়ন।
সকল গোপন তথ্য প্রকাশিত হলে
দুনিয়া তার আকাঙ্খিত বস্তুরাশির সাক্ষাৎ পেলো।
জলে ভাসলো নৌকা—পথ হোল বারিরাশির উপর,

সুগম হোল এক দেশ থেকে অন্য দেশের সফর।
সফলতায় ভরে উঠল আরো পঞ্চাশটি বছর
শিল্প-কলা ও জ্ঞানের ভাণ্ডারে সে আর কোন বস্তুকেই

লুক্কায়িত দেখল না।

এইভাবে যখন সব-কিছুর আবিষ্কার সম্ভব হোল,
তখন বাদশার চোখ পড়লো নিজের উপর—তিনি দেখলেন নিজেকে

অদ্বিতীয়।

স্বীয় মাহাত্ম্যের ঊর্ধ্বে উঠার আকাঙ্ক্ষা তাঁতে প্রবল হোল।
তখন শাহী আড়ম্বরের উপযুক্ত করে রচিত হোল এক রত্নসিংহাসন,
বহু মূল্যবান মণিমাণিক্য তাতে খচিত হোল।
বাদশার হুকুমে দৈত্যগণ বহন করতো এই সিংহাসন,
বনভূমি ছেড়ে গতি হোত তার আকাশ-পথে।
উজ্জ্বল সূর্যের মতো বায়ুমণ্ডলে
সেই রাজাসনে উপবিষ্ট থাকতেন দণ্ডধারী বাদশা।
জগৎ তাঁর সভামণ্ডপ আর তিনি সেই সিংহাসনে সমাসীন,—
ফলে তাঁর ভাগ্যের দীপ্তি আরো বর্ধিত হোত।
মুক্তা বর্ষিত হোত জম্‌শেদের সামনে
প্রতিটি দিন নূতন দিনকে ডাক দিয়ে যেতো।
বছরের শুরুতে পয়লা মাসের প্রথম দিন আসতো,—
শুচি-দেহ সুস্থ-মন ও সর্বদুঃখহর।
সেই নওরোজের দিনে বাদশা আবির্ভূত হতেন —
তখ্‌তে সমাসীন—বিজয়ী সফলকাম ও আনন্দ-চিত্ত।
দলপতিগণ আনন্দিত চিত্তে এসে সমবেত হোত,
গায়কদল বিস্তার করতো সুরের উন্মাদনা।
এই শুভ উৎসব তখন থেকেই
বাদশাদের জন্য তাঁর স্মারক হয়ে রইলো।

এইভাবে অতিবাহিত হয়ে গেল তিন শো বছর,
এই সময়ের মধ্যে কেউ দেখলো না কোন মৃত্যু।
রইলো না কেউ অকর্মণ্য বেকার,
রইলো না কারো দুঃখ কিংবা রোগ-শোক।
দুষ্টলোকের আঘাত কিংবা কোনরূপ বেদনা থেকে
মানুষ আজাদ হোল,
দৈত্য দানব রাজভয়ে দাসদের মতো অনুগত হয়ে রইলো।
সর্বত্র বিস্তৃত হোল মহান সিংহাসনের প্রভাব,
পৃথিবীর বন-প্রান্তর সম্রাটকে বরণ করে নিলো শাসকরূপে।
আহা! তখত সমাসীন বাদশা জমশেদ,—
তাঁর পদতলে নন্দিত হোত বাদ্য, ছন্দিত হোত সুরাপাত্র।
দৈত্যরা বহন করে নিয়ে যেতো তাঁর তখ্‌ত,
উড্ডীন হোত তা মেঘমালার ঊর্ধ্বে।
লোকালয় ছেড়ে সে উত্থিত হোত—
ছাড়িয়ে যেতো সেই পরিধি যেখানে বিহঙ্গদল পাখা বিস্তার করে
উড়ে বেড়ায়।
তাঁর ফরমানে তৃপ্ত হোত মানুষের শ্রবণ
তাঁর মধুর গুঞ্জনে ধরিত্রী পান করতো সঞ্জীবনী সুধা।
যুগ যুগ ও বর্ষ বর্ষ ধরে
ধরণী এইভাবে আলোকিত হয়ে রইলো তাঁর বাদশাহীর উজ্জ্বল
দীপ্তিতে।
সেই সফলকাম নরপতির বদৌলতে জগতে বিরাজিত রইতো শান্তি,
বিশ্ব-প্রভুর দিক থেকে আসতো তাঁর কাছে নব নব বাণী!
তাঁর শাসনকালের দিকে তাকালে
বাদশার সৌজন্য ও সফলতা ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ত না।
ইরান তুরান ও চীনের নরপতিগণ

সবাই তাদের মোহরে অঙ্কিত করতেন তাঁর নাম।[১]
পৃথিবীর সবাই আনত করতো মস্তক তাঁর আনুগত্যে,
তাঁর সমারোহ সকলকে রাখতো বিস্মিত করে।

একদিন বাদশা তার দৃষ্টি প্রসারিত করলো দিকে দিকে,
কিন্তু কোথাও সে নিজেকে ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেলো না।
ভগবৎ-ভক্ত বাদশার হৃদয়ে তখন উদ্রিক্ত হোল অহঙ্কার,
বিমুখ হোল সে ঈশ্বরের প্রতি, হোল অকৃতজ্ঞ।
সৈন্যদল সহ ডাকলো সে দলপতিগণকে,
এবং তাদের সামনে দান করলো এক গুরুতর ভাষণ।
সেই অকৃতজ্ঞ বর্ষীয়ান নরপতি বললো,—
আমি ছাড়া এই দুনিয়ায় কেউ নেই;
শিল্প আমারই সৃষ্টি,
আমার মতো নরপতি জগতে আর কেউ কোন দিন দেখেনি।
আমিই সজ্জিত করেছি ধরিত্রীকে নব নব সজ্জায়,
আমারই আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ হয়ে আজ তার এই মনোরঞ্জিনী রূপ!
সুখাদ্য, সুনিদ্রা ও শান্তি আমারই দান,
আমিই তোমাদেরকে দিয়েছি বহুবিধ অঙ্গাবরণ।
মাহাত্ম্য রাজমুকুট ও রাজত্ব আমাতেই হয়েছে শোভন,
কে বলবে যে, আমি ছাড়া আর বাদশা কেউ আছে?
আমারই উদ্ভাবিত চিকিৎসা ও ঔষধাদির দ্বারা
দুনিয়া লাভ করেছে স্বাস্থ্য,
রোগ ও মৃত্যু হয়েছে অজ্ঞাত।
আমি ছাড়া কে আর মৃত্যুকে করেছে পরাজিত,
অথচ কতো বাদশাই দুনিয়ায় বাদশাহী করে গেছে।

১ এই দুটো পংক্তি পাক-ভাবতীয় কিংবা ইরানীয় কোন সংস্করণেই নেই। শাহ্‌নামার এক প্রাচীন পাণ্ডুলিপিব প্রতিলিপি থেকে তা নেওয়া হোল।

তাই, স্বাস্থ্য ও সুবুদ্ধিকে গণ্য কর আমারই দান বলে,
যে আমার থেকে মুখ ফিরায় সে আহ্‌রিমন্ বা শয়তানের চেলা।
সুতরাং, যদি বুঝে থাক যে, আমি সব করি,
তবে আমাকেই সম্বোধন কর বিশ্ব-প্রভু বলে।
এই ভাষণ শুনে সমস্ত জ্ঞানীজন আনত করলো তাদের দৃষ্টি,
টুঁ শব্দটি করতেও সাহস পেলে না কেউ।
কিন্তু বাদশার মুখ থেকে বিশ্ব-প্রভুর উপযোগী
অহঙ্কার-বাণী শুনে
ব্যথায় ভেঙে পড়লো মানুষের মন ও দুনিয়া পূর্ণ হোল
সমালোচনায়।
সবাই মুখ ফিরালো বাদশার দরবার থেকে,
মানুষের মতো মানুষ একজনও রইল না তাঁর সামনে!
এইভাবে মাত্র তেইশটি বছরের মধ্যে শূন্য হয়ে গেলো রাজসভা,
ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লো বেশুমার সৈন্যদল।
অহঙ্কার একমাত্র বিশ্ব-প্রভুর জন্যই শোভন,
বিদ্রোহীর জন্য সে নিয়ে আসে ধ্বংস ও বরবাদী।
কি সুন্দর বলেছেন, জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান কবি—
বাদশার জন্যও উচিত হবে অটল থাকা বিশ্ব-প্রভুর আনুগত্যে।
ভগবানের অনুবর্ত্তন থেকে যে মুখ ফিরায়
তার হৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট হয় ভীতি।
তাই, একদিন যে ছিল পৃথিবীর জন্য আলো
সেই জমশেদের চারদিকে আজ ঘূর্ণিত হচ্ছে অন্ধকার।
পরম পবিত্র বিশ্ব-প্রভুর ক্রোধ
তার হৃদয়কে করে তুলেছে ভয়ে কম্পিত।
সে অনুধাবন করতে পারছে তাঁর রোষ,

বুঝতে পারছে কিজন্যে এই দুঃখের সকল প্রতিকার ও
অনুপস্থিত।
তাই চোখ থেকে তার ঝরে পড়ছে রক্তাশ্রু,
অনুতাপ আচ্ছন্ন করেছে তার সকল মন।
প্রভুর গৌরব-দীপ্তির যে-প্রতিফলন তার উপর ছিল
তার অস্ত হয়েছে,
অমঙ্গলের অন্ধকার এসে গ্রাস করেছে তাকে।

জোহাক ও তার পিতার কাহিনী

সেই কালে অশ্বারোহী ও বর্শাধারী মরুচারীদের মধ্যে
বাস করতেন এক পুরুষ পুঙ্গব।
সৌভাগ্যে তিনি ছিলেন নরপতি ও চরিত্রে সাধু,
বিশ্ব-প্রভুর ভীতি তার অহংকে রেখেছিল অবনমিত করে।
তাঁর নাম ছিল মরদাস,
দান ও বদান্যতায় তিনি ছিলেন বিখ্যাত।
তাঁর দুগ্ধবতী চতুষ্পদ ছিল
এক হাজারের চারগুণ।
ছাগী উষ্ট্রী ও ভেড়ী ইত্যাদি সমুদয় পয়স্বিনী
ধর্মপথে তাঁর সহায় হয়েছিল।
দুগ্ধবতী গাভীদল তাঁর অনুগত ছিল,
দ্রুত ধাবমান আরবী ঘোড়া উদ্যত হোত
তাঁর ইঙ্গিতে।
তাদের দুধে দরিদ্রের অভাব দূর হোত,
এই সম্পদ তাঁকে দান করেছিল উন্নত মর্যাদা ও করেছিল
তাঁকে বিজয়ী।
এই মহাপুরুষের এক পুত্র ছিল,
বিশ্ব-প্রভুর দয়ার অংশ সে-ও কম পায়নি।
সেই যশঃকামীর নাম ছিল জোহাক—
সে ছিল তীক্ষ্ণধী বীর ও চটুল।
তার আদেশের অনুগত ছিল দশ হাজার ঘোড়া,
এবং তার থেকেই পাহ্লবী ভাষায় তার নাম হয়েছিল,
দশহাজারী।

সর্বত্র সে গণ্য ছিল বীর বলে,
দরী[১] ভাষায় বীরত্ব দাঁড়িয়েছিল দশহাজারের সমার্থক
শব্দ বলে।
এই সব সুসজ্জিত আরবী ঘোড়ার প্রতাপে
তার নাম দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল।
তার জিনের (অশ্বারোহীর আসন) দুই পাশে সংলগ্ন ছিল
দিন ও রাত্রি,
মাহাত্ম্যের পথেই ছিল তার বিচরণ।
একদিন এক প্রভাত বেলায়
দুষ্ট শয়তান তার কাছে এক সুহৃদের বেশে এসে উপস্থিত হোল।
সুপথ থেকে দুষ্কৃতির পথে চলিত হওয়ার জন্যই যেন
যুবরাজ তার শ্রবণ উন্মুক্ত করলো সুহৃদরূপী সেই
শয়তানের বাণীর দিকে।
তার কথা যুবরাজের মনোরঞ্জন করলো,
কারণ সে শয়তানের এমন ছলনা সম্পর্কে অবহিত ছিল না।
যুবরাজ ধীরে ধীরে তার হৃদয়, চেতনা ও পবিত্র প্রাণ সব সমর্পণ
করলো তার হাতে—
সে যেন স্বীয় মস্তিষ্কে ভরে নিলো নিক্ষিপ্ত ধূলিরাশি।
শয়তান যখন বুঝতে পারলো, যুবরাজ তার কুক্ষিগত,
তখন সে অবতারণা করলো বহু সুন্দর আজগুবি কাহিনীর।
সেই সব মনোমুগ্ধকর অদ্ভুত কাহিনী দ্বারা
সে যুবরাজের মস্তিষ্ককে তার ছলনার সম্পূর্ণ অধীনে নিয়ে এলো।
এইবার সে বললো, এমন অনেক কথা আমার জানা আছে
যা আমি ছাড়া আর কেউ জানে না।
যুবরাজ তখন অধীর হয়ে বললো, আরো বল—এতো শিগগির
চলে যেয়ো না,

১ ফারসী ভাষার এক বিশিষ্ট রূপ যাকে অত্যন্ত বিশুদ্ধ বলে গণ্য করা হোত।

ওগো সুপরামর্শদাতা, তুমি আমাদের নতুন নতুন কথা শিখাও।
জবাবে শয়তান বললো, তার আগে তুমি আমার সঙ্গে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও,
পরে আমি তোমার কাছে খুলবো আমার রসনার
যত ঐশ্বর্য।

যুবরাজ সরল চিত্তে গ্রহণ করলো সেই প্রস্তাব,
এবং প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হোল।
বললো, তোমার কথার গোপনীয়তা আমি রক্ষা করবো
সারাজীবন,

যা শুনবো কাউকে তা কোনদিন বলব না।
শয়তান তখন বললো, এই রাজপ্রাসাদে তুমি ছাড়া
আর কাউকেই মানায় না,

তুমিই সত্যিকার ভাবে প্রভুত্বের অধিকারী,—তুমিই যশস্বী।
তোমার মত পুত্রই বাস্তবিক পক্ষে পিতৃস্থানীয়,
তাই, আমার একটি উপদেশ তোমার শ্রবণ করা উচিত।
এই বৃদ্ধ নরপতির জন্য কাল অতি দীর্ঘ হয়েছে,
এবং সেই দীর্ঘ কালই হয়েছে তোমার দুশমন।
ছিনিয়ে নাও তুমি এই সম্পদ তার থেকে,
তার মর্যাদা দুনিয়ায় একমাত্র তোমাকেই সাজে।
আমার এই উপদেশের সম্মান যদি তুমি রক্ষা কর,
তবে তুমি অবশ্যই অলঙ্কৃত করবে
বাদশাহীর আসন।

শয়তানের এই কথায় জোহাক গভীরভাবে চিন্তান্বিত হোল,
পিতার রক্তপাত সম্ভাবনায় তার হৃদয় হয়ে উঠলো বেদনাপ্লুত।
শয়তানকে সে বললো, এই কাজ করা অন্যায়,
অন্য কোন কথা বল, এমন নৃশংসতার প্রয়োজন নেই।
শয়তান বললো, এই কাজ থেকে যদি তুমি মুখ ফিরাও

তবে যেনো, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের অপরাধে তুমি কেবল দুঃখকেই
ডেকে আনবে।
আমার সঙ্গে প্রতিজ্ঞায় তুমি আবদ্ধ,
যদি তা ভঙ্গ কর তবে অপমানিত হবে তুমি, এবং
তোমার পিতার ভাগ্যও হবে অন্ধকারাচ্ছন্ন।
এইভাবে সেই আরবী যুবকের গ্রীবা শয়তানের
ফাঁসির জালে আবদ্ধ হোল
সে মেনে নিলো শয়তানের আদেশ ;
এবং বললো, আমাকে তবে বল
কি উপায়ে সেই কাজ সমাধা করি,
তোমার উপদেশ ছাড়া আমার গত্যন্তর নেই।
শয়তান তখন বললো, তোমার জন্য অবশ্যই আমি
উপায় বের করবো,
তোমার মস্তক আমি উত্তোলন করবো সূর্যেরও উপরে।
তুমি শুধু নীরবে আমাকে অনুসরণ করবে,
আমার সখ্যই হবে তোমার জন্য সর্বোত্তম বস্তু।
যা কিছু প্রয়োজন সব আমিই তোমার জন্য করবো,
তুমি শুধু তোমার বাক্যরূপ তলোয়ার কোষবদ্ধ রাখবে।

নরপতির প্রাসাদাভ্যন্তরে এক উপবন ছিল—
সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর।
মহান নরপতি রাত্রির শেষ যামে গৃহ থেকে বহির্গত হতেন,
এবং উপাসনার জন্য আসতেন এই উপবনে।
সেখানে সবার চোখের আড়ালে তিনি স্নান করে শুচি হতেন,
এবং একটি প্রদীপের সামনে এসে নিমগ্ন হতেন বিশ্ব-প্রভুর উপাসনায়।
দুষ্ট দৈত্যদল সেই মহাপুরুষের গমন-পথের একপাশে

এক কূপ খনন করে রেখেছিল।
শয়তান সেই কূপের উপরে ঘাসের আস্তরণ বিছিয়ে দিয়ে
তার উপরে টেনে দিলো পথের রেখা।
অন্যান্য দিনের মতো সেদিনও নিশুতি রাত এলো,
আরবদের দলপতি অভ্যাস মতো নীরব উপবনের পথ ধরলেন ;—
সেই গভীর কূপের নিকট আসতেই
সহসা তাঁর সৌভাগ্যের শির অবনমিত হোল।
তিনি পতিত হলেন গভীর কূপের তলদেশে—
হায়! সহৃদয় খোদাভক্ত মহাপুরুষের হোল জীবনাবসান!
সদসৎ সকল মানুষই নরপতির মৃত্যুতে শোকে
আত্মহারা হোল,
কিন্তু স্নেহপুত্তলী পুত্রের অন্তর থেকে শুধু বিনির্গত হোল
এক শীতল নিঃশ্বাস।
আহা, পরম আদরে ও যত্নে প্রতিপালিত সন্তান,—
যে ছিল দলপতির আনন্দ ও যার মঙ্গলের জন্য তিনি দান করেছেন
অজস্র সম্পদ ;
সে-ই দুশমনের মতো ঔদ্ধত্যের সঙ্গে
ভালবাসার বাহুপাশ ছিন্ন করে নিলো অবলীলায়!
প্রবাদ আছে,—
পিতার রক্তে হস্ত প্রক্ষালন করার মতো জঘন্য পাপ থেকে
রক্তপিপাসু দৈত্যও বিরত থাকে,
তেমন বীবত্ব প্রকাশে তারাও বোধ করে
নিজেদের অপমানিত।
কিন্তু এই প্রবাদ বহন করে আরো এক তাৎপর্য,—
যার সূত্র মাতৃত্বের সঙ্গে যুক্ত।
পুত্র তখনই পিতার স্নেহবন্ধন অবলীলায় ছিন্ন করে
যখন সে অস্বীকার করতে পারে স্বয়ং পিতৃত্বকেই।

নীচ ও অত্যাচারী জোহাক সেই প্রবাদকেই সত্যে পরিণত করে
পিতার আসন এসে বসলো।
আরব দলপতিগণ তার মস্তকে রাখলো রাজমুকুট,
এবং তাকে সমর্পণ করলো তাদের সকল লাভ ও ক্ষতি।
এদিকে শয়তান যখন তাকে স্বপ্রতিজ্ঞায় অটল দেখলো
তখন সে অন্য এক বন্ধন-রজ্জু তুলে ধরলো তার গ্রীবার উপর।
সে বললো, তুমি যখন আমারই দিকে মুখ করেছ
তখন এই দুনিয়া থেকে সব কিছুই তোমার লভ্য হবে।
আবার যদি কোন নতুন আদেশ তোমার উপর আপতিত হয়—
তবে তাও পালন করবে নীরবে, আর প্রতিজ্ঞা থেকে মুখ ফেরাবে না।
তাহলেই পৃথিবীর সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হবে তোমার বাদশাহী,
হরিণাদি চতুষ্পদ, বিহঙ্গ ও মৎস্যাদি হবে তোমার অনুগত।
এই কথা বলে শয়তান অন্য কৌশল আবিষ্কারে মনোনিবেশ করলো,—
বিচিত্র পথে ধাবিত হলো তার উদ্ভাবনী চিন্তা।

শয়তানের পাচক বৃত্তি গ্রহণ

একদিন শয়তান এক বাকপটু সুবেশ ও বুদ্ধিমান
যুবকের সাজে সজ্জিত হয়ে
জোহাক রাজার দরবারে এসে উপস্থিত হোল;
রাজা তাকে হৃষ্টচিত্তে শুভ সম্ভাষণসহ গ্রহণ করলো।
শয়তান বললো, হুজুরেব কি পাচকেব প্রয়োজন আছে?
আমি একজন যশস্বী পাচক।
পাচকের কথা শুনে জোহাকের মন নেচে উঠলো,
সে তৎক্ষণাৎ তাকে রান্নার জন্য জায়গা করে দেওয়ার আদেশ দিলো।
যথাসময়ে বাজকীয় রন্ধনশালাব চাবি সোপর্দ করা হোল শয়তানের হাতে,
এবং প্রচলিত রীতি অনুযায়ী তাকে নিযুক্ত করা হোল রাজকর্মে।
সেই আদি যুগে কোন কিছুরই প্রাচুর্য ছিল না,
খাদ্যের জন্য বধযোগ্য প্রাণীর সংখ্যাও ছিল কম।
সুতরাং দুষ্ট শয়তান রাজাকে পরামর্শ দিয়ে বললো,
খাদ্যের জন্য অবাধে প্রাণী বধ করা হোক।
ফলে বিচিত্র বর্ণের পাখী ও নানা চতুষ্পদ,
প্রত্যহ রাজার খাদ্যের জন্য বধিত হতে লাগলো।
জীবের শোণিতে জীবনধারণ করে বনের ব্যাঘ্র যেমন প্রাণী হত্যায় তৎপর
রাজার আকাঙ্ক্ষাও তেমনি প্রাণের নিধনে মেতে উঠলো।
সেদিন থেকে পাচকের কথা রাজকীয় ফরমানের মর্যাদা পেলো,
তার কথার ঋণে আবদ্ধ হয়ে চললো রাজা স্বয়ং।
পাচক প্রথমে ডিমের কুসুম দিয়ে তৈরী করলো সুস্বাদু এক ভোজ্য

সেই ভোজ্য শক্তি ও স্বাস্থ্য দান করলো রাজার দেহে।
রাজা তৃপ্ত হয়ে পাচককে পারিতোষিক দান করলো,
খাদ্যের স্বাদ পেয়েছে ভাগ্যবান রাজা।
এই দেখে মায়াবী শয়তান চাটুবাক্য উচ্চারণ করে বললো,
উন্নতশির রাজার ভাগ্যে নির্দিষ্ট হোক চির যৌবনের জৌলুস।
আগামী কাল এর চেয়েও সুস্বাদু ভোজ্য আমি রাঁধবো,
তাতে আপনার রসনা পরিপূর্ণ তৃপ্তির সন্ধান পাবে।
সেদিন সারারাত জেগে শয়তান শুধু একটি কথাই চিন্তা করলো—
কাল কি ভোজ্য সে ধরবে রাজার সামনে ?
পরদিন নীল গগন-গম্বুজে
সূর্য-কান্ত মণি সদৃশ লাল তপন উদিত হলে
সে শুভ্র চকোর-চকোরীর মাংসে প্রস্তুত
এক রসনা-তৃপ্তকর ভোজ্য নিয়ে আশান্বিত অন্তরে
রাজার সামনে এসে উপস্থিত হোল।
আরবীয়দের রাজা সেই ভোজ্য গলাধঃকরণ করে
খুশি হয়ে পাচককে মোহারাদি অর্থ দান করলো।
তৃতীয় দিনে মোরগ ও হরিণ-শিশুর মাংস দ্বারা
দস্তরখানা সজ্জিত করা হোল।
চতুর্থ দিনে খাদ্য পরিবেশন করাব কালে
দেখা গেলো রাজার সামনে এসেছে পূর্ণবয়স্ক গাভীর সুস্বাদু মাংস,
তাতে দেওয়া হয়েছে জাফরান, গোলাপজল ও সুগন্ধী মৃগনাভি,
বহুদিনের পুরানো সুরাও তাতে সিঞ্চিত করা হয়েছে বহু যত্নে।
জোহাক যখন ভোজন শুরু করে ঠিক সেই মুহূর্তে—
চতুর পাচক সহাস্য বদনে রাজার সামনে এসে দাঁড়ালো।
রাজা তাকে দেখে বললো, বলো কি তোমার আকাঙ্ক্ষা,—
যা তোমার কাম্য তাই আমার কাছে অকপটে নিবেদন কর।

পাচক বললো, হে রাজাধিরাজ—
আপনি চিরসুখী হোন, আপনার রাজ্য হোক চিরপ্রতিষ্ঠিত।
আমার হৃদয় আপনার দয়ায় পরিপূর্ণ,
আমার প্রাণের সম্পদ আপনারই বদনমণ্ডলের অনুগ্রহ।
রাজার সমীপে আমার একটি মাত্র আকাঙ্ক্ষা,
যদিও আমি সেই সৌভাগ্যের উপযুক্ত নই।
আমার বাসনা রাজার স্কন্ধদ্বয় চুম্বন করি,
আমার নয়নদ্বয় ও মুখ সেই স্পর্শ লাভে ধন্য হোক।
জোহাক পাচকের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলো,
কিন্তু সে কথার তাৎপর্য সে কিছুই বুঝতে পারলো না।
মন্ত্রচালিতের মতো রাজা বললো, তোমার আবেদন
গৃহীত হোল পাচক,
উন্নত মর্য্যাদা লাভ করুক তোমার নাম।
এই সময় পাচকের সঙ্গী মানুষবেশী দৈত্য তাকে ইঙ্গিতে বললো,
আর বিলম্ব না করে সত্বর চুম্বন করো রাজার স্কন্ধদ্বয়।
চুম্বনের সঙ্গে সঙ্গে এমনি এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার সংঘটিত হলো
দুনিয়ায় কেউ যা কোনদিন দেখেনি।
রাজার কাঁধে ফণা তুলে দাঁড়ালো দু'টি কালো সাপ,
আর চক্ষের নিমেষে পাচক ও তার সঙ্গী অন্তর্ধান করলো।
অবিলম্বে উদ্যত সর্পদ্বয়কে অস্ত্রাঘাতে নির্মূল করা হলো,
উদ্ভট প্রাণের এই পরিণতিই শোভন।
কিন্তু সর্পদ্বয় যেন গাছের কর্তিত শাখা,
আবার দুই কাঁধে তা তেমনিভাবে বেরিয়ে এলো।
চারদিক থেকে জ্ঞানী চিকিৎসকদলকে এনে জমায়েত করা হোল,
তারা নিজ নিজ জ্ঞান-বুদ্ধি অনুসারে অবতারণা
করলো নানা কাহিনীর।
তারা উচ্চারণ করলো নানা মন্ত্র ও প্রয়োগ করলো বিচিত্র ইন্দ্রজাল;

কিন্তু এই ব্যাধির কোন প্রতিকারই সম্ভব হলো না

তাদের দ্বারা।

শয়তান তখন এক চিকিৎসকের বেশে

জ্ঞানি-সদৃশ গুরুগম্ভীর চালে জোহাকের সমীপে এসে

উপস্থিত হলো।

সে বললো, এটি এমন এক ব্যাপার

যার সাদৃশ্য কোথাও নেই, এবং সেই হেতু এর প্রতিকারও সাধারণের

নিকট অজ্ঞাত।

এদেরকে দিতে হবে এদের উপযোগী খাদ্য এবং এইভাবে তাদেরকে

শান্ত করতে হবে।

এ ছাড়া আর অন্য উপায় নেই।

মানুষের মগজ ছাড়া আর কিছুতেই এরা তুষ্ট হবে না।

এই খাদ্য পেলেই তারা শান্ত হয়ে থাকবে।

দেখ, শয়তানের এই প্রতিকাব চিন্তনে নিহিত রয়েছে

কি নিদারুণ কুৎসিত মতলব!

একটিমাত্র বিধানের মধ্যে কি করে সে গোপন করে রেখেছে

দুনিয়াকে মনুষ্য শূন্য করার হীন ষড়যন্ত্র!

জমশেদের যুগের অবসান

এই সময় ইরানের সর্বত্র দেখা দিল অসন্তোষ,
চারদিকে যুদ্ধ ও কলহ মাথা উঁচু করলো।
শুভ্র আলোকিত দিনগুলোকে এসে গ্রাস করলো অন্ধকার,
এবং জামশেদের ভাগ্য-সূত্র ছিন্ন হোল।
বিশ্বপ্রভুর দয়াব আলো তার উপর ক্রমে নিঃশেষ হয়ে এলো,
জটিলতা সরলতার ও অজ্ঞানতা অধিকার করলো জ্ঞানের স্থান।
বাদশার চতুর্দিকে ধ্বনিত হতে লাগলো একটি নাম—
পাহ্‌লভী ভাষায় মুখরিত হতে থাকলো সেই যশঃকামীর কথা।
বাদশা তখন সৈন্যদল নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করলো, —
কিন্তু হায়, জামশেদের ভাগ্য যে আজ কল্যাণহীন!
ইরানের সৈন্যদল যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়ে
আরবের পথ ধরলো;
কিন্তু যখন তারা শুনলো সে-দেশে এমন এক
নরপতির বাস, সে আজ্‌দাহার মতো বীর্যবান;
তখন ইরানের বীর অশ্বারোহী দল সেই নরপতির দিকেই মুখ ফিরালো,
জোহাককে তারা জানালো তাদের আনুগত্য।
তাকেই স্বাগত জানিয়ে আবাহন করলো নিজেদের দেশে,
এবং তাকেই বরণ করে নিলো ইরানের বাদশা বলে।
সেই অজগর-সদৃশ নরপতি সাড়ম্বরে এসে সমাগত হোলে
ইরান তার শিরেই রাখলো রাজমুকুট।
ইরান ও আরবের সৈন্যদল সমবেতভাবে তাকে নির্বাচিত করলো
তাদের প্রভু বলে,

এবং সমস্ত নগরী তার সামনে মস্তক অবনত করলো।
জামশেদের তখ্‌তের দিকে যখন সে পা বাড়ালো
তখন সমস্ত পৃথিবী যেন অঙ্গুলি নির্দেশ করলো তার দিকে।
দেখালো, নিয়তি জামশেদের জীবন শূন্য করে কি ভাবে
সাজঘরে নিয়ে এসেছে এক নূতন বাদশাকে;
তার শিরে রেখেছে রাজমুকুট, দিয়েছে তাকে রাজসিংহাসন,
দিয়েছে মাহাত্ম্য, রাজ্য, সম্পদ ও সৈন্যদল।
সেইদিন থেকে জামশেদের উপর পৃথিবীটা অন্ধকার হলো,
তখ্‌ত ও রাজমুকুট শোভন হলো জোহাকের জন্য।
একশো বছর ধরে কেউ জানতেই পেলো না
কোথায় রয়েছে বাদশা জামশেদ।
একশো বছর পরে সহসা চীনদেশেব এক নদী-তীরে
সেই নাস্তিক বাদশা জামশেদকে দেখা গেলো।
কিন্তু অচিরেই সে ধৃত হোল জোহাকের হাতে,
জোহাক তাকে আর মুহূর্তমাত্র জীবিত থাকতে দিল না।
ধারালো অস্ত্র দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করলো সে জামশেদের দেহ
এবং দুনিয়াকে তার নাস্তিক্য ও ভয় থেকে মুক্ত করলো।
তারপর কিছুদিন ধরে অজগর-তনু জোহাকের পরিণামও গোপনে
অপেক্ষা করে রইলো,

সে পরিণাম থেকে সে কিছুতেই রক্ষা পাবে না।
এই শাহী তখ্‌ত ও সুন্দর মস্‌নদ—
কাল একদিন তার হাত থেকেও শুকনো ঘাসের মতো
উড়িয়ে নিয়ে যাবে।
তার পূর্বেও বহু বাদশা অলঙ্কৃত করেছিল এই সিংহাসন—
রাজৈশ্বর্য দূর করেছিল তাদের দুঃখ সাময়িক ভাবে।

জামশেদের মৃত্যুতে তার সাত শো বছরের রাজত্বের অবসান হোল,—
এই দীর্ঘকালের মধ্যে কত ভালো ও কত মন্দই না হয়েছিল উদ্ভাসিত।
কিন্তু তার এই দীর্ঘ জীবনের কিইবা সফলতা,
যদি জগৎ উদ্‌ঘাটিত না করে থাকে তার চোখে জীবনের গূঢ় রহস্য।
কি হবে, যদি পৃথিবী তোমাকে প্রতিপালিত করে মধু ও পানীয় দ্বারা
আর তোমার কানে না শোনায় জ্ঞানের বাণী?
কিন্তু জেনে রাখ, একদিন যখন ছড়িয়ে পড়বে বাণীর সম্পদ—
তখন আমাদের উপর উদিত হবে সফলতার সূর্য।
তোমরা সবাই তখন সুখী হয়ো, ও আনন্দ লাভ করো এই বাণী থেকে,
উন্মুক্ত করো, তোমাদের হৃদয় জ্ঞানের দ্বারা।
অমূল্য এক অবদান বলে মনে করো সেই বস্তুকে—
যা তোমার হৃদয় থেকে ঝরায় রক্ত।
এই দুনিয়া বড় অস্থায়ী,
এখানে তুমি সৎকর্মের বীজ ছাড়া আর কিছুই বপন করো না।
আমার হৃদয় দু'দিনের এই সরাইখানায় খুব তৃপ্ত হয়েছে,
হে খোদা, শীঘ্র তুমি এই দুঃখ থেকে আমাকে মুক্তি দান কর।

জোহাক

এক হাজার বছর রাজত্ব করেছিল

জোহাক তখ্‌তে সমাসীন হয়ে সুখে রাজত্ব করতে লাগলো,
তার জন্যে বছরগুলো হাজারো আসরের রূপ নিলো।
কাল প্রশস্ত হোল তার ভাগ্যে,
দীর্ঘদিন ধরে চললো তার শাসন।
জ্ঞানীদের রীতিনীতি ও আইন বিদায় নিলো,
হৃদয়বানদের নাম পদদলিত হোল সর্বত্র।
শিল্প ও জ্ঞান উপেক্ষিত হোল, ইন্দ্রজাল পেলো
সম্মানের আসন,
স্বাস্থ্য মুখ লুকালো, সর্বত্র দেখা দিলো রোগ-শোক।
অন্যায় কাজে দৈত্যদের হাত জয়যুক্ত হোল,
ভেদবুদ্ধিময় কারুকার্য ছাড়া বাণী থেকে আর সব
সদুদ্দেশ্য বিদায় নিলো।
জামশেদের পরিবার থেকে দু'জন শুদ্ধা নারীকে
ধরে আনা হলো,
কম্পিত বেতসের মতো তারা ভয়ে মুহ্যমান হোল।
জামশেদের এই দুই বোন,—
একদিন সমস্ত মহিলা সমাজের মাননীয়া ছিল।
অসূর্যম্পশ্যা এই মহিলাদ্বয়ের একজনের নাম
শাহ্‌রনাজ,
দ্বিতীয় জনের নাম আর্‌নওয়াজ।
যথাসময়ে তাদেরকে জোহাকের প্রাসাদে আনা হোল,

এবং সেই অজগর-তনুর হাতেই তাদেরকে করা হোল সমর্পণ।
জোহাক সেই মহিলাদ্বয়কে গ্রহণ করলো তার বাঞ্ছিতা রূপে,
এবং তাদের উপর পাঠ করলো জাদুমন্ত্র।
অমঙ্গলের সূচনা এইভাবেই সে করলো,
পৃথিবী যেন তার হাতে হোল এক মোমের পুতুল।
অন্যায় ছাড়া আর কিছুই সে জানতো না,
হত্যা ধ্বংস ও সর্বনাশ ছাড়া আর কিছুই সে করতো না।
প্রত্যেক রাত্রিতে সে দু'জন যুবককে ধরে আনতো,—
কখনো সাধারণ জনতার মধ্যে থেকে, কখনো বীরবৃন্দের
সন্তানদের থেকে।
পাচক সেই যুবকদ্বয়কে বাদশার প্রাসাদে হত্যা করতো,
ও এইভাবে বাদশার চিকিৎসার ব্যবস্থা হোত।
তাদেরকে মেরে মগজ টেনে বের করে আনা হোত,
এবং তা দিয়ে সর্পদ্বয়ের রোজকার খাদ্যের সংস্থান হোত।
বাদশার স্বদেশের দুই গণ্যমান্য ব্যক্তি—
ধর্মপ্রাণ ও শুদ্ধচিত্ত,—
তাদের একজনের নাম ধার্মিক আরমায়েল,
অন্যজনের নাম দূরদর্শী কারমায়েল।
কথায় কথায় একদিন তারা
অত্যাচারী রাজা আর তার সৈন্যদল
এবং তাদের রীতি-নীতি ও অসন-বসনের উপর
আলোচনা তুললো।
একজন বললো, পাচকের বৃত্তি নিয়ে
রাজার সংস্পর্শে এলে মন্দ হয় না।
সেখানে যেতে পারলে তার এই অত্যাচারের প্রতিকারের
একটা উপায় বের করা সম্ভব হবে।
যে-দু'জন লোককে প্রত্যহ হত্যা করা হয়

তাঁদের মধ্যে অন্ততঃ একজনকে বাঁচানো সম্ভব হবে।
এইরূপ চিন্তা করে তারা একদিন রাজদরবারে গিয়ে
পাচকের বৃত্তি গ্রহণ করলো,
এবং সুন্দর পরিপাটি করে নানা ভোজ্য প্রস্তুত করে
রাজার মনোরঞ্জনে ব্যাপৃত হোল।
সেই থেকে রাজার রন্ধনশালায়
দুই জাগ্রত-চিত্ত ব্যক্তির স্থান নির্দিষ্ট হয়ে গেল।
যথাসময়ে শোণিতপাতের সেই ভয়ানক মুহূর্ত এলো,—
দেখা গেল, দু'জন মানুষকে বেঁধে নীচে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে।
এমনি করেই জল্লাদগণ দুই হতভাগ্যকে
প্রত্যহ টেনে নিয়ে আসতো;
তারা তাদেরকে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করে টেনে আনতো
পাচকদের সামনে,
এবং সেইভাবে ঠেলে দিতো উপর থেকে নীচের দিকে।
এই করুণ দৃশ্যে পাচকদ্বয়ের হৃদয় কান্নায় ভরে এলো,
তাদের চোখে বইলো উষ্ণ ধারা, ও অন্তর ঘৃণায় পূর্ণ হোল।
কিন্তু তাদেরকে প্রত্যক্ষ করে যেতে হোল
অত্যাচারী রাজার নিষ্ঠুর কার্যকলাপের এইসব জাগ্রত চিত্র।
একদিন মৃত্যুপথযাত্রী দুই হতভাগ্যের মধ্যে একজনকে
তারা লুকিয়ে মুক্ত করে নিলো,
অবশ্য এর চাইতে বেশী কিছু করার উপায় ছিল না।
তারপর মানুষের পরিবর্তে একটি গাধার মগজ টেনে বের করে
সেটিকে অপর হতভাগ্যের মগজের সঙ্গে মিশিয়ে
সাপের খাদ্য প্রস্তুত করা হোল।
মুক্ত লোকটিকে তারা চুপি চুপি বললো,
খুঁজে নাও এমন কোন জায়গা যেখানে নিজেকে
লুকিয়ে রাখতে পারবে।

পালিয়ে যাও নগর ও লোকালয় ছেড়ে দূরে,
এবং নিজের বসবাস খুঁজে নাও কোন পাহাড়ে কিংবা জঙ্গলে।
পরদিনও আবার তারা মানুষের মগজের বদলে
গাধার মগজ দিয়ে প্রস্তুত করলো সাপের খাদ্য।
এইভাবে প্রতি মাসে ত্রিশজন যুবক
মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি পেতে লাগলো।
পাচকদ্বয় তাদেরকে দেখিয়ে দিতে লাগলো
মরুভূমির পথ।
সেই থেকে মরু এলাকায় এক মরুচারী গোত্রের
পত্তন হোল,
তারাই ইতিহাসে কুর্দ জাতি নামে পরিচিত।
এরা মোটা কাপড়ের একপ্রকার তাঁবুতে
বাস করতো,
এবং ভয় বলে কোন জিনিস তারা জানতো না।
এইভাবে জোহাকের অন্যায় কার্যকলাপই
তার বিরুদ্ধে এক প্রবল শক্তির সমাবেশ করলো।
সেই পলায়িত মানুষগুলির মধ্যেই এক দুর্ধর্ষ
যুদ্ধপ্রিয় জাতির পত্তন হোল,
প্রত্যক্ষ সংগ্রামে তারা দৈত্যকেও পরাস্ত করতো।
কাল্পনিক এক নারীর পূজা তাদের মধ্যে প্রচলিত হয়েছিল,
তারা বিশ্বাস করতো, সেই নারী অন্তরাল থেকে তাদের
রক্ষা করছে।
তারা মানত না কোন নীতি ও নিয়ম,
জানতো না আর কোন ধর্মের কথা।

জোহাক ফারেদূনকে স্বপ্নে দেখলো

যখন জোহাকের রাজত্বের চল্লিশ বছর পূর্ণ হোল,
তখন ঘটলো এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা।
একদিন সে গভীর রাত্রে মহলের মধ্যে
শাহজাদী আরনেওয়াজের সঙ্গে নিদ্রিত ছিল।
স্বপ্নে দেখলো, বাদশাদের মহল থেকে
সহসা তিনজন সৈনিকের আবির্ভাব হয়েছে।
তাদের মধ্যে দু'জন বর্ষীয়ান ও একজন বালক,
সেই বালক ঋজু দেহ ও কেয়ানী বংশ-সুলভ গৌরবের অধিকারী।
যুদ্ধ-সাজে সজ্জিত হয়ে সে ঘোড়ার উপর সওয়ার রয়েছে;
হাতে তার ভীমতম এক প্রহরণ
ক্রোধে গর্জন করে সে জোহাককে যুদ্ধের জন্য আহ্বান জানালো,
ও তার মস্তকে হানলো সেই গদার আঘাত।
ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সেই বালক,
তার ঝুঁটি ধরে আকর্ষণ করলো;
তারপর পাথরের মত শক্ত হাত দুটি দিয়ে
তাকে সে ঘোড়ার সঙ্গে বেঁধে ফেললো।
জোহাকের শিরোভূষণ লুণ্ঠিত হোল ধূলায়;
এবং এই ভাবে অপমানিত ও অত্যন্ত বেদনাদায়ক অবস্থায়
সে তাকে দামাওন্দ[১] পাহাড়ের দিকে টেনে নিয়ে চললো,—
দৌড়িয়ে লোকলস্করের পেছনে।
এই স্বপ্ন দেখে জোহাক বড় ভয় পেলো,

১ প্যালেস্টাইনের সীমান্তবর্তী সেই পর্বতশ্রেণী যার মধ্যে সিনাই বা তুর পাহাড় অবস্থিত।

দুশ্চিন্তায় তার কলিজার রক্ত যেন পানি হয়ে যাচ্ছে।
স্বপ্নের মধ্যেই সে এমন এক চিৎকার দিয়ে উঠলো যে,
সেই শব্দে শত স্তম্ভের প্রাসাদ প্রকম্পিত হতে লাগলো।
সুন্দরিগণ জেগে উঠে
বিস্মিত হয়ে বাদশাকে জিজ্ঞাসা করলো, এই চিৎকারের কারণ কি?
তারা বললো, হে বাদশাহ আপনি আপনার প্রাসাদে আরামে নিদ্রিত ছিলেন,
নিজের ঘরে আপনার এই প্রাণ ভয় কেন?
সপ্তরাজ্য আপনার ফরমানের অধীন,
দৈত্য, পশু ও মানুষ আপনার প্রহরায় সদাজাগ্রত।
সমস্ত দুনিয়ায় বিস্তৃত রয়েছে আপনার বাদশাহী,
চন্দ্রলোক থেকে তা ছড়িয়ে আছে আকাশে সর্বত্র।
কি কারণে আপনি সুখ-শয্যা থেকে এমন ভাবে চমকে উঠলেন?
হে ভুবনেশ্বর, আমাদের তা খুলে বলুন।
পুর-সুন্দরীদের প্রশ্নের জবাবে বাদশা বললো,
আমি যে স্বপ্ন দেখেছি তা পরে তোমাদের কাছে বলবো।
কারণ তা যদি তোমরা এখন শোন,
তবে আমার জীবন সম্পর্কে তোমরা নিরাশ হয়ে পড়বে।
প্রবল-প্রতাপ বাদশার এই কথা শুনে আরনওয়াজ বললো,
আপনি বলুন, হয়তো স্বপ্নের অর্থ আমরা আপনাকে বলতে পারবো।
আমরা এর একটা প্রতিকারও বের করতো পারবো,
কারণ, কোন অমঙ্গলই প্রতিকারের বাইরে নয়।
বাদশা তখন স্বপ্নের সকল বৃত্তান্ত
একে একে তাদের কাছে খুলে বললো।
শুনে সুন্দরী শ্রেষ্ঠা আরনওয়াজ বললো,

শতপথে খুঁজতে হবে এর প্রতিকার।
কালের অঙ্গুরীয় আপনারই তখ্তের নীচে,
জগৎ আপনারই সৌভাগ্যের প্রভায় আলোকিত।
আপনার হুকুমের অধীন সমস্ত পৃথিবী,
মানুষ, চতুষ্পদ, বিহঙ্গ ও পরীদল আপনারই
আদেশের অপেক্ষা করে আছে।
প্রত্যেকটি দেশ থেকে জ্ঞানীদেরকে এনে জড়ো করুন,
ডেকে আনুন জ্যোতিষ ও গণকদের।
তাদের কাছে বলুন স্বপ্নরাজ্যে যা সংঘটিত হয়েছে,
তারপর জিজ্ঞাসা করুন তাদেরকে তার প্রতিকার।
জেনে নিন, কার হাতে রয়েছে আপনার প্রাণ,
সে কি মনুষ্যজাত, দৈত্যজাত না পরীজাত?
যখন তা জানতে পারবেন তখনই করতে পারবেন
তার প্রতিবিধান,
অন্ধকারে ভয় করে লাভ কি, সংশয়ে
সন্ত্রস্ত হওয়ার প্রয়োজন কি?
সুন্দরী শ্রেষ্ঠার রজতশুভ্র-মুখ-নিঃসৃত এই বাণী
বাদশার মনঃপূত হোল।
শীঘ্রই কাকপক্ষ সদৃশ রাত্রির অন্ধকার ছিন্ন করে
উদয়াচলে পৃথিবী এক প্রদীপকে উঁচু করে ধরলো।
সূর্য নীল আকাশে ছড়িয়ে দিলো
হলুদ বর্ণের অসংখ্য মণি কাঞ্চন।
বাদশা ডেকে পাঠালো যেখানে যত জ্ঞানী গুণী ছিল সবাইকে—
কবি, জ্যোতিষ ও দার্শনিক।
সকলকে একত্রিত করে
বাদশা তার দুঃখের প্রতিকার চিন্তা করতে বললো।

তাদের কাছ থেকে সে জানতে চাইলো স্বপ্নের রহস্য ও
তার ভালো-মন্দের কথা।
বললো, তোমরা আমাকে বল, কখন আমার দিন শেষ হবে?
আমার পর কে এই তখ্‌ত ও তাজের অধিকারী হবে?
এইসব রহস্যের উত্তর আমি তোমাদের কাছে চাই,
অন্যথায় তোমাদের মস্তকে নেমে আসবে অপমান।
এই কথা শুনে জ্ঞানীদের ওষ্ঠাধর শুষ্ক হোল ও মুখমণ্ডল হোল আর্দ্র,
তারা পরস্পরের মধ্যে কথা বলতে শুরু করলো।
বললো, যদি আমরা অকপটে সত্য কথাই বলি,
তবে অবিলম্বে আমাদের মস্তক কর্তিত হবে।
আর যদি সত্য কথা না বলি,
তাহলেও ত্যাগ করতে হবে প্রাণের মায়া।
এইভাবে তিন দিন পর্যন্ত জ্ঞানিগণ চুপ করে রইলো,
কেউই মুখ খুলতে সাহস করলো না।
চতুর্থ দিন বাদশা প্রকাশ করলো তার ক্রোধ,
জ্ঞানীদেরকে স্পষ্ট বলে দিল,—
জীবন যদি তোমাদের প্রিয় হয়ে থাকে,
তবে প্রকাশ কর তোমাদের জ্ঞানের মধ্যে যা আছে।
বাদশার কথা শুনে জ্ঞানীদের দৃষ্টি আনত হোল,
যেন তাদের চোখ থেকে রক্ত ঝরছে।
বিশিষ্ট এই জ্ঞানীদের মধ্যে
এক ব্যক্তি ছিল বড়ই সরল ও সত্যবাদী।
সেই জ্ঞানী ও সজাগ ব্যক্তি
সকলের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে এগিয়ে গেলো বাদশার দিকে,
এবং নির্ভয়ে জোহাকের সামনে
তার রসনা মুক্ত করলো।

বললো, বিচ্ছিন্ন কর আমার তনু থেকে মস্তক—
মৃত্যু নিয়েই মানুষ জন্মগ্রহণ করে মায়ের উদর থেকে।
তোমার আগেও অনেক বাদশা রাজত্ব করে গেছে,
অলঙ্কৃত করেছে তারা রাজসিংহাসন।
বহু আনন্দ ও বেদনা তারা প্রত্যক্ষ করেছে,
এবং তাদের দীর্ঘ যুগেরও হয়েছে অবসান।
তুমি যদি তোমার চারিদিকে লৌহ প্রাচীরও নির্মাণ কর,
তবুও কাল তা পিষে গুঁড়ো গুঁড়ো করবে।
জেনে রাখ, তোমার পরে একজন তোমার এই তখতে বসবে,
তোমার এই ভাগ্য একদিন মিশে যাবে ধূলায়।
সেই লোক দুনিয়ার সর্বত্র বিখ্যাত হবে ফারেদূন বলে,
আকাশ তাকে দান করবে বহু ভাগ্য।
সেই বীর-পুরুষ এই মুহূর্তে মাতৃগর্ভ থেকে জন্ম নিয়েছে,
কাজেই এই মুহূর্তে তোমার ভয়ের কিছু নেই।
বুদ্ধিমতী মায়ের শুশ্রূষায় সে ধীরে ধীরে
বৃক্ষের মতো ফুলন্ত হবে।
তারপর যখন সে বড় হবে,
তখন রাজমুকুট, সিংহাসন ও রাজত্বের জন্য সে কোমর বাঁধবে।
ফুলন্ত দেবদারু বৃক্ষের মতো উন্নত হবে তার মস্তক,
কাঁধে সে তুলে নিবে গোমুখ চিহ্নিত এক লৌহ প্রহরণ।
সেই ভীম প্রহরণ দ্বারা সে তোমার শিরে আঘাত হানবে ও
তোমাকে বেঁধে প্রাসাদ থেকে টেনে পাহাড়ের দিকে নিয়ে যাবে।
এই কথা শুনে জোহাক বললো,
কেন সে আমাকে বাঁধবে, তার সঙ্গে আমার কি শত্রুতা?
সেই সাহসী জ্ঞানী তখন বললো, যদি বুদ্ধিমান হও—
তবে জেনে রাখ, অনর্থক কেউ কারো অমঙ্গল কামনা করে না।

তোমার হাতেই তার পিতার জীবনাবসান হয়েছে,
সেই দুঃখেই তার অন্তর হবে বিদ্বেষ-পূর্ণ।
এক কান্তিময় গাভী হবে তার ধাত্রী,
সেই পান করাবে তাকে দুগ্ধ।
সেই গাভীও তোমারই হাতে প্রাণ হারাবে,
এবং তারই প্রতিশোধ গ্রহণে সে টেনে নিবে সেই ভীম গদা।
এই কথা শোনামাত্র সিংহাসনের উপর জোহাকের
জ্ঞান হারাবার উপক্রম হোল,
এবং উঁচু তখ্‌তে সমাসীন প্রতিপত্তিশালী বাদশার মুখমণ্ডল
ভয়ে পাণ্ডুর হোল ;
কিন্তু মুহূর্তেই স্থান-কাল সম্পর্কে সচেতন হয়ে
সে নিজেকে সামলে নিলো।
এবং আদেশ করলো ফারেদূন যেখানেই আছে—প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে,
তাকে খুঁজে বার কবতে হবে।
এর পর থেকে জোহাকের না রইলো শান্তি, না নিদ্রা, না আহার,
রৌদ্র করোজ্জ্বল দিনগুলো যেন তার চোখে অন্ধকার হয়ে এলো।

ফারেদূনের জন্মবৃত্তান্ত

যদিও দীর্ঘ দিন ধরে জোহাক সর্বত্র বিজয়ী রইলো
তবু তার অজগর তনুর অন্তরে যে প্রাণ তা রইলো, ভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে।
ওদিকে মাতৃগর্ভ থেকে জন্ম নিলো সুলক্ষণে ফারেদূন,
দুনিয়ায় একটির পর একটি ঘটনা সংঘটিত হয়ে চললো।
সেই বিশ্ব-অন্বেষণকারীর মধ্যে প্রকটিত হোল মাহাত্ম্য,
একদিন যা তার কর্মের মধ্যে প্রতিভাত হবে সূর্যের মতো।
সরল দেবদারু যেমন করে বাড়ে তেমনি করে
বেড়ে চললো শিশু,
রাজকীয় গুণাবলী ধীবে ধীরে তার মধ্যে প্রকটিত হোল।
বৃষ্টি যেমন ধরণীকে সাজায়
জ্ঞান যেমন জীবনকে করে ঐশ্বর্যশালী—
তেমনি ফারেদূনের মস্তকে ঘূর্ণিত হোল সৌভাগ্য,
প্রেম তাকে জানালো তার আনুগত্য।
সুদর্শন বীর তার মাতৃগর্ভ থেকে জাত হাওয়ার মুহূর্তেই
ধেনুদের মধ্যে সবচাইতে মর্যাদা সম্পন্ন
এক কান্তিময় গাভীর
প্রতিটি লোম ঝিলিক দিয়ে উঠলো নতুন রঙের বিভায়।
সেই মুহূর্তে দুনিয়ার জ্ঞানিগণ আসর করে বসলো
মিলিত হোল জ্যোতিষ, জ্যোতির্বিদ ও ধর্মাবেত্তাগণ।
এদিকে জোহাক সমস্ত পৃথিবী পূর্ণ করলো আলোচনায়,
দুনিয়ার সর্বত্র অন্বেষণ চালালো সে ফারেদূনের জন্য।
ফারেদূনের পিতা আবতীন,

একদিন ধরণী যার জন্যে সঙ্কুচিত হয়েছিল।
সেই আবতীন জোহাকের ভয়ে পালিয়েছিল দূরে,
কিন্তু সহসা ধৃত হয়ে বন্দী অবস্থায়
বন্য পশুর মতো
আনীত হয়েছিল জোহাকের সামনে।
ফারেদুনের বুদ্ধিমতী মাতা সব দেখেছিল—
তাই ফারেদুনকে দেখে তার স্মরণে উদিত হোল স্বীয় স্বামীর দুর্ভাগ্যের কথা।

এই মহিমময়ী নারী যেন যুগের অলঙ্কার,
সে যেন সেই বৃক্ষ যার থেকে কর্তিত হয়েছে সমাবোহ্।
এই নারীর নাম ছিল ফারানক,
ফারেদুনের রক্ষায় উদ্বিগ্ন হোল তার মাতৃমন।
কালের গতি তার অন্তরকে ভেঙে খান খান করলো,
তাই ক্রন্দনরত অবস্থায় সে ধরলো বনের পথ।
বহু পথ হেঁটে সেই কান্তিময় গাভী যেখানে থাকে, সেখানে এসে সে উপস্থিত হোল,

দেখলো, সেই গাভীর রঙ উজ্জ্বল ও তনু লাবণ্যযুক্ত।
বন-রক্ষকের সামনে এসে দাঁড়ালো দুঃখিনী ফারানক,
তার বুক বেয়ে পড়ছে অশ্রুধারা।
ফারানক বললো, মহাত্মন, এই দুগ্ধপায়ী শিশুর দায়িত্ব আপনি
কিছুদিনের জন্য গ্রহণ করুন।
মায়ের হাত থেকে আপনি তাকে পিতৃবৎ কোলে তুলে নিন,
ও এই কান্তিময় গাভীর স্তন্যরসে তাকে পালন করুন।
বন ও কান্তিময় গাভীর পূজারী সেই গো-রক্ষক,
সাধ্বী ফারানককে বললো,
আমি আপনার সন্তানের সামনে অনুগত-দাসের মতো

অবস্থান করবো ও আপনার উপদেশ রক্ষা করবো।
এই কথা শুনে ফারানক পুত্রকে তার হাতে সমর্পণ করে
তাকে কিঞ্চিৎ উপদেশাদি দান করলো।
তিন বছর ধরে সেই গাভীর দুধে বন-রক্ষক পিতৃবৎ স্নেহে শিশুকে
পালন করলো, ও এইভাবে রক্ষা করলো তার প্রতিজ্ঞা।
এদিকে জোহাক তার অনুসন্ধানে তৃপ্ত না হয়ে
সর্বত্র ঘোষণা করে দিল সেই কান্তিময় গাভীর কথা।
মা তখন ত্বরিতে ধাবিত হোল বনের দিকে,
ও সেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ-রক্ষককে এসে বললো,
বিশ্ব-প্রভুর দিক থেকে আমি বাণী পেয়েছি,
হৃদয়ে আমার উদিত হয়েছে এক আশঙ্কা।
আমার প্রিয় সন্তান ও আমাকে একই জায়গায় থাকতে হবে,
এ ছাড়া অন্য উপায় নেই।
এই ইন্দ্রজালের দেশ ছেড়ে
আমরা চলে যাব সুদূর হিন্দুস্তানের দিকে।
লোকালয় থেকে দূরে
আমি আমার সন্তানকে নিয়ে আলবুর্জ[১] পাহাড়ে চলে যাব।
এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে রূপবতী রমণীর
মুখভাব শীতল হোল —কঠিন হোল তার সংকল্প,
মুহূর্তে যেন সে মুছে নিয়েছে তার হৃদয়ে ছিল রক্তের যত দাগ।
তারপর দ্রুতগামী ঘোড়ার মতো সে তার সন্তানকে নিয়ে
প্রয়াণপর হোল,—
এবং ক্রুদ্ধ বাঘিনীর মতো সে তাকে নিয়ে এলো পাহাড়ের এক
নির্জন এলাকায়।

১ মাজিন্দিরানের অন্তর্গত এক পাহাড়ের নাম। ককেশাসের একটি চূড়াকেও আলবুর্জ বলা হয়।

সেই পাহাড়ে এক ধার্মিক পুরুষ বাস করতেন,
দুনিয়ার সকল কাজে তিনি ছিলেন উদাসীন।
ফারানক তাঁকে বললো, ওগো মহাত্মন,
আমি ইরান দেশের এক দুঃখিনী।
এই মহান শিশু আমারই সন্তান,
সে একদিন বহু আসরের নায়ক হবে,
জোহাকের রাজমুকুট সে-ই একদিন করবে ভূলুণ্ঠিত,
এবং তার কোমরবন্ধ টেনে ছিন্ন করবে।
আপনি তার রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করুন,
পিতার মতো তার প্রাণের মায়ায় কম্পিত হোক আপনার অন্তর।
সেই মহাপুরুষ ফারানকের সন্তানকে গ্রহণ করলেন,
ভয় কিংবা দুর্ভাবনা কিছুই তাঁর অন্তরকে স্পর্শ করলো না।
একদিন জোহাক জানতে পেল,
সেই গাভী ও সেই বনের সন্ধান।
সে তখন মত্ত হস্তীর মতো প্রবেশ করলো সেই বনে
এবং সংহার করলো গাভীর প্রাণ।
চারদিকে যা দেখলো তাই সে ধ্বংস করলো
তছনছ করে দিল সেই সুন্দর উপবন।
খোঁজ চললো, কোথায় আছে ফারেদুন।
কিন্তু কোথাও সে কাউকে দেখতে পেলো না।
অতঃপর বনে আগুন দিয়ে দাবানলের সৃষ্টি করে,
জোহাক নিজের উন্নত প্রাসাদে ফিরে এলো।

ফারেদুন মায়ের কাছে নিজের বংশ-পরিচয় জানতে চাইল

অতঃপর ষোলটি বছর অতিক্রান্ত হলে
ফারেদুন আলবুর্জ-পাহাড় ছেড়ে উপত্যকায় নেমে এলো।
একদিন সে মায়ের কাছে বললো,
মা, আমার রহস্যময় অতীত তুমি খুলে বল।
বল, কে আমার পিতা,—
কার ঔরসে আমার জন্ম?
মানুষের কাছে আমি কি বলবো, তা বলে দাও,
উদ্ঘাটিত কর এক বোধ্য কাহিনী।
ফারানক তখন বললো, হে যশঃকামী,
তুমি যা জানতে চাও সব বলবো।
শোন, ইরান দেশে এক বীরপুরুষ ছিলেন
তাঁর নাম ছিল আবতীন।
তিনি ছিলেন কেয়ানী[১]-বংশ-সম্ভূত ও জাগ্রত-চিত্ত,
তিনি ছিলেন জ্ঞানী, বীরপুরুষ ও স্বাস্থ্যবান।
তাঁর বংশের আদি পুরুষ ছিলেন বিখ্যাত তহ্‌মূরস,
পিতা থেকে পুত্র এইভাবে সেই বংশের ধারা প্রবহমান রয়েছে।
তিনিই তোমার পিতা ও আমার পূজনীয় স্বামী,
আহা, তাঁকে হারিয়ে আমার উজ্জ্বল দিন হয়েছে অন্ধকার!
জোহাককে জ্যোতিষীরা বলেছিল,

১ ইরানের সর্বপ্রাচীন রাজবংশের নাম ছিল কেয়ানী। সেই থেকে 'কায়' বলতে সম্রাট বা বাদশা বুঝিয়ে থাকে।

ফারেদুনের হাতে তোমার যুগের অবসান হবে।
এই কথা শুনে ইন্দ্রজালের পূজারী জোহাক
ইরান থেকে তোমার প্রাণ সংহারের জন্য হাত বাড়ালো।
সেই দুষ্টের হাত থেকে তোমাকে লুকিয়ে রেখে
কি করে যে আমার দিনগুলো কেটেছে তা কি বলবো।
তোমার পিতা যৌবনের অধিকারী সেই পুরুষ পুংগব—
তোমার প্রাণের বদলে বিলিয়ে দিয়েছিলেন নিজের মহামূল্য জীবন।
জোহাকের দু'বাহুতে ফণাধর সাপের জন্য
ইরান থেকে আসতো মানুষের মগজ।
তোমার পিতার মস্তিষ্কেও তেমনি
সেই সর্পদ্বয়ের খাদ্য তৈরী হয়েছিল।
আমি তখন তোমাকে নিয়ে চলে এলাম এক বনে,
যাতে করে তোমার সম্পর্কে কারো মনে কোন
সন্দেহের উদয় না হয়।
সেখানে দেখতে পেলাম বসন্তের মতো কান্তিময় এক গাভী
তার আপাদমস্তক নানা সুন্দর বর্ণে চিত্রিত।
সেই গাভীর রক্ষক তার পাশেই
রাজার সমারোহে বসেছিল।
তার হাতেই আমি তোমাকে সমর্পণ করলাম,
দীর্ঘ দিন ধরে সেই তোমাকে পরম স্নেহে লালন করেছিল।
সেই শিখী-বর্ণ গাভীর স্তনজাত দুগ্ধে
তুমি গড়ে উঠেছিলে যেন দুরন্ত তলোয়ার।
হঠাৎ একদিন সেই গাভী ও সেই বনের সংবাদ
বাদশার কানে গিয়ে পৌঁছলো।
আমি তখন ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করে তোমাকে নিয়ে
বেরিয়ে পড়লাম সেই বন থেকে,
প্রিয় স্বদেশ ইরান ছেড়ে পালিয়ে এসেছিলাম দূরে।

ওদিকে সেই কান্তিময় গাভীও জোহাকের হাতে বধিত হোল,—
আহা, অবলা সেই দয়াবতী তোমার ধাত্রী!
আমাদের গৃহ থেকে আকাশের উচ্চতা পর্যন্ত
উত্থিত হোল বেদনার ধূলিরাশি।

মায়ের মুখে এই কাহিনী শুনে ক্রোধে রক্তবর্ণ হোল ফারেদুন,
আবেগে তার অন্তর মথিত হোতে লাগলো;
হৃদয়ে বেদনা ও মস্তিষ্কে জিঘাংসা নিয়ে
ক্রোধে তার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হোল।
ফারেদুন মাকে বললো, সিংহ কখনো
তার শৌর্যের পরিচয় না দিয়ে থাকতে পারে না;
ইন্দ্রজালের পূজারী যা করতে পারে করুক,
আমাকে তুলে নিতে হবে কোষোন্মুক্ত তলোয়ার।
পরম পবিত্র বিশ্ব-প্রভুর ইচ্ছায় আমি ধাবিত হবো,
এবং জোহাকের প্রাসাদ থেকে উত্থিত করবো ধূলিরাশি।
মা তখন অধীর হয়ে বললেন, বাছা, এমন করা ঠিক হবে না,
এই দুনিয়ায় তোমার সাহায্যকারী কেউ নেই।
জোহাক বিশ্বপতি, সে তাজ ও তখ্‌তের মালিক,
তার আদেশে সৈনিকগণ প্রস্তুত হয় যুদ্ধযাত্রায়।
সে যদি চায় তবে প্রতিটি দেশ থেকে শত সহস্র
সৈনিক প্রস্তুত হয়ে আসবে যুদ্ধক্ষেত্রে।
প্রেম ও শত্রুতার রীতি এই কথাই ঘোষণা করে যে,
দুনিয়াকে যৌবনের চোখে কখনো চেয়ে দেখো না;
যৌবন-সুরার স্বাদ যে গ্রহণ করেছে
নিজেকে ছাড়া দুনিয়ায় সে আর কাউকে দেখতে পায় না।

কামনা তোমার মস্তিষ্কে সেই উন্মত্ততাকেই জাগিয়ে তুলেছে,
বৎস, তুমি শান্ত হও, তুমি চির সুখী হও।
হে আমার প্রিয় পুত্র, আমার এই উপদেশ স্মরণে রেখো,
মায়ের কথা শুনে বাসনাকে উন্মত্ততা বলে স্বীকার করে নাও।

লৌহকার কাওয়া ও জোহাকের কাহিনী

এইভাবে জোহাক দিনরাত
ফারেদুনের চিন্তায় কালাতিপাত করে।
উপরে নীচে সর্বত্র সে দেখতে পায় ফারেদূনের শৌর্যের বিভা,
হৃদয়ে তার ভয়ের শলাকা বিদ্ধ হয়ে থাকে।
একদিন সে তার উজ্জ্বল সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে
শিরে তুল নেয় বিজয়ী মুকুট।
এবং প্রতিটি দেশ থেকে সেইসব দলপতিকে ডেকে পাঠায়
যারা তার রাজত্বের মেরুদণ্ডকে সোজা করে রেখেছে।
তারপর দলপতিগণ ও জ্ঞানীদেরকে সম্বোধন করে সে বলে,
তোমরা সবাই বুদ্ধিমান ও কুশলী;
জ্ঞানীদের কাছে একথা আর অজানা নেই যে,
আমার এক দুশমন গোপনে অবস্থান করছে।
সেই দুশমন বয়সে ছোট হলেও জ্ঞানে প্রবীণ,
সে অভিজাত, বীর ও অত্যন্ত ক্ষিপ্র।
যদিও এই যুবক বয়সে তরুণ
তবুও জ্ঞানিগণ বলেছেন,
শত্রু যদি ছোট ও দুর্বল হয়
তথাপি তাকে তুচ্ছ করা উচিত নয়।
আমিও আমার শত্রুকে তুচ্ছজ্ঞান করি না,
কালের অমঙ্গল আমাকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করেছে।
শত্রুর চাইতে আমার সৈন্যদল অনেক বড়—
সেই সৈন্যদলে রয়েছে মানুষ দৈত্য ও পরী।

আমি আরো তত বড় একটা সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে চাই
যাতে সম্মিলিত ভাবে থাকবে মানুষ দৈত্য ও পরী।
তারা সবাই একমত হবে আমার সঙ্গে,
সুতরাং শত্রুর সুখ্যাতি আমি আর শুনতে চাই না।
আমি এক অঙ্গীকারনামা সম্পাদন করতে চাই
যাতে লেখা থাকবে, বাদশা সৎকাজ ছাড়া আর কিছুই করেন না।
সত্যভাষণ ব্যতিরেকে আর কিছুই শোভা পায় না তাঁর মুখে,
অপরের বিপদে দান করাই তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।
বাদশার ভয়ে সবাই চুপ করে রইলো,
সম্পাদিত হোল সেই অঙ্গীকারনামা।
সেই অঙ্গীকারনামায় তখন সাক্ষী হিসেবে
গৃহীত হতে লাগলো যুবক বৃদ্ধ সকলের স্বাক্ষর।
এমন সময় সহসা বাদশার দরবারে
এক প্রার্থনাকারীর আগমন হোল!
বাদশা প্রার্থীকে কাছে আসার অনুমতি দিলো,
দরবার গৃহে তখন যশস্বী দলপতিগণ সকলেই সমাসীন।
বাদশা প্রার্থীকে জিজ্ঞাসা করলো,
বল কি তোমার দুঃখ, কে তোমার উপর জুলুম করেছে?
প্রার্থনাকারী মস্তকে করাঘাত করে জবাব দিলো,
হে বাদশা, আমি কাওয়া নামক লৌহকার;
আমার দুঃখের প্রতিকার প্রত্যাশায় আমি এখানে দৌড়ে এসেছি,
আমার বিলাপ-ধ্বনি ধাবিত হয়েছে আপনার সিংহাসনের দিকে।
যদি দান করাই হয়ে থাকে আপনার রীতি,
তবে ওগো নরপতি বর্ধিত করুন তার পরিমাণ।
আমারই উপর সূচিত করুন আপনার দানের প্রসার,
আমার বুকে বিদ্ধ করুন তীক্ষ্ণ ছুরিকা।

অত্যাচারকে যদি আপনি উচ্ছেদ করতে চান,
তবে আমার সন্তানের উপর থেকে উঠিয়ে নিন আপনার হাত।
আমার আঠারোটি সন্তান ছিল,
তন্মধ্যে এখন মাত্র একটিই রয়ে গেছে।
তার প্রাণ আপনি দান করুন, অন্যথায়—
সারা জীবন আমার বুকে জ্বলবে শোকের আগুন।
হে বাদশা, অবিলম্বে আমার দুঃখের প্রতিকার করুন,
যদি আমি নির্দোষ হয়ে থাকি, তবে দয়া করে খুঁজবেন না কোন অজুহাত।
ওগো রাজমুকুটধারী, আমার দিকে করুণার দৃষ্টিতে চেয়ে দেখুন,
আমার হৃদয়-বেদনার উপশমে তৎপর হন।
আমার জন্য দিনগুলো অন্ধকার হয়েছে,
হৃদয়ে নেমেছে হতাশা ও মস্তিষ্কে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে অসহ্য বেদনা।
যৌবন আমার বিগত এবং সন্তানও আমার আর নেই
দুনিয়ায় সন্তানের মতো বন্ধু আর কে আছে?
আমার দুঃখ এখনও তার সীমা অতিক্রম করেনি,
এখনও তার প্রতিকারের উপায় আছে।
যদি কোন অজুহাত না থাকে তবে এখনই তা প্রয়োগ করুন,
নিয়তির উদ্যত শত্রুতাকে আমার উপর থেকে নিবারিত করুন।
আমি এক দরিদ্র কর্মকার,
অথচ আমারই উপরে আপতিত হয়েছে বাদশার আগুন।
আপনি বাদশাহ, আপনি অমিত শক্তির অধিকারী।
বদান্যতার সুখ্যাতিতে পূর্ণ করুন আপনার শাসনকাল।
আপনি সপ্তরাজ্যের অধীশ্বর,—
তবে কেন থাকবে আমাদের দুঃখ।
আপনার গণনা যখন আমার উপর পর্যন্ত গড়িয়ে এলো,
তখন তা দেখে সারা জগৎ বিস্ময়ে হতবাক হোল।

সেই গণনায় আমার পুত্রের পালা এলো,
ও তার কানে পেঁছিলো আপনার আদেশ,—
অর্থাৎ আমার পুত্রেরই মগজে খাদ্য প্রস্তুত হবে
আপনা'র সর্পদ্বয়ের ক্রোধশান্তির জন্যে।
এইটুকু মাত্র বলতেই বাদশা তার দিকে চেয়ে
স্বীয় মুখমণ্ডল টেনে দিলো কপট বিস্ময়ের ছায়া।
তারপব কাওয়াব পুত্রকে তাব হাতে ফিরিয়ে দিয়ে
বাদশা তার আনুগত্যেব আহ্বান জানালো।
সাক্ষীরূপে অঙ্গীকাবনামায়
স্বাক্ষর করাব আদেশ হোল কাওয়ার উপর।
কাওয়া ঐ অঙ্গীকাবনামা পড়ে শেষ করে
রাজ্যের সকল তরলমতি বৃদ্ধদেব ডেকে
চীৎকার কবে বললো. হে দৈত্যের পদলেহনকারিগণ,
রাজার ভয়ে কি তোমাদের হৃদপিণ্ড ছিন্ন হয়ে গেছে?
সবাই কি মুখ কবেছ নবকের দিকে,
সবাই কি নিজেদের অন্তর সমর্পণ করেছ অন্যায়কারীর আদেশের নীচে?
আমি কিছুতেই এই অঙ্গীকাবপত্রে সাক্ষী হবো না,
কিছুতেই আমি বাদশার ইচ্ছার মুখে আত্মসমর্পণ করব না।
এই বলে সে কম্পিত কলেবরে উঠে দাঁড়ালো,
ও সেই অঙ্গীকারপত্র ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে পদতলে মাড়িয়ে দিলো।
তারপর প্রাণপ্রিয় পুত্রকে সঙ্গে করে
ও চীৎকারে গগন বিদীর্ণ করে রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে বাইরের পথ ধরলো।
দলপতিগণ তখন বাদশার গুণকীর্তন করে বললো,

হে যশস্বী দুনিয়াপতি,
ঘূর্ণ্যমান আকাশ আপনার মস্তকের উপর নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে
অবস্থান করে,
আপনার সুসংহত সেনাবাহিনীর উপর দিয়ে বাতাস পর্যন্ত
বইতে সাহস পায় না,
অথচ মিথ্যাবাদী লৌহকার কাওয়া কি করে
আপনারই সামনে সমকক্ষের মতো রক্তচক্ষু হয়?
আপনার দেওয়া অঙ্গীকারপত্র, যাতে রয়েছে আমাদেরও
সকলের স্বাক্ষর,
কি করে সে তা ছিন্ন করতে পারে ও ঔদ্ধত্যের সঙ্গে
করতে পারে আপনার বিরোধিতা?
সে যেভাবে বৈরীভাব নিয়ে বিনির্গত হলো,
তাতে মনে হয়, সে ফারেদুনের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে।
এর চেয়ে অন্যায় কাজ আমরা আর কিছুই দেখিনি,
এমন ব্যবহারে আমাদের চক্ষু অন্ধকার হয়েছে।
বাদশা তখন বললো,
আমার কাছে তোমরা শোন এক আশ্চর্য বিবরণ।
কাওয়া যখন আমার দরবারের দ্বারদেশে এসে উপনীত হয়েছে
তখন আমার দুই কানে ধ্বনিত হচ্ছিল শৃগালের অশুভ চীৎকার।
আমারই প্রাসাদের মধ্যে তার ও আমার মাঝামাঝি
উঠে এসেছিল এক ইস্পাতের দেয়াল,
এই অদ্ভুত দৃশ্যে হৃদয়ে আমার আতঙ্ক প্রবিষ্ট হয়েছিল।
জানিনা, এরপর কি ঘটনা ঘটবে,
জানি না, আকাশ কি রহস্য লুকিয়ে রেখেছে তার মধ্যে?

এদিকে কাওয়া বাদশার দরবার থেকে বেরিয়ে
বিপণি-শ্রেণীর সামনে এসে লোকজন জমায়েত করলো।

সেখানে সে চীৎকার করে জানালো তার অভিযোগ,
এবং সমস্ত দুনিয়াকে আহ্বান করলো অত্যাচারের প্রতিকারের দিকে।
যে চর্ম দিয়ে লৌহকারগণ
ডঙ্কায় আঘাত করে,
কাওয়া সেই চর্ম তার বর্শায় বেঁধে নিলো,
এবং তারপর বাজার ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো পথে।
সেই বর্শা হাতে সে চীৎকার করে বললো,
ওগো বিশ্ব-প্রভুর পূজারী জনগণ,
যদি ফারেদুনের কাছে যেতে চাও, তবে এসো,
যদি জোহাকের বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেতে চাও তবে এসো।
আমি সবাইকে নিয়ে যাব ফারেদুনের সমীপে,
সেই মহত্বের ছায়ায় জমায়েত করবো আমি সবাইকে।
এই ভাবে সে শয়তান-রাজার রাজ্য ছেড়ে প্রয়াণপর হোল,
যে রাজা অন্তরের অন্তঃস্থলে বিশ্ব-স্রষ্টার দুশমন।
এই প্রকাশ্য অপযশ কীর্তন শুনে
বন্ধুদের মধ্যে থেকেও বেরিয়ে এলো দুশমনের কণ্ঠস্বর।
এক বীর সৈনিক জমায়েত থেকে বেরিয়ে
সামনে এসে দাঁড়ালো।
সে জানতো কোথায় আছে ফারেদুন,
মস্তক উন্নীত করে সে সকলকে পথ দেখিয়ে চললো।
লোকজন নতুন নায়কের সমীপবর্তী হয়ে
দূর থেকে তাঁকে দেখতে পেয়ে উচ্চকণ্ঠে উত্থিত
করলো হর্ষধ্বনি।
কেয়ানী বংশের সুযোগ্য সন্তানের দৃষ্টি যখনই সেই
ঝাণ্ডা-যুক্ত বর্শার দিকে পড়লো,
তখনই মঙ্গলচিহ্নরূপে এক ব্যাঘ্র উদিত হলো তাঁর নজরে।

তিনি সেই ঝাণ্ডাকে সজ্জিত করলেন রোমক দেশীয়

সুদৃশ্য রেশমী বস্ত্র দ্বারা,

ও তাতে খচিত করলেন সোনা ও মণিমুক্তা।

তারপর সেই ঝাণ্ডা তিনি টেনে নিলেন মাথার উপরে—সুহাসিনী

চাঁদের মতো,

ফলে সুমঙ্গল যেন রূপ ধরে দাঁড়ালো সেখানে।

সেখানে যারা ছিল

তারা ফারেদুনের মাথার উপর রাখলো রাজমুকুট।

এবং সেই বহুমূল্য চর্মের উপর

পাঠ করলো স্তুতিমূলক কবিতা।

সেই সুদৃশ্য রেশমী ঝাণ্ডা থেকে যেন

কেয়ানীদের সৌভাগ্য নবরূপে উদীয়মান হোল।

যেন অন্ধকার রাত্রে উদয় হোল সূর্যের,

যা দেখে দুনিয়াবাসীর অন্তরে আশা জাগলো।

ঐ মুহূর্তে দুনিয়া যেন সচকিত হোল,

তার অন্তরে প্রচ্ছন্ন ছিল যত ঐশ্বর্য এইবার সে তা উন্মুক্ত করবে।

ফারেদুন পৃথিবীর দিকে দৃষ্টি আনত করলেন দেখলেন

সর্বত্র মঙ্গল চিহ্ন

আর জোহাকের সামনে ধরণী প্রকটিত করলো যতো

অমঙ্গলের লক্ষণ।

ফারেদুন কেয়ানী তাজ পরে

যুদ্ধবেশে সজ্জিত হয়ে মায়ের কাছে এলো।

বললো, মা, আমি যুদ্ধে যাচ্ছি,

তুমি আমাকে আশীর্বাদ করো, আমাকে বারণ করো না।

বিশ্বস্রষ্টা আছেন,

তিনিই সকল বিপদে সাহায্য করবেন।

মায়ের চোখ থেকে অশ্রু ঝরলো,—
বেদনাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি বিশ্বপ্রভুকে ডেকে বললেন,
ওগো দয়াময়, তোমারই কাছে এই ধন আমি গচ্ছিত রাখলাম,
প্রভু, তোমারই হাতে আমি সঁপলাম আমার সন্তানকে।
অকল্যাণকে তুমি তার থেকে দূর করো,
দুনিয়াকে করো মূর্খদের থেকে মুক্ত।
ফারেদূন হাল্কা মন নিয়ে তাঁর যাত্রা শুরু করলেন,
এবং রসনাকে সংযত করে রাখলেন নিষ্ঠার সঙ্গে।
তাঁর দুই ভাগ্যবান সহোদর ছিল,
দু'জনই ছিল বয়সে তাঁর চেয়ে বড়।
একজনের নাম ছিল কেয়ানূশ
দ্বিতীয় জনের নাম ছিল পরমায়া।
ফারেদূন তাদেরকে বললেন,
তোমরা আনন্দ করো ও সুখী হও।
ভাগ্যের এই পরিবর্তন মঙ্গলের জন্যই,
সে অচিরেই আমাদের মস্তকে রাখবে মাহাত্ম্যের মুকুট।
কুশলী কর্মকারগণকে ডেকে আনো,
ও আমার জন্য তৈরী করাও এক মহত্তম প্রহরণ।
বলার সঙ্গে সঙ্গেই দুই ভাই,
কর্মকারদের বিপণি অভিমুখে ধাবিত হোল।
কর্মকারদের মধ্যে যারা ছিল সবচেয়ে কুশলী,
তারা ফারেদূনের কাছে এসে উপস্থিত হোল।
বুদ্ধিমান নায়ক তখন তাদেরকে বুঝিয়ে বললেন,
কি ভাবে তৈরী করতে হবে সেই প্রহরণ।
নক্সা তৈরীকারক তখনই তাঁর সামনে মাটিতে নক্সা
এঁকে দেখালো—

আঁকলো প্রহরণের মাথায় এক ধেনুর মস্তক।
সেই নক্সা হাতে নিয়ে কর্মকারগণ ফিরে এসে
এক ভারী প্রহরণ তৈরী করলো।
সেটি যখন ফারেদূনের সামনে এনে রাখা হোল,
তখন তার উজ্জ্বলতায় লজ্জা পেল স্বয়ং তরুণ সূর্য।
সেই প্রহরণ ফারেদূনের মনঃপূত হোল,
তিনি কর্মকারদের পুরস্কৃত করলেন পোশাক ও রজত-কাঞ্চন দিয়ে;
তারপর সবাইকে শোনালেন আশার কথা;
দলপতিগণকে সুসংবাদ।
বললেন, যদি এই আজদাহাকে (জোহাককে) আমি পরাস্ত করতে পারি,
তবে তোমাদেরকে মুক্ত করবো সকল দুঃখ থেকে।
সমস্ত দুনিয়াকে ন্যায়পরায়ণতার দিকে নিয়ে আসবো,
এবং সকলকে আবার স্মরণ করাবো সত্য ও সাধুতার কাহিনী।

জোহাকের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য
ফারেদুনের যাত্রা

সূর্য মাথায় নিয়ে ফারেদুন
পিতৃ প্রতিশোধে কোমর বাঁধলেন।
সপ্তাহের ষষ্ঠ দিনে তিনি প্রসন্ন মনে বের হোলৌন—
শুভ নক্ষত্র ও কল্যাণের মাহেন্দ্র ক্ষণে।
তাঁর সমীপে এসে সমবেত হোল সৈন্যগণ,
এবং তাঁর ছাউনীর উপর ছত্র ধারণ করে দাঁড়ালো একখণ্ড মেঘ।
গম্ভীর-চাল হাতী, ধেনু ও মেষাদি পশু
লওয়া হোল সৈন্যদের জন্যে।
নায়কের বিশ্বস্ত কেয়ানুশ ও পর্‌মায়া
তাঁর কল্যাণকামী রূপে পাশে রইলো।
তাঁরা পার হয়ে চললেন মঞ্জিলের পর মঞ্জিল,—
মস্তিষ্কে জিঘাংসা ও হৃদয়ে বদান্যতা নিয়ে।
পথে পড়লো অশ্বারোহী আরবীয়দের এক জনপদ,
সেখানকার সবাই বিশ্বপ্রভুর পূজারী।
পুণ্যবানদের সেই ভূমিতে প্রবেশ করে
ফারেদুন সবাইকে জানালেন তাঁর শুভেচ্ছা।
ক্রমে রাত্রি হোল—অন্ধকার হোল দ্বিগুণতর,
এমন সময় সেখানে শুভার্থীর বেশে এক ব্যক্তির আগমন হোল—
সে যেন ছড়িয়ে দিলো তার চারদিকে মৃগনাভির সুগন্ধ—
বিকশিত হোল তার চলন ভঙ্গীতে হুরের সৌন্দর্য ও তার বদনে
হাস্যচ্ছটা বিচ্ছুরিত হোল।

এমন সময় সহসা ধ্বনিত হোল এক স্বর্গীয় বাণী,
তাতে বলা হোল, খুলে বলো তার কাছে মঙ্গল অমঙ্গলের
গূঢ় রহস্য।
নায়কের সামনে তখন সেই পরী-সদৃশ সৌন্দর্য প্রতিমা
মন্ত্রশক্তির নিগূঢ় গুণরাজির কথা বললো।
ভাগ্যের মণিকোঠার চাবি যার সাহায্যে
আয়ত্ত করা যায় শিখালো তাঁকে সেই মন্ত্র।
ফারেদুন বুঝতে পারলেন, এই মহাপুরুষের আগমন হয়েছে
বিশ্ব-প্রভুরই কাছ থেকে,
তিনি শয়তান কিংবা অমঙ্গলের অগ্রদূত নয়।
আনন্দে ফারেদুনের মুখমণ্ডল লোহিত বর্ণ হোল,
তিনি তাঁর জাগ্রত ভাগ্য ও যৌবন শক্তিকে সামনে দেখতে পেলেন।
এদিকে পাচকগণ অতিথির জন্য খাদ্যদ্রব্য
প্রস্তুত করে সামনে নিয়ে এলো।
খানাপিনার পর সহজেই
ফারেদুনের দুচোখে নেমে এলো রাজ্যের যত ঘুম।
তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন, চলে গেল সেই স্বর্গীয় দূত!
ফারেদুনের দু'ভাই এখন বুঝতে পারলো, ফারেদুনের ভাগ্য এই মুহূর্তে
পূর্ণজাগ্রত।
ঈর্ষান্বিত অন্তরে চুপি চুপি তারা আসর ছেড়ে উঠে গেল,
এবং চিন্তা করতে লাগলো কি করে ফারেদুনকে ধ্বংস করা যায়।
সেই উপত্যকার মাথার উপরেই দাঁড়িয়ে ছিল এক উঁচু পাহাড়,
দুই ভাই তারি অভিমুখে বেরিয়ে গেল,—দল ছেড়ে সবার অগোচরে।
পাহাড়ের নীচেই রাত্রির সুদীর্ঘ শ্রান্তি স্বপ্নে
নিমগ্ন হয়ে আছেন ফারেদুন।
সকলের অলক্ষ্যে অতি সন্তর্পণে সেই জালেম ভ্রাতৃদ্বয়

পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে উঠে গেল
এবং পর্বত-গাত্র থেকে কেটে বার করলো
এক বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড।
সেই পাথর দিয়ে ফারেদূনের মস্তক
চূর্ণ করে দেওয়ার সঙ্কল্প করলো তারা !
ও সেই সংকল্প নিয়ে প্রস্তর খণ্ডকে পাহাড়ের গায়ে গড়িয়ে দিলো—
তাদের আগ্রহী চোখে ভেসে উঠলো ঘুমন্ত ফারেদূনের
মস্তক বিদীর্ণ হওয়ার চিত্র।
বিশ্বপ্রভুর আদেশে সেই মুহূর্তেই প্রস্তরের
গড়িয়ে পড়ার আওয়াজ
ঘুমন্ত ফারেদূনকে জাগিয়ে দিলো।
তিনি উচ্চারণ করলেন স্বর্গীয়দূতের শিখানো মন্ত্র, সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তর খণ্ড
স্বস্থানে দাঁড়িয়ে গেলো,—এতটুকুও সে স্থানচ্যুত হোল না।
ভায়েরা বুঝতে পারলো—এ স্বর্গেরই চক্রান্ত,
তাই তাদের ইচ্ছা কিংবা অমঙ্গলের হাত এখানে অক্ষম হয়েছে।
ফারেদূন তখুনি নিজেকে প্রস্তুত করে নিলেন, কিন্তু কিছুই বললেন না,
এবং এ-সম্বন্ধে কাউকে কিছুই অবহিত করলেন না।
কাওয়ার সামনে এসে তিনি সবাইকে ডেকে
বাদশা জোহাকের প্রতি সকল জিঘাংসা নিয়ে প্রস্তুত
হওয়ায় আহ্বান জানালেন।
উড্ডীন করলেন কাওয়ানী ঝাণ্ডা,
এবং সেই সুলক্ষণে ঝাণ্ডাকেই দিলেন শাহী পতাকার মর্যাদা।
অতঃপর ফারেদুন আরওয়ান্দ নদীর দিকে মুখ করলেন,
কারণ, ঐ দিকেই ছিল জোহাক বাদশার রাজ্য।
যদি পাহলবী ভাষা তোমার জানা না থাকে
তবে আরবী ভাষায় আরওয়ান্দকে তুমি দজলা নদী বলতে পার।

চলতে চলতে ফারেদূন দজলা নদীর সংলগ্ন
বাগদাদ শহরের কাছে এসে থামলেন।
নদীর নিকটবর্তী হয়ে
আরওন্দ নদীর রক্ষকদের তিনি ডেকে বললেন,
শিগ্‌গীর করে নৌকা ও ডিঙ্গি সকল
ছেড়ে দাও জলের উপর—
এবং অবিলম্বে ভিড়িয়ে দাও সেগুলোকে
আমাদের দিকে ;
সৈন্যদের নিয়ে আমরা ওপারে যাব,
এখানে আমাদের একজনও কেউ থাকবে না।
কিন্তু নদী-রক্ষকরা তাঁর ডাকে সাড়া দিলো না,
ফারেদূনের কথায় একজনও নেমে এলো না জলে।
বরং উল্টো বললো, দেশের বাদশাহ্
আমাদেরকে গোপনে বলে দিয়েছেন,
তাঁর আদেশনামা যার হাতে নেই,
তেমন লোককে যেন আমবা নৌকো না দিই।
নদীরক্ষকদের কথা শুনে ফারেদূন অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলেন,
এবং সেই গভীর নদীর দিকে মুখ করলেন।
কেয়ানী বংশ-সুলভ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে
সিংহের শৌর্য নিয়ে তিনি অশ্বের উপর চড়ে বসলেন।
তাঁর সমস্ত অঙ্গে এবার প্রতিহিংসার জ্বালা দ্বিগুণ হয়ে উঠলো—
তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন নদীর মধ্যে।
তাঁর দেখাদেখি বন্ধুগণও কোমর বেঁধে
নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লো।
জয়ধ্বনি উচ্চারণ করে
জলরাশি ভেদ করে ছুটে চললো তারা।

হুকুম অমান্যকারী রক্ষকদের চোখে এই দৃশ্য

স্বপ্নবৎ পরিদৃশ্যমান হোল,

তারা দেখলো, পানিতেই সেই দুরন্ত অশ্বগুলি

ছুটে চলেছে।

সঙ্গীদল জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই

(মন্ত্রবলে) জলরাশি বিভক্ত হয়ে গেলো, সূর্য যেমন বিদীর্ণ করে দেয়

অন্ধকার রাত্রির বুক।

এই ভাবে তারা স্থলপথেই নদীর পরপারে গিয়ে পৌঁছলো,

এবং মুখ করলো বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে।

পাহলবী ভাষায় এই প্রাচীর-নগরীব

নাম ছিল জোহাকের নগরী।

বর্তমানে আরবীতে সে শহরকেই পবিত্রগৃহ বলা হয়,

জোহাক তৈরী করেছিল সে-নগরীতেই তার প্রাসাদ।

প্রান্তর ছেড়ে নগরীর কাছে আসতেই দেখা গেল,

গোয়েন্দাদল বেরিয়ে আসছে নগর থেকে।

এক মাইল দূরে থেকেই ফারেদূন

নগর-মধ্যে বাদশার প্রাসাদ দেখতে পেলেন।

সেই প্রাসাদের চূড়া মস্তক উন্নত করে আছে শনিগ্রহের উপরে—

যেন ইচ্ছা করলেই সে আকাশ থেকে পেড়ে আনতে পারে গ্রহদল।

সপ্তর্ষি নক্ষত্রের মতো উজ্জ্বল সেই প্রাসাদ,

সেখানে কত না সুখ ও আনন্দ জড়াজড়ি করে আছে।

ফারেদুন বুঝতে পারলেন, এটিই আজদাহারূপী জোহাকের গৃহ—

মাহাত্ম্য ও আধিপত্যের অচলায়তন।

তিনি তাঁর বন্ধুদের বললেন, এই সেই স্থান, যার কুহেলিকা থেকে

বেরিয়ে আসে উন্নত মর্যাদা।

হৃদয় আমার কাঁপছে; এখানেই ধরিত্রী লুকিয়ে রেখেছে

নিয়তির রহস্য।
এখন আমার কর্তব্য হোল, অবিলম্বে
সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া।
এই বলে তিনি ভারী প্রহরণ তুলে নিলেন,
এবং অশ্ব-বল্গা শ্লথ করে অশ্বকে দ্রুত ধাবিত করালেন।
অবিলম্বে বেগবান অগ্নিগোলকের মতো
প্রসাদ-রক্ষীদের সামনে এসে পৌঁছে গেলেন ফারেদুন।
ঘোড়ার উপর থেকেই তিনি উত্তোলন করলেন প্রহরণ,
সঙ্গে সঙ্গে রক্ষীদল মাটিতে শুয়ে পড়লো;
ফারেদুন অশ্বপৃষ্ঠে আরোহী হয়েই প্রবেশ করলেন প্রাসাদের মধ্যে,
তাঁর যৌবন-শক্তির কাছে ধরণী যেন মস্তক অবনত করলো।
সেই প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত কোন মানুষ
যেখানে পৌঁছতে পারেনি।
সেখানে এসে ফারেদুন উচ্চারণ করলেন বিশ্ব-স্রষ্টার নাম।

ফারেদুন জামশেদের ভগ্নিদ্বয়কে দেখলেন

জোহাক যে-সব ইন্দ্রজাল সেখানে বিস্তার করে রেখেছিল,
এবং নিজের শিরকে যেখানে আকাশের উচ্চতা পর্যন্ত উঠিয়েছিল,
সেখানে এসে ফারেদূন
এক বিশ্বপ্রভুর নামের সাহায্য ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলেন না।
যে-কেউ তাঁর সঙ্গে বিরোধিতা করতে এলো,
তারই মস্তক তিনি চূর্ণ করে দিলেন সেই প্রহরণের আঘাতে।
যতো যাদুকর সেই প্রাসাদে ছিলো
যতো ভীমবাহু দৈত্য ছিল—
সবারই মস্তক গদাঘাতে চূর্ণ করে
ফারেদূন ঐন্দ্রজালিক বাদশার সিংহাসনে এসে বসলেন।
জোহাকের তখ্‌তে পা রেখে
তিনি স্বীয় মস্তকে তুলে নিলেন কেয়ানীবংশের বিখ্যাত তাজ।
তারপর প্রাসাদের সর্বত্র দৃষ্টি প্রসারিত করে দেখলেন,
কিন্তু কোথাও তিনি জোহাককে দেখতে পেলেন না।
শুধু তার শয়ন-কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসছে
কৃষ্ণ-চক্ষু সূর্যমুখী সুন্দরীগণ।
ফারেদুন তখন বললেন, প্রথমে এদের দেহ ধৌত করো
বিশুদ্ধ পানিতে,
যে-ময়লা তাদের দেহে লেগে আছে তা পরিষ্কার করো।
পবিত্র শাসনকালের নতুন পথ তাদের দেখাও—
তাদেরকে মুক্ত করো পাপের কালিমা থেকে।
এরা মূর্তি-পূজকের প্রতিপালিতা,—

এরা বিকৃত-মস্তিষ্কের মতো ভাবালুতার দ্বারা উন্মাদ।
তখন বাদশা-জামশেদের দুই বোন
সতেজ গোলাপ ও নার্গিসের মতো—
ফারেদূনের সামনে উন্মুক্ত করলো তাদের রসনা,
বললো, তোমার নবযৌবন অক্ষুণ্ণ থাক যতদিন বেঁচে থাকে
এই প্রাচীনা ধরণী।
হে ভাগ্যবান, তুমি কোন্ আকাশের নক্ষত্র,
কোন্ বৃক্ষের ফল তুমি, আমাদের তা বলো।
কে তুমি সিংহের সিথানে এসে উপস্থিত হয়েছ,—
কে তুমি আগমন করেছ বীর-দলনকারী জোহাকের প্রাসাদে?
এই সর্প-স্কন্ধ শয়তান-চরিত্রের গৃহে
আমরা কত না দুঃখ ও বিপদ বরণ করেছি।
কত অন্যায় সয়েছি
এই দুষ্ট ঐন্দ্রজালিকের হাতে।
কাউকে আমরা এমন সাহস প্রদর্শন করতে দেখিনি,
কাউকে দেখিনি এখানে এসে বীরত্বের এমন পরাকাষ্ঠা দেখাতে।
বল, তুমি কি তখতের আকাঙ্ক্ষী হয়ে এখানে এসেছো?
তুমি কি কামনা কর রাজ্য ও মাহাত্ম্য?
ফারেদূন জবাবে বললেন, ভাগ্য ও রাজ-সিংহাসন
কারো জন্যে চিরদিনের নয়।
আমি পুণ্যবান আবতীনের পুত্র,
ইরান থেকে এসেছি জোহাককে বন্দী করার অভিপ্রায়ে।
তাকে বধ-করার জন্য জিঘাংসার প্রবৃত্তি নিয়ে
তার সিংহাসনের দিকে মুখ করেছি।
এক কান্তিময় ধেনু আমার ধাত্রী ছিল,
যার তনু ছিল চিত্রের মতো সুন্দর ও সুষমামণ্ডিত,—

সেই অবলা চতুষ্পাদের শোণিত-পাতে
কেন উদ্যত হয়েছিল এই অপবিত্র রাজার হাত?
তাই নিষ্কলঙ্ক আমার সংগ্রাম-পিপাসা! এবং তারই
চরিতার্থতার জন্য—
ইরান থেকে আগমন করেছি আমি।
গাভীর মুখাঙ্কিত এই-ভীম প্রহরণ দিয়ে চূর্ণ করবো তার মস্তক,
এতটুকু দয়া কিংবা ক্ষমা তাকে দেখাবো না।
এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই আব্‌নওয়াজ
সেই পুণ্যবানের দিকে মুখ করে উন্মুক্ত করলো রহস্য;
বললো, সত্য করে বলুন, আপনিই কি সেই বাদশা ফারেদূন—
যে ছিন্নভিন্ন করবে ইন্দ্রজাল ও ধ্বংস করবে এই যাদুপুরী?
আপনারই হাতে রয়েছে জোহাকের প্রাণ,
আপনারই বীরত্বে ধরণী আবার উৎফুল্লা হবে।
আমরা দুই বোন কেয়ানী বংশেরই দুই নারী।
প্রাণ-ভয়ে বশীভূত হয়ে এই দৈত্যপুরীতে অবস্থান করছি।
আমাদের নিদ্রা ও জাগরণ সংঘটিত হয় দুই সাপের সঙ্গে,—
আমাদের জীবনের তিক্ততা আপনিই অনুমান করুন ওগো নরপতি!
এই কথা শুনে ফারেদূন বললেন,
যদি আকাশ দান করে আমাকে ভাগ্যের সমুন্নতি
তবে, অবশ্যই ধরণীকে আমি মুক্ত করবো এই আজদাহার
কবল থেকে,
এবং তার পঙ্কিলতা ধুয়ে-মুছে সাফ করবো।
এখন তোমরা সত্য করে বল,
কোথায় আছে সেই আজদাহা (জোহাক)?
তারা জবাবে বললো, এই যাদুপুরীর সংরক্ষণের উপায় করতে
সে হিন্দুস্তানের দিকে গেছে।

দুর্ভাগ্যের হাত থেকে বাঁচবার জন্য সর্বদা সে সন্ত্রস্ত,
এবং তার জন্য সংহার করে চলেছে সে হাজারো নিরপরাধ-প্রাণ।
একবার এক গণক তাকে বলেছিল,
এই দেশ শত্রুর দ্বারা বিজিত হবে।
ফারেদুন অধিকার করবেন তোমার সিংহাসন,
এবং তোমার ভাগ্য-প্রসূন হবে শুষ্ক ও পরিম্লান।
সেই থেকে তার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়েছে অগ্নি,
তার সমস্ত জীবন হয়ে উঠেছে বিস্বাদ।
সেই থেকে সে পশু এবং নর-নারীর শোণিতপাত করে চলেছে,
এবং তা দিয়ে নির্বাপিত করতে চেয়েছে সেই আগুন।
কিন্তু যতই সে তার আপাদ-মস্তক ধৌত করুক শোণিতে,
গণকদের কথিত ভবিষ্যদ্বাণী তেমনি উদ্যত হয়ে আছে তার
মাথার উপরে।

সেই দুঃখে তার স্কন্ধোপরি সর্পদ্বয়
দীর্ঘকায় হয়ে এক অদ্ভুত দৃশ্যের অবতারণা করে।
দুই কৃষ্ণকায় সর্পের ফুঁসফুসানি বহন করে
সে ঘুরে বেড়াচ্ছে আজ দেশ থেকে দেশান্তরে।
মনে হয় এতদিনে তার দেশে ফিরে আসবার সময় হয়েছে,
কারণ, দীর্ঘ দিন ধরে সে অনুপস্থিত।
এই গুপ্ত সংবাদ উদঘাটিত করে
তারা উন্নতশির নায়কের সামনে নীরবে অবস্থান করলো।

জোহাকের চরের সঙ্গে ফারেদুনের বৃত্তান্ত

জোহাকের রাজ্যে এক ধনবান ব্যক্তি
রাজার বশংবদ রূপে বাস করতো।
সে তার অনুগ্রহে লাভ করেছিল
ধনসম্পদ ও মর্যাদা।
লোকে তাকে কুন্দরো বলে ডাকতো,
ধীর-গম্ভীর চলনে সে অত্যাচারী জোহাকের দরবারে আগমন করতো।
সংবাদ শুনে কুন্দরো দৌড়ে এলো রাজপুরীর দিকে,
এবং প্রাসাদে রাজমুকুট শিরে এক নতুন লোককে দেখতে পেলো।
দেখলো সেই লোক আনন্দের সঙ্গে সিংহাসনে উপবিষ্ট রয়েছে—
উন্নত দেবদারুর মাথায় যেন শোভা পাচ্ছে পূর্ণচন্দ্র।
তার একপাশে রয়েছে সুতনু শাহ্‌রনাজ,
অন্য পাশে আলো করে আছে চন্দ্রমুখী আরন্‌ওয়াজ।
সমস্ত নগরী তার সৈন্যদলে পরিপূর্ণ হয়েছে
এবং রক্ষীদল সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে দ্বারদেশে।
কুন্দরো কাউকে জিজ্ঞাসা করলো না ব্যাপার কি, কিংবা
ব্যথিতও হোল না,
নতুন বাদশার বন্দনা উচ্চারণ করে সে শুধু আভূমি প্রণত হোল।
তারপর তাঁকে স্বাগত জানিয়ে বললো, বাদশা আপনি
চিরজীবী হোন।
আপনার সিংহাসনারোহণ মঙ্গলময় হোক,
তখ্‌তের সমারোহ —বাদশাহীর মর্যাদা আপনাকেই শোভা পায়।
ধরণীর সপ্তরাজ্য আপনারই দাসানুদাস,

আপনার শির বর্ষণমুখী বাদলের ঊর্ধ্বে।
ফারেদুন কুন্দরোকে তার সমীপবর্তী হতে আদেশ করলেন,
এবং নিজের পরিচয় ব্যক্ত করলেন।
তারপর তাকে বললেন যাও,
এক শাহী মজলিসের আয়োজন কর।
নিয়ে এসো সুগন্ধি সুরা, ও গায়কদের ডেকে আন,
সুরাপাত্র সাজিয়ে রেখে আয়োজন করো সুখাদ্যের।
এমন সব গায়কদের এনে জমায়েত করবে যারা
নন্দিত করতে পারবে আমার মন
এবং আসর করতে পারবে আমোদিত।
সেই সব গুণীদেরকেও এনে সমবেত করো আমার সিংহাসনের পদতলে,
যাঁরা আমার সৌভাগ্যের জন্য শোভন হবেন সর্বতো'ভাবে।
আদেশ শুনে কুন্দরো অবিলম্বে
সব কিছুর জোগাড়ে মনোনিবেশ করলো।
উজ্জ্বল সুরা আহরিত হোল, ডেকে আনা হোল গায়কদেরকে,
সুখাদ্য সংগৃহীত হোল এবং জড়ো করা হলো
সম্মানিত দলপতিগণকে।
ফারেদুন সুরা পান করে অন্তর নান্দিত করলেন সুমধুর সঙ্গীতে—
রাত্রি এক সুরম্য উৎসবের আনন্দে উজ্জ্বলিত হোল।
প্রভাত হলে কুন্দরো
নতুন বাদশার সমীপ থেকে নির্গত হয়ে
ঘোড়ায় চেপে অনতিবিলম্বে
মুখ করলো জোহাকের দিকে।
এবং তার সমীপে উপস্থিত হয়ে
যা কিছু দেখে এসেছে সব একে একে নিবেদন করলো।
বললো, হে আত্মম্ভরী বাদশা,

আপনার দুর্ভাগ্যের লক্ষণ প্রকটিত হচ্ছে।
তিন জন উচ্চশির ব্যক্তি এক বিরাট সৈন্যদল নিয়ে
কোন এক দেশে থেকে আগমন করেছে।
তিন জনের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ জনের শির
দেবদারুর মতো উঁচু এবং তার চেহারায়
প্রকটিত রয়েছে কেয়ানী বংশসুলভ মর্যাদা।

বয়সে কনিষ্ঠ হলেও
সম্মান ও ক্ষমতায় সে সর্বোচ্চ।
তার হাতে রয়েছে এক প্রহরণ—সেটি যেন এক লৌহ গিরি,
জনসমাবেশ তা সূর্যের মতো জ্বল জ্বল করছে।
ঘোড়ায় চড়ে সেই তরুণ প্রবেশ করেছে শাহী মহলের মধ্যে,
অপর দুই ব্যক্তি তেমনি করে তাকে পথ দেখিয়ে এসেছে।
প্রাসাদে প্রবেশ করেই সে হস্তগত করেছে রাজ-সিংহাসন,
ও আপনার সমস্ত ইন্দ্রজালকে পরাভূত করেছে।
আপনার প্রাসাদে যত লোক ছিল
মানুষ কিংবা দৈত্য—
সবাইকে সে তার অশ্বের মুখে বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছে,
এবং তাদের মগজ তাদের শোণিতের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে।
কুন্দুরোর কথা শুনে জোহাক বললো, সে হয়ত আমার কোন
সম্মানিত মেহ্‌মান,

তাকে সাগ্রহে স্বাগতম জানানো তোমাদের উচিত ছিল।
রাজার কথা শুনে কুন্দরো বললো, সে লোক যদি মেহমানই হোত,
তবে তার হাতে গোমুখ চিহ্নিত প্রহরণ থাকবে কেন?
যদি সত্যই সে মেহমান হোত তবে যত শীঘ্র সম্ভব
সে সম্বরণ করতো তার অস্ত্র।

কিন্তু এসব কিছুই না করে সে দম্ভভরে
আপনারই সিংহাসনে গিয়ে বসেছে,
এবং তুলে নিয়েছে আপনার তাজ তার নিজের শিরে এবং কোমরে
বেঁধেছে আপনারই কোমরবন্ধ।

এমন জনকে যদি আপনি মেহমান বলতে চান
তবে বলুন।
জোহাক বললো, হয়তো এতো সুখের সামগ্রী হাতের কাছে পেয়ে
মেহমানের মাথা বিগড়ে গেছে।
কুন্দরো তখন জোহাককে বিদ্রূপ করে বললো,
হঁা, শুনলাম ; এখন আরো শুনুন।
সেই যশঃকামী যদি আপনার মেহমানই হোত,
তবে অপনার শয়ন-কক্ষে তার কি প্রয়োজন ছিল?
কেন সে জামশেদের ভগ্নিদ্বয়কে নিয়ে
এমন ঢলাঢলি করে বসলো আপনারই আসনে?
আমি স্বচক্ষে দেখলাম, এক হাতে সে চিবুক স্পর্শ করে আছে
শাহ্‌র নাজের,
অন্য হাত আবেশে বুলিয়ে দিয়েছে আরনওয়াজের রঙীন ঠোঁটে।
আর অন্ধকার রাত্রিব মতো লজ্জানত হয়ে
কন্যাদ্বয় নিজেদের কস্তুরী-বাসিত চুলে রচনা করেছে তার সিথান।
রাজা! আপনার সেই-চন্দ্রমুখ প্রিয়া-যুগলের সেই-সুবাসিত অলক!
আহা! আপনারই চিরদিনের আকাঙ্ক্ষিত সেই যুগল প্রতিমা!
এই কথা শোনামাত্র জোহাক ক্রুদ্ধ নেকড়ের মতো লাফিয়ে উঠলো
এবং এমন অবস্থায় নিজের মৃত্যুকেই সে জ্ঞান করলো শ্রেয় বলে।
অশ্লীল কটু বাক্য ও নিদারুণ চীৎকারে ফেটে পড়ে
দুঃস্বপ্নের ভারী বোঝা যেন সে নামিয়ে দিতে চাইলো।
কুন্দরোকে ধমক দিয়ে জোহাক বললো, তুই আর কোনদিন

আমার ঘরের খবর নিতে যাস্‌নে।
কুন্দরো প্রত্যুত্তরে বললো, বাদশা,
আমার সম্পর্কে এই বুঝি আপনার ধারণা হয়েছে?
যে ভাবে আপনি আজ আমাকে তিরস্কার করলেন
তাতে মনে হয়, অতঃপর আপনার ভাগ্যে সুদিন
আর কখনো ফিরে আসবে না
আপনি বিস্মৃত হচ্ছেন আপনার শাহী মর্যাদা,
তাই আমার গোয়েন্দা গিরি আপনার তিরস্কারের লক্ষ্য হয়েছে।
আপনার শত্রু আপনারই সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে
হাতে তুলে নিয়েছে গোমুখ চিহ্নিত ভীম প্রহরণ।
আপনার সকল শক্তি ও ইন্দ্রজালকে বিপর্যস্ত করে
সে সুখে আপনার স্থানে সমাসীন হয়েছে।
রাজা, কেন আপনার বুদ্ধি আজ ঘটনার অনুধাবনে পরাজিত হচ্ছে?
এমন ব্যাপার কি আর ঘটবে বলে আপনি মনে করেন?

ফারেদুন কর্তৃক জোহাকের বন্দী হওয়া

এই কথোপকথনের পর বাদশা জোহাক
উদ্বেলিত অন্তরে রাজধানীর দিকে মুখ করলো।
রাজপথ ছেড়ে সংকীর্ণ পথে
এগিয়ে যাওয়ার আদেশ দিলো সে সৈন্যদেরকে।
দৈত্য ও যুদ্ধবাজ সৈনিকদের এক বিরাট দল এমনিভাবে
ক্রুদ্ধ গর্জনে এগিয়ে চললো সামনের দিকে।
অবশেষে চোরাগলি পথে তারা প্রাসাদের দ্বারদেশে এসে
উপস্থিত হয়ে
ঈর্ষা-দীর্ণ অন্তর নিয়ে মাথা গলিয়ে দিলো শহরের ভিতরে।
ফারেদুনের সৈন্যরা যখন এই সংবাদ পেলো
তখন তারাও সকলে সেই পথহীন পথের দিকে মুখ করলো।
দুরন্ত জঙ্গী ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে
অবিলম্বে তারা সেই সংকীর্ণ পথ ছেয়ে ফেললো।
যে কেউ শুনলো যুদ্ধের খবর
সে-ই তার গৃহের অলিন্দে ও জানালা পথে এসে ভিড় করলো।
নগরীর সবাই কামনা করলো ফারেদুনের বিজয়,
কারণ, সবাই জোহাকের অত্যাচারে জর্জরিত ছিল।
তারা তাদের গৃহ-প্রাচীর ও অলিন্দ থেকে
জোহাকের সৈন্যদের প্রতি প্রস্তর, লোষ্ট্র, তীর ও বর্শা নিক্ষেপ
করতে লাগলো।
এই অস্ত্রনিক্ষেপে মনে হোল, কালো মেঘ থেকে যেন
শিলা-বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছে,

এবং তার ফলে মাটিতে কেউ আর এতটুকু নিরাপদ জায়গা
খুঁজে পাচ্ছে না।

শহরের সকল যুবক
অভিজ্ঞ প্রবীণ সৈনিকের মতো
ফারেদুনের সৈন্য দলে এসে যোগ দিলো,
তারা আজ জোহাকের ইন্দ্রজাল থেকে মুক্ত।
সৈন্যদের চীৎকারে পাহাড় প্রকম্পিত হোল,
অশ্বের পদাঘাতে ধরণী অসহায় বোধ করলো।
সিপাহীদের পদধূলিতে মেঘ করে এলো আকাশে,
এবং তাদের বর্শাঘাতে পাষাণের হৃদয় বিদীর্ণ হতে লাগলো।
অগ্নিপূজকদের মন্দির থেকে কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হোল,—
রাজা অক্ষম—সে তার সিংহাসনে জরাগ্রস্ত;
তোমরা তরুণ বৃদ্ধ সকলে বল,—
আমরা তার আদেশ আর মান্য করব না।
আমরা যাব না আর জোহাকের দরবারে,
আমরা সেই অজগর-স্কন্ধ রাজার দিক থেকে মুখ ফিরালাম।
এই কথা শুনে সৈন্য ও নগরবাসী সকলে মত্ত হস্তীর মতো এসে
প্রবেশ করলো যুদ্ধ-ক্ষেত্রে।
রৌদ্রকরোজ্জ্বল নগরীর আকাশ যেন মেঘে ছেয়ে ফেললো,
সূর্য ম্লান হোল।
এই দৃশ্য অসহ্য হোল জোহাকের চোখে,
সে সৈন্যদল ছেড়ে একাকীই প্রাসাদের দিকে মুখ করলো।
লৌহ-বর্মে আপাদ-মস্তক আবৃত করলো সে,
যাতে কেউ তাকে চিনতে না পারে।
এই-ভাবে সে প্রাসাদের নিকটে এসে পৌঁছলো—
রজ্জু-বদ্ধ-সোপানের সাহায্যে সে প্রাচীর লঙ্ঘন করবে।

নীচে থেকেই পুরীমধ্যে সে শাহ্‌রনাজকে দেখতে পেলো,
ফারেদুনের প্রেমের মন্ত্রে বন্দিনী হয়ে সে কালযাপন করছে।
তার মুখ যেন সূর্য, তার অলকদাম রাত্রি—
ঘৃণায় জোহাকের অধরোষ্ঠ বিস্ফারিত হোল।
সে বুঝলো, বিশ্ব-প্রভুরই এই ষড়যন্ত্র,
পাপের শাস্তি থেকে আর রেহাই পাওয়া যাবে না।
তার মনে ঈর্ষার আগুন আরো বেশী করে জ্বললো,
সে ঘুরিয়ে মারলো সেই রজ্জু-সোপান প্রাচীরের উপরে—
তার মনে সিংহাসনের আশা কিংবা প্রাণের মায়া কিছুই রইল না।
রজ্জু-সোপানের সাহায্যেই আবার প্রাচীর থেকে নীচে নেমে এসে
উন্মুক্ত করে নিলো জোহাক তার খঞ্জর;
সে কে কিছুই বললো না, উচ্চারণ করলো না নিজের নাম,
শুধু সেই উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ খঞ্জরের হাতলে হাত রেখে
সুন্দরীদের শোণিত পিপাসায় সামনের দিকে এগিয়ে চললো।
জোহাক যখন প্রাচীর বেয়ে নীচে নামছিল
ফারেদূন তখনই অবহিত হয়েছিলেন তার আগমনের কথা;
তাই বিদ্যুৎ-গতিতে তিনি গো-মুখ চিহ্নিত প্রহরণ নিয়ে
এগিয়ে গেলেন,
এবং তা দিয়ে আঘাত করলেন জোহাকের মস্তকে।
এমন সময় সহসা আকাশ-বাণী হোল,—সংযত হও,
দ্বিতীয় আঘাত এখনই তাকে করোনা—এখনও তার
মৃত্যুর সময় হয়নি।
এখন তাকে খুব শক্ত করে বেঁধে
দুই পাহাড় যেখানে খুব সংকীর্ণ হয়ে সামনা-সামনি এসেছে
সেখানে নিয়ে যাও।
সেই পাহাড়েই তাকে বেঁধে রাখো,

সেখানে কেউ নেই তার আপনজন।
ফারেদুন এই বাণী শুনে ব্যাঘ্রচর্ম-নির্মিত
রজ্জু দিয়ে জোহাককে বেঁধে ফেললেন।
এমন বজ্র-ফাঁসে তিনি তাকে আবদ্ধ করলেন যে,
মত্ত হাতীও সেই বন্ধন খুলতে অপরাগ হবে।

অতঃপর মণি-মুক্তা-নির্মিত জোহাকেরই সিংহাসনে বসে
ফারেদুন উচ্ছেদ করলেন জোহাকের আমলের সকল আইন।
সকলকে ডেকে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন,—
শোন তোমরা জ্ঞানীগুণী ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ,
যুদ্ধের আর প্রয়োজন নেই, অস্ত্র সংবরণ কর;
তোমাদের স্ফীত-নাসা অশ্ব যেন আর কারো সুনাম ও যশঃ
পদদলিত না করে।
বৃত্তিধারী ও সিপাহী উভয়ে উভয়ের কাজ করুক,
প্রত্যেকে নিজের দক্ষতা প্রমাণ করুক নিজের ক্ষেত্রে।
বৃত্তিধারী ও প্রহরণ-ধারী
নিজ নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী সৃষ্টি-করুক নব নব বিস্ময়।
একজনের কাজে অন্যজনের মাথা গলানোর ফলেই
দুনিয়া দুঃখে পরিপূর্ণ হয়েছিল।
এতদিন অপবিত্র ইন্দ্রজালের বন্ধনে দুনিয়া বন্দী ছিল,
আজ সেই প্রভাব থেকে সে মুক্ত হোল।
তোমরা প্রতীক্ষা করেছ দীর্ঘদিন; আজ তোমরা সুখী হও,
এবং আনন্দিত চিত্তে গমন কর স্ব স্ব কাজে।
সকলই জ্ঞানী ও শক্তিশালী বাদশার
এই বাণী শুনলো।
নগরীর সকল বিত্তবান ও সম্মানিত

নিজেদের অন্তর থেকে ঝেড়ে ফেললো অতীতের কলুষ।
তারা আজ সুখী আনন্দিত,
তাদের হৃদয় আজ রাজার বাণীতে পরিপূর্ণ।
বুদ্ধিমান ফারেদূন সজ্জিত করলেন তাদের অন্তর,
জ্ঞানের স্বাদ দান করলেন তাদেরকে।
এমন উপদেশ তাদেরকে দিলেন যে,
আবার সকলের মনে পড়লো বিশ্ব-প্রভুর কথা।
তিনি বললেন, আমার এই মর্যাদার আসন
তোমাদের সকলের সৌভাগ্যে আজ নক্ষত্রের মতো উজ্জ্বল,
এরই জন্য বিশ্ব-প্রভু আমাকে নির্বাচিত করেছেন—
তিনি আমাকে নিয়ে এসেছেন সুদূর আলবুর্জ-পাহাড় থেকে।
যার ফলে দুনিয়া মুক্ত হয়েছে আজদাহার (জোহাকের)
অত্যাচার থেকে—
এবং আমার শক্তি তোমাদের শৃঙ্খল দূর করেছে।
তাঁর এই দয়ার উপযুক্ত কাজ তোমাদের করা উচিত,
এই শৃঙ্খল মুক্তির জন্য নিবেদন করা উচিত সৎকর্মের ডালি।
আমি দুনিয়ার একচ্ছত্র নরপতি,
কিন্তু তাই বলে অহঙ্কারে প্রমত্ত হওয়া আমার জন্য শোভন নয়।
যদিও আমি এই সিংহাসনে বসে
প্রত্যহ তোমাদেরকে নিয়ে মগ্ন হতে পারি সুরা পানে,
কিন্তু তা আমি করব না।
এই ভাষণ শুনে সম্মানিত দলপতিগণ মৃত্তিকা চুম্বন করলো,
দুন্দুভি-নিনাদে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করলো দশদিক।
সেদিন গোটা নগরীর আয়ত্ত দৃষ্টি ফিরলো
রাজ-প্রাসাদের দিকে,
তাদের উল্লাস-ধ্বনিতে দিগন্ত সঙ্কুচিত হয়ে এলো।

আজ আজদাহাকে (জোহাককে) বাইরে আনা হবে—
রজ্জুতে বাঁধা অপমানিত নির্জীব!
একের পর এক সৈন্যশ্রেণী বিনির্গত হোল নগরীর দ্বার-পথে;
নগরীর সবাই বেরিয়ে এলো—একটি লোকও ঘরে রইল না।
সবাই দেখলো জোহাককে অত্যন্ত অপমানিত ভাবে বেঁধে নিয়ে
আসা হচ্ছে
উটের পায়ের সঙ্গে রজ্জুতে আবদ্ধ করে।
এইভাবে তাকে নিয়ে যাওয়া হোল শীরখান[১] পর্যন্ত,
সেদিনই মানুষ প্রথম জানতে পারলো এই প্রান্তরের নাম।
অনেক কঙ্করময় বালুপথ পার করে
ফারেদুন জোহাককে শীরখানের নিকটবর্তী এক পাহাড়ে নিয়ে এলেন।
অতঃপর তাকে নিয়ে প্রবেশ করলেন এক পর্বত-গুহায়,
এবং উল্টোমুখ করে তাকে সেখানে বাঁধবার আয়োজন কবলেন।
এই সময় আবার সহসা আকাশ-বাণী হোল,
সেই বাণী তাঁর কানে কানে বললো,—
এখানে নয়, দামাওন্দ পাহাড়ে নিয়ে যাও,
এবং সেখানেই এই দলচ্যুত আরব সন্তানকে বেঁধে রাখ।
লক্ষ্য রেখো, কেউ যেন তার মুক্তির জন্য তোমাকে অনুরোধ না করে;
তাকে শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে কেউ যেন তোমার কাছে
তার জন্য ক্ষমা প্রার্থী না হয়।
সেই বাণীর নির্দেশ অনুযায়ী জোহাককে ঘোড়ার পায়ের সঙ্গে বেঁধে
দামাওন্দ পাহাড়ে নিয়ে গিয়ে বন্দী করা হোল।
তারপর পাহাড়ের গুহামুখ বন্ধ করে
তাকে মানুষের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হোল।
এইভাবে ধরাপৃষ্ঠ থেকে চিরতরে মুছে গেল জোহাকের নাম,

১ প্রাচীন ইরানের একটি প্রান্তরের নাম।

পৃথিবী পবিত্র হোল তার মালিন্য থেকে।
দুনিয়ার সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে সে
একাকী বন্দী হয়ে রইলো পাহাড়ের গুহায়।
পাহাড়ের সংকীর্ণ গুহাই যেন সে পছন্দ করে নিলো,
সেই অন্ধকারেই যেন তার দৃষ্টি খুঁজে পেলো তার
উপযুক্ত দর্শনীয় বস্তুসকল।

ভারী লৌহ-কীলকে আবদ্ধ হয়ে
ঝুলে রইলো সে—মাথা নীচু করে।
বাঁধা হাত দুটো প্রসারিত রইলো যতটা সম্ভব,
যেন শাস্তিকে সে দীর্ঘায়িত করতে চায় বহুদিন ধরে।
এইভাবে উল্টোমুখী হয়ে সে ঝুলে রইলো
আর তার হৃদয় শোণিত বিন্দু-বিন্দু ঝরে পড়তে লাগলো মাটির উপর।

এসো আমরা দুনিয়ায় মন্দের পরিণতি প্রত্যক্ষ করি,
এসো, সযত্নে আমরা শক্তি নিয়োজিত করি সৎকার্যের দিকে।
যদিও ভালো ও মন্দ কিছুই চিরকালের নয়,
তবুও ভালোই সঞ্চিত থাকে স্মৃতির মণিকোঠায়।
স্বর্ণমুদ্রা, সম্পদ ও উন্নত প্রাসাদ
তোমার জন্য লাভবান বস্তু বলে প্রমাণিত হবে না।
কথা বেঁচে থাকবে তোমার স্মৃতি রূপে,
কথাকে তুমি অল্পমূল্য জ্ঞান করো না।
মহামতি ফারেদুন ফেরেশতা ছিলেন না,
তাঁর সুনাম কস্তুরী ও 'অম্বর' থেকে হয়নি।
ন্যায়পরতা ও বদান্যতা দিয়েই তিনি অর্জন করেছিলেন যশঃ
তুমিও তা করো, কারণ, অন্তরের অন্তঃস্থলে তুমিও ফারেদুন।
ফারেদুন যে সব কাজ করে বিশ্বপ্রভুর করুণা প্রাপ্ত হয়েছিলেন,

তন্মধ্যে দুনিয়াকে মালিন্য-মুক্ত করা ছিল প্রথম।
অন্যায়কারী অত্যাচারী জোহাককে বন্দী করে
তিনি রক্ষা করেছিলেন দুর্বলকে।
দ্বিতীয়, তিনি পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ করে
দুনিয়ার জন্য ও নিজের জন্য কল্যাণের পথ করেছিলেন নিষ্কণ্টক।
তৃতীয়, পৃথিবীকে অজ্ঞানতার কলুষ থেকে মুক্ত করে
অন্যায়ের শক্তিকে তিনি করেছিলেন শৃঙ্খলিত।
দেখ, যেখানে রাজত্ব করতো বৃদ্ধ জোহাক
সেখানেই আজ সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ফারেদুনের শাসন।
দীর্ঘ পাঁচশো বছর বাদশাহীর পর
তাঁর কালেরও অবসান হয়েছিল।
দুনিয়া অন্যের হাতে সমর্পণ করে তিনিও করেছিলেন অন্তর্ধান,
এবং পেছনে রেখে গিয়েছিলেন তাঁর জন্য দুনিয়াবাসীর শোক।
সেইমতো উঁচু-নীচু সর্বজন
ইচ্ছা করলে হতে পারে যশস্বী কিংবা অপরিজ্ঞাত

ফারেদুনের বাদশাহী পাঁচশো বছর স্থায়ী হয়েছিল

ফারেদূন সিংহাসনে বসে দেখলেন
তিনি ছাড়া রাজাধিরাজ আর কেউ নেই।
কেয়ানী প্রথানুযায়ী তখ্‌ত ও তাজ
যথাসময়ে প্রস্তুত করে রাখা হোল সজ্জিত প্রাসাদে।
সুমঙ্গল দিনে রাজ্যের যত গণ্যমান্য দলপতি
সেই কেয়ানী তাজ তুলে দিলো তাঁর মাথার উপরে।
সেই মুহূর্ত থেকে কাল শোকোন্মুক্ত হোল
এবং সবাই ধরলো ধর্মের পথ।
সবাই তাদের হৃদয় অনুরঞ্জিত করল তাঁর কালের হর্ষে,
এবং আয়োজন করলো এক নতুন উৎসবের।
জ্ঞানিগণ প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে আসর করে বসলেন,
এবং সবাই তাদের হাতে তুলে নিলো রক্তিম সুরাপাত্র।
উজ্জ্বল সুরা ও নতুন বাদশার জ্যোতির্ময় বদনমণ্ডল,—
দুনিয়া উজ্জ্বলিত হোল পূর্ণিমার চাঁদের মতো।
তাঁর আদেশে তারা অগ্নি প্রজ্বলিত করলো
এবং সুগন্ধি ধূপ ধুনা জ্বালিয়ে দশদিক আমোদিত করলো।
দলপতিগণ গ্রহণ করলো রাজার ধর্ম—
মানসিক স্বাস্থ্য ও নিষ্কলুষ ভোগকে করলো তারা জীবনের অলঙ্কার।

এখনও সেই চন্দ্রমুখ মহাজনদের স্মৃতি চোখে ভাসে
আহা, কোন দুঃখ-কষ্ট পরিম্লান করেনি তাদের অকলঙ্ক বদনমণ্ডল!
দীর্ঘ পাঁচশো বছর ধরে দুনিয়া ছিল এমনি সহাস্য-স্মরিত।

তার একটি দিনকেও স্পর্শ করেনি কোন অমঙ্গল।
কিন্তু বৎস্য, মনে রেখো, দুনিয়া চিরকাল এমনি থাকে না,
তাই, বিষয়-তৃষ্ণা ও বিরাগ দুই-ই এখানে অর্থহীন।
জেনে রাখো, দুনিয়া কারো জন্য চিরস্থায়ী নয়,
কেউ এখানে চিরসুখ প্রত্যক্ষ করেনি।

এদিকে ফারানক (ফাবেদূনেব মাতা) এখনও জানতে পারেননি
তাঁর সন্তান দুনিয়াব বাদশা হয়েছে।
তাঁর কাছে এ সংবাদও অজ্ঞাত যে জোহাকের বাজত্বের হয়েছে অবসান
এবং ভেঙ্গে খান খান হয়েছে তার শাহী তখ্‌ত।
শেষে ভাগ্যবান সন্তানের কাছ থেকেই মায়ের কাছে খবর এলো,
পুত্র শাহী তাজের অধিকারী হয়েছে।
মা রাজাধিরাজ পুত্রের কাছে আগমন করে
তার মাথা ও অঙ্গ ধৌত করে তাকে আশীর্বাদ করলেন।
তারপর মুখ টেনে নিয়ে রাখলেন নিজের বুকের উপর,
ও উচ্চারণ করলেন জোহাকের অমঙ্গল।
তারপর বিশ্বপ্রভুকে ডেকে বললেন,
হে খোদা, কালের আবর্তনকে আমার পুত্রের জন্য মঙ্গলময় কর।
যে-সব লোক দুর্দিনে তার সহায় হয়েছিল,
এবং তাকে দিয়েছিল অন্তর নিংড়ানো ভালবাসা—
যারা গুপ্তকে প্রকাশ করেনি ও ব্যক্ত করেনি
কারো কাছে উদ্দেশ্যের গোপনতা—
যারা ফারেদূনের সকল রহস্যই সযত্নে রক্ষা করেছিল নিজেদের মধ্যে—
মা এক সপ্তাহ ধরে তাদের সকলকে দান করলেন বহু সামগ্রী,
ফলে তাদের মধ্যে কেউ আর দরিদ্র রইল না।
দ্বিতীয় সপ্তাহে তিনি আয়োজন করলেন এক আসরের,

সেখানে এসে জমায়েত হোল উন্নত-শির দলপতিগণ।
এইবার সমস্ত মণিমুক্তা জওয়াহেরাত
এতদিন যা গোপন ছিল, বের করে আনা হোল,
রাজকোষের দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হোল।
দান করা হোল বহু সম্পদ।
মার সামনে অবারিত করা হোল অন্তহীন সম্পদে
পরিপূর্ণ রাজকোষ,
কিন্তু পুত্রের সামনে সব কিছুই তাঁর কাছে তুচ্ছ বোধ হোল।
তিনি সেই সব ভূষণ, মণিমুক্তা ও জওয়াহেরাত,
যুদ্ধাশ্ব, সুসজ্জিত আরবী ঘোড়া—
সকল শিরস্ত্রাণ বর্ম ও বর্শা
মুকুট ও কোমরবন্ধ সব সম্পদ
উটের পিঠে বোঝাই করে
পবিত্র-চিত্ত সম্রাটের সমীপে পাঠিয়ে দিলেন।
সম্পদরাজি প্রেরণ করে
মা উচ্চারণ করলেন বিশ্বপ্রভুর প্রশংসা।
বাদশা প্রেরিত-সম্পদরাশি দেখতে পেয়ে
মাকে সংবর্ধনা জানাবার জন্য এগিয়ে গেলেন।
উপস্থিত দলপতিগণ সম্রাট-জননীকে চিনতে পেরে
তাঁর প্রশংসা উচ্চারণ করলেন ও কীর্তন করলেন বাদশার গুণাবলী।
তাঁরা বললেন, এই শুভদিন অনন্ত হোক আপনার জন্য,
আপনার অমঙ্গলকামীরা নিপাত যাক।
আপনার বিজয় আকাশ কর্তৃক সমর্থিত হোক,
এবং কল্যাণ ও বদান্যতায় শোভিত হোক আপনার ব্যক্তিত্ব!
দেখতে দেখতে দেশদেশান্তর থেকে এসে জমায়েত হলেন
বহু অভিজ্ঞ দূরদর্শী মহাত্মা।

বাদশার সিংহাসনের চারদিকে স্তূপীকৃত হতে লাগলো
অসংখ্য মণি ও মুক্তা।
সামন্ত ও দলপতিগণ রাজ্যের দূরদূরান্তর থেকে এসে
সমারোহের সঙ্গে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালেন তাঁর দরবারে।
তাঁরা সবাই বাদশার জন্য বিশ্বপ্রভুর আশীর্বাদ কামনা করলেন।
ও তাঁর দয়া ভিক্ষা করলেন তাজ, তখ্‌ত ও রাজ-অঙ্গুরীয়ের উপরে।
সবাই আকাশের দিকে হাত তুলে
রাজার সৌভাগ্য কামনা করলেন।
তাঁরা রাজত্বের স্থায়িত্ব কামনা করলেন
এবং কামনা করলেন রাজার চিরযৌবন।
অতঃপর ফারেদূন দৃষ্টি প্রসারিত করলেন দুনিয়ার দিকে দিকে,
পৃথিবীর প্রকট ও গোপন সকল অবস্থা তিনি জ্ঞাত হলেন।
রাজার পক্ষে শোভন হয় এমন ক্ষিপ্রতার সঙ্গে
তিনি অন্যায় ও অত্যাচারের হাতকে পরাভূত করলেন।
দুনিয়াকে তিনি সজ্জিত করলেন নন্দন-কাননের মতো, .
শুষ্ক ঘাসের জায়গায় মাথা তুললো দেবদারু ও গোলাপের বন।
বাদশা একদিন আমল[১] থেকে যাত্রা করে তামেশায়[২]
এসে উপস্থিত হলেন,
এবং ছাউনী ফেললেন সেই বিখ্যাত হিংস্র-জন্তু পরিপূর্ণ বনভূমিতে।
তারপর সেখান থেকে সর্বত্র ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত করলেন
তাঁর দুন্দুভির আওয়াজ,
যা শুনে অভয় পেলো সকল লোক।

১, ২ মাজিন্দিরানের অন্তর্গত দু'টো জায়গার নাম। এই দুয়ের মধ্যবর্তী স্থানে হিংস্র-জন্তু পরিপূর্ণ এক বিরাট বনভূমি ছিল।

ফারেদূন কর্তৃক জন্দলকে য়মন দেশে প্রেরণ

ফারেদুনের রাজত্বের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হলে
তাঁর তিন পুত্রের জন্ম হোল।
বাদশার সৌভাগ্যশালী তিন পুত্রই
মায়ের দিক থেকেও হোল অভিজাত।
দেখতে দেখতে তারা উন্নত দেবদারুর মতো বড় হয়ে উঠলো,
তাদের মুখে দেখা দিলো যৌবন-বসন্তের শোভা।
এই তিন পুত্রের দু'জন শাহ্‌রনাজের গর্ভজাত,
কনিষ্ঠ-জন সুন্দরী আর্‌নওয়াজের বুকের মানিক।
পিতা এতদিন পুত্রদের প্রতি নজর দেওয়ার সময় পাননি,
আজ তিনি তাদেরকে সুসজ্জিত হাতির উপর চড়িয়ে দেখলেন।
পরম স্নেহে তিনি দৃষ্টিপাত করলেন তাদের দিকে,
দেখলেন, তারা প্রত্যেকেই তাজ ও তখ্‌তের যোগ্য।
ফারেদুন তখন তাঁর যশস্বী বশংবদগণের মধ্যে থেকে
একজনকে তাঁর কাছে ডাকলেন।
তার নাম ছিল জন্দল—সে বহুদর্শী—
সকল কাজেই সে বাদশার মনোরঞ্জন করতে পেরেছে।
তিনি তাকে বললেন, দুনিয়ার সর্বত্র খোঁজ করে
তুমি তিনটি সদ্বংশজাত কন্যা মনোনীত করবে।
তারা যেন আমার তিন পুত্রের জন্য সঙ্গত হয় সর্বরূপে
এবং সব দিক থেকেই হয় আমার আত্মীয়তার যোগ্য।
দ্বিতীয় শর্ত, সেই তিন কন্যা একই পিতামাতার সন্তান হবে,
হবে তারা পরমা সুন্দরী, সৌভাগ্যবতী ও পবিত্রা।

তারা তিনজনই দেখতে একমতো হবে—সমান হবে,
কেউ যেন কারো চেয়ে এতটুকু কম না হয়।
বাদশার কথা শুনে জন্দল
মনস্থির করে নিলো।
তার হৃদয় ছিল জাগ্রত, বুদ্ধিদীপ্ত,
সে ছিল বাক্‌পটু ও কর্মে তৎপর।
অধিক বিলম্ব না করে বাদশার দরবার থেকে
বেরিয়ে এলো সেই সুহৃদয়;
এবং ইরান ছেড়ে যাত্রা করলো বহির্বিশ্বের দিকে,—
অবিরাম চললো তার অনুসন্ধান,—অনেক সে বললো, অনেক শুনলো।
যে রাজ্যেই কোন রাজা ছিল
আর তার অন্তঃপুরে ছিল কন্যারত্ন,
জন্দল গোপনে সেখানেই খবর নিলো,
কন্যাদের নাম জানলো, শুনলো তাদের কণ্ঠস্বর।
কিন্তু গ্রামীণদের মধ্যে এমন অভিজাত সে কাউকে পেলো না,
যার সঙ্গে ফারেদুনের আত্মীয়তা হতে পারে।
শেষ পর্যন্ত সেই বুদ্ধিমান রাজদূত
য়মন দেশের রাজা সর্‌ওয়ের দরবারে এসে উপস্থিত হোল।
লক্ষণ মিলিয়ে দেখলো—আত্মীয়তার উপযুক্ত জায়গা বটে,
ফারেদুন যেমন চান তেমনই তিন রাজকন্যা আছে এই অন্তঃপুরে।
প্রফুল্লচিত্তে মৃদুমন্দ গমনে জন্দল রাজার
সামনে এসে উপস্থিত হোল—
বুলবুল যেমন আনন্দের সঙ্গে গোলাপের সমীপবর্তী হয় তেমনিভাবে।
সে প্রথামতো মৃত্তিকা চুম্বন করে রাজার আনুগত্য প্রকাশ করলো
এবং উচ্চারণ করলো রাজার গুণাবলী।
বললো, রাজার উন্নতশির লাভ করুক চিরদিনের মর্যাদা,

চিরকাল তাঁর জন্য উজ্জ্বলিত থাকুক মুকুট ও সিংহাসন।
জবাবে য়মনের রাজা বললেন,
আপনার রসনা প্রশংসা-শূন্য না হোক।
কি সন্দেশ নিয়ে আপনার আগমন বলুন,
হে মহাত্মন, অকপটে প্রকাশ করুন আপনাব অভিপ্রায়।
জন্দল বললো, আপনি চিরসুখী হোন,
অমঙ্গল চিরদিন আপনার থেকে দূরে থাকুক।
ইরান থেকে আমি পূজারীর মতো
য়মন-রাজের কাছে শুভ-সন্দেশ নিয়ে আগমন করেছি।
মহান ফারেদুনের সম্ভাষণ নিয়ে এসেছি আপনার জন্য,
আপনার প্রশ্নেরও সঙ্গত প্রত্যুত্তরের জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছি।
বীরশ্রেষ্ঠ ফারেদূন আপনাকে জানিয়েছেন তাঁর সম্ভাষণ,
তাঁর মাহাত্ম্য সর্বলোকে বিদিত।
আমাকে তিনি বলেছেন, শাহেয়মনের কাছে আমার
বাণী পৌঁছিয়ে দিয়ে
তাঁর প্রাসাদে কস্তুরীর মতো ছড়িয়ে দিয়ো সুগন্ধ।
তিনি বলেছেন, আমি কামনা করি শাহের চিরস্বাস্থ্য
তাঁর বেদনার নিরসন ও সম্পদের প্রাচুর্য।
ওগো আরবদের রাজা, যদিও আমার (ফারেদূনের) নক্ষত্র
অপরিম্লান, আমার সম্পদ প্রচুর;
তবুও সবার চেয়ে প্রিয় আমার সন্তান,
সন্তানের মত কোন বস্তুই মানুষের কাম্য নয়।
কোন কিছুই যেমন সন্তানের মতো আদরণীয় নয়।
তেমনি তাদের আত্মীয়ের মতো আত্মীয়ও আর কেউ নয়।
এই দুনিয়ার কারো যদি তিনটি চোখ থেকে থাকে
তবে সে আমার—আমার তিনটি পুত্র।

ওগো মহাত্মা, আপনি তাদেরকে আমার দৃষ্টির চেয়েও অধিক বলে
প্রত্যক্ষ করুন,

কারণ, দৃষ্টি তাদেরকে দেখেই প্রাপ্ত হয় করুণা।

পবিত্র-চিত্ত কবি কি সুন্দর বলেছেন,—

সুজন আত্মীয় রচনা করে মনোমুগ্ধকর কাহিনী।

এই আত্মীয়তা তখনই হয় শোভন সুন্দর

যখন আত্মীয় আত্মীয়ের কল্যাণকে স্থান দেয় নিজের স্বার্থের উপরে।

বুদ্ধিমান ও সৎব্যক্তি সর্বদা কামনা করে

সমকক্ষের বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তা।

মানুষের জন্য সৌভাগ্য তখনই অনুকূল বলে গণ্য হয়

যখন তার পুত্রের জন্য ভবিষ্যতের দিনগুলো হয় সম্ভাবনা পূর্ণ।

আমার বাদশাহী ধনেজনে পরিপূর্ণ,

সৈন্যসামন্ত, ধনদৌলত ও শক্তি সব কিছুই আমার রয়েছে।

চাঁদের মতো সুন্দর আমার তিন পুত্র,

তারা সবাই রাজ্য, তখ্‌ত ও তাজের উপযুক্ত।

কোন বাসনা ও সম্পদ তাদের অনায়ত্ত নয়,

সকল বাঞ্ছনীয় বস্তুর উপরই অধিকার তাদের অব্যাহত।

কিন্তু এই তিন শাহজাদারই অন্তরে গোপন রয়েছে

তিন যুগলের কামনা।

তাদের সেই গোপন কামনা আমি অবহিত হয়ে

প্রেরণ করছি আমার এই দূত।

জানি আপনার অন্তঃপুরে রয়েছেন

তিন পরম পবিত্রা রাজকন্যা।

কিন্তু যখন শুনতে পেলাম যে, তাঁরা প্রত্যেকেই অনূঢ়া

তখন মন আমার পূর্ণ হোল আশার আনন্দে।

আমার তিন পুত্রও অবিবাহিত,

তারা কৌশোরের সীমা অতিক্রম করেছে প্রভাতী সূর্যের মতো।
এখন প্রত্যেকটি যুগল মুক্তাকে
পরস্পরের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আপনার হাতে।
পরমা সুন্দরী তিন অন্তঃপুরবাসিনীকে আপনি দিতে পারেন
তিনটি রাজ্যের মহিষীর মর্যাদা।
জন্দল জানালো, ফারেদূন আপনার কাছে পাঠিয়েছেন এই বাণী,
এখন আপনার প্রত্যুত্তর কি, তা নিবেদন করুন।
য়মনের বাদশা ফারেদূনের এই প্রস্তাব শুনে
বর্ষণ প্রত্যাশী চামেলী ফুলের মতো পরিম্লান হলেন।
তিনি মনে মনে বললেন, যদি আমার শিয়রের কাছে
আমার এই তিন চন্দ্রকে আমি না দেখতে পাই
তবে আমার আলোকিত দিন রাত্রির মতো অন্ধকার হয়ে যাবে ;
সুতরাং, জবাবের জন্য অধরোষ্ঠ এই মুহূর্ত্তে উন্মোচিত করা উচিত নয়।
কিন্তু এই রহস্য দূতের কাছে প্রকাশ করা মাত্র
ভালো মন্দ দুই-ই আমার সঙ্গী হয়ে পড়বে।
সত্বর আমি জবাব দিব না,
আমার মঙ্গলকামীদের সঙ্গে এখন পরামর্শ করাই
আমার জন্য সঙ্গত হবে।
মনে মনে এই স্থির করে ফারেদূনের দূতের জন্য রাজা এক স্থান
নির্বাচিত করলেন,
এবং নিজে মগ্ন হোলেন উপায় চিন্তায়।
দরবারের দ্বার রুদ্ধ করে তিনি জ্ঞানীদের
নিয়ে বসলেন।
জ্ঞানীদের মধ্যে অনেকেই মরুবাসী বর্শাধারী,
এবং পরীক্ষিত স্বজন।
রাজা তাদের সামনে ব্যক্ত করলেন

তাঁর অন্তরের কথা।
বললেন, দুনিয়ার সঙ্গে আমাকে সম্পর্কিত করে রেখেছে
আমর তিন উজ্জ্বলিত প্রদীপ।
বাদশা ফারেদূন্ আমার কাছে এক প্রস্তাব পাঠিয়েছেন,
যা আমার সামনে বিস্তৃত করেছে মারাত্মক এক ফাঁদ।
আমি তোমাদের কাছে পরামর্শ চাচ্ছি,
সেই প্রদীপত্রয়কে কি আমার চোখের সামনে থেকে সবিয়ে দিব ?
দুত ফারেদূনের উক্তি এইভাবে নিবেদন করেছে—
আমার তিন শাহাজাদা আছে, তারা সবাই রাজ-মসনদের যোগ্য।
আমি সেই তিন পুত্রের জন্য
আপনার অন্তঃপুরবাসিনী তিন কন্যার পাণি প্রার্থনা করছি।
যদি এই প্রস্তাবের প্রত্যুত্তবে হঁা বলি তবে দলিত করা হয়
আমার হৃদয়কে,
মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয় আমার রাজকীয় মর্যাদাকে।
যদি তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করি,
তবে আমার নিজের অন্তরে প্রজ্জ্বলিত করা হয় আগুন ও দুচোখে
প্রবাহিত কবা হয় দবিগলিত ধারা।
পক্ষান্তরে যদি, ফারেদূনের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করি
তবে তার অত্যাচারে হতে হবে জর্জরিত।
এখন তোমরাই বল, একজন রাজার পক্ষে কি কারো ভয়ে ভীত হওয়া
শোভা পায় ?
যদিও তোমরা সবাই শুনেছো সেই কাহিনী—
কি ভাবে জোহাক পরাভূত হয়েছিল ফারেদূনের হাতে।
তবুও আজ আমার কাছে তোমাদেরকে বলতে হবে,
এক্ষেত্রে সত্যিই আমার কি করা উচিত ?
রাজার এই কথা শুনে পরীক্ষিত-বীরগণ

একে একে দান করলো প্রত্যুত্তর।
তারা বললো, আমরা সবাই একমত,—
আপনার গর্ব ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে, আমরা তা দেখতে পারব না।
ফারেদূন হতে পারে একজন বড় বাদশা,
কিন্তু তাই বলে আমরা তার দাস নই, কিংবা নই তার সামন্ত।
সুস্পষ্ট উক্তি ও দান আমাদের বৈশিষ্ট্য,
বর্শা হাতে অশ্ব-বল্গা শ্লথ করাই আমাদের ধর্ম।
খঞ্জর হাতে আমরা ধরণীকে শোণিত-সুরায় রঞ্জিত করি,
উন্নত বর্শা-ফলকে আকাশকে কণ্টকিত করি বেণুবনের মতো।
যদি আপনার কন্যাত্রয়-ই আপনার সম্পত্তি হয়,
তবে উচিত হবে রত্নদ্বার উন্মোচিত করা ও ওষ্ঠাধর বন্ধ করা।
যদি আমাদের উপদেশ গ্রহণ করেন
এবং মূল্যবান জ্ঞান করেন স্বীয় রাজকীয় মর্যাদা—
তবে জামাতত্রয়-কে দেখার প্রস্তাব উত্থাপন করুন,
তাদেরকে না দেখা পর্যন্ত বিয়ে হবে না, তা ঘোষণা করে দিন।
জ্ঞানিগণের এই উপদেশের মধ্যেই
রাজা তাঁর গর্ব ও মর্যাদার সমর্থন দেখতে পেলেন।

জন্দলকে য়মনের রাজার প্রত্যুত্তর দান

ফারেদুনের দূতকে ডেকে এনে
রাজা অনেক সুন্দর সুন্দর কথার অবতারণা করলেন।
তারপর বললেন, আমি রাজা, আপনি আরেক দেশের রাজদূত,
আপনার প্রভুর বক্তব্য আপনি আমার কাছে নিবেদন করেছেন।
আপনি বলেছেন, আপনাদেব সকল সম্পদের কথা,
ব্যক্ত করেছেন, আপনাদের তিন শাহজাদার গুণাবলী।
পুত্র পিতার কাছে সকল কিছুর চাইতেই প্রিয়,—
সে তার ঘরের সজ্জা ও সৌন্দর্য।
এসব যা কিছু আপনি বলেছেন, সব আমি স্বীকার করে নিলাম,
আমিও সন্তানের পিতা, তাই এসব আমি বুঝতেও পারি।
যদি আপনার বাদশা আমার কন্যাত্রয়ের পাণি প্রার্থনা করেন
এবং এই মরুপ্রান্তরে আগমন প্রত্যাশা করেন,
তবে এই অবস্থায় আমার চেয়ে বেশী অপমানিত কে বোধ করবে—
যদি আমি তাঁর সন্তানদেরকে স্বচক্ষে না দেখেই বিবাহে
সম্মতি দান করি?
কাজেই আপনার বাদশা যদি এই আত্মীয়তা কামনা করেন,
তবে আমার দেশে তাদেরকে না পাঠালে চলবে কেন?
আমার সন্তানত্রয়ের সঙ্গে যারা
আবদ্ধ হবে পরিণয়-সূত্রে তাদেরকে নিয়ে আসুন,
আমি স্বচক্ষে তাদের দেখবো,
দেখবো, তারা কেমন তাজ ও তখতের উপযুক্ত।
তাদেরকে মুখোমুখী দেখলে

হয়তো আমার অন্ধকার মন আলোকিত হবে।
হয়তো তাদের দর্শনে আমার নয়নদ্বয় আনন্দ পাবে,
এবং আমার ঘুমন্ত বাসনা হবে জাগ্রত।
তখন আমি আমার নয়নপুত্তলিগণকে
সমর্পণ করতে পারবো তাদের হাতে আমাদেরই
রীতি-রেওয়াজ অনুযায়ী।

আমার নয়নতৃপ্ত করে তখন তারা
অবিলম্বেই তাদেরকে নিয়ে যেতে পারবে পিতৃসমীপে।
রাজার এই প্রত্যুত্তর শুনে জন্দল তাঁর প্রশংসাকীর্তন করলো
এবং আরবদের রীতি অনুযায়ী চুম্বন করলো তাঁর সিংহাসন।
তারপর প্রচুর প্রশংসাকীর্তন করে রাজপ্রাসাদ থেকে
দুনিয়াপতি ফারেদূনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো।
ফারেদূনের সমীপে উপস্থিত হয়ে
য়মনের রাজার প্রত্যুত্তর ও যা কিছু শুনে এসেছে তা নিবেদন করলো।
বাদশা তখন তাঁর তিন পুত্রকে
প্রাসাদান্তর থেকে ডেকে পাঠালেন।
তারপর জন্দল যা বলেছে ও সেই সঙ্গে নিজের মত
পুত্রদের সামনে উপস্থিত করলেন।
বললেন, য়মনের নরপতি
উন্নত দেবদারু সদৃশ দলপতিগণের সর্দার।
তাঁর তিন কুমারী কন্যা আছে--অনবিদ্ধ মুক্তার মতো,
তাঁর কোন পুত্র নেই।
তাদেরকে বধূ রূপে পেতে হলে
তোমাদেরকে সেখানে যেতে হবে।
তাঁর এই তিন কন্যার জন্যই আমরা বিবাহের প্রস্তাব করেছি,
এবং অবতারণা করেছি বহু সৌজন্যমূলক বাণীর।

এখন তোমাদেরকে সেখানে যেতে হবে,
এবং তোমাদের জ্ঞান-বুদ্ধির পরিচয় দিতে হবে।
বাক্‌পটু ও তীক্ষ্ণধী ব্যক্তিগণ সেখানে
রাজার আদেশে তোমাদের সমীপবর্তী হবে।
তাদের প্রশ্নের জবাব তোমাদেরকে দিতে হবে—
অবলীলায় ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে।
বাদশার প্রতিপালিত যে,
তাকে হতে হয় জ্ঞানী।
কবি, জাগ্রত-চিত্ত কিংবা ভবিষ্যদ্বক্তা
যে-কেউ প্রশ্ন করুক
ঠিক ঠিক জবাব দিতে হবে ;
প্রমাণ করতে হবে, জ্ঞানই তোমাদের সম্পদ —ধনদৌলত নয়।
আমি যা বলছি তা মনোযোগ দিয়ে শোন,
যদি তা মনে রাখতে পারো, তবে অবশ্যই তোমরা সফলকাম হবে।
য়মনের এই বাদশাহ গভীর দৃষ্টি সম্পন্ন
সে কখনো একা থাকে না।
তারা পাশে সর্বদা অবস্থান করে
কবি, জ্ঞানী-গুণী ও প্রশংসাকীর্তনকারিগণ।
তার ধনদৌলত ও সৈন্যসামন্তও প্রচুর
জ্ঞানী ও দৃষ্টিমান দলপতিগণ সর্বদা তাকে ঘিরে আছে।
তারা যেন তোমাদেরকে কোন অবস্থাতেই হীন
প্রতিপন্ন না করতে পারে,
তারা যেন তাদের জ্ঞান ও ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াকর্ম দ্বারা
তোমাদেরকে অভিভূত করে না দেয়।
প্রথমে সে এক আসর সজ্জিত করবে,
এবং তোমাদেরকে নিয়ে বসাবে সেখানে।

৯—

তিন জন সুন্দরী সূর্যমুখী ললনাকে আনা হবে,
তাদের সৌন্দর্যে ও শোভায় আমোদিত হবে সভামণ্ডপ ;
তারপর সুন্দরিগণকে এনে
বসানো হবে তিনটি সুসজ্জিত আসনে।
মাথায় ও মুখের আদলে তারা তিন জনই দেখতে একমতো হবে,
কেউ কারো চেয়ে খাটো নয়।
এদের মধ্যে যে কনিষ্ঠ সেই থাকবে আগে
এবং জ্যেষ্ঠা যে সে সবার পিছনে।
কনিষ্ঠা কন্যা পিতার পাশেই বসবে,
জ্যেষ্ঠাজন রাজার কাছ থেকে একটু দূরে,
এবং মধ্যমা জন বসবে দুয়ের মাঝখানে—
জেনে রাখ ; এটি তোমরা ভুল করোনা যেন।
তোমাদেরকে তখন রাজা প্রশ্ন করবে, বল এই তিন জনের মধ্যে
কে বয়সে বড় ?
কে মধ্যমা ও কনিষ্ঠা ?
রাজপুত্রগণ, তোমরা নির্দেশ কর ক্রম।
তোমরা তখন বলবে, কনিষ্ঠ জন মর্যাদায় সর্বোত্তম,
জ্যেষ্ঠজনের সফলতা তার চাইতে কম।
মধ্যমা অবস্থান করছেন মধ্যপথে
কারণ, তার আশা-আকাঙ্ক্ষা সংযত।
এইভাবে তোমরা সরওয়ের বাগিচায় সূর্যমুখীদের সম্পর্কে
অবলীলায় বলে যাবে।
আমার এই উপদেশ তোমরা স্মরণে রেখো।
এবং এই রহস্যের চাবিকাঠি আয়ত্তে রেখো।
বুদ্ধিকে সবচাইতে মূল্যবান সামগ্রী বলে মনে করো,
এবং সর্বত্র তাকে সঙ্গী করে নিয়ো।

তিন পুত্রই বাপের এই কথা
অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুনলো।
তারপর ফারেদুনের সমীপ থেকে যখন তারা বেরিয়ে এলো
তখন হৃদয় তাদের জ্ঞান ও চেতনায় পরিপূর্ণ।
পিতা পুত্রকে পালন করেন রুটি দিয়ে
কিন্তু সবচাইতে মূল্যবান যে-সামগ্রী তিনি তাকে দান করতে পারেন
তা জ্ঞান।

তিন পুত্রই বাপের কাছ থেকে বেরিয়ে এসে
নিজ নিজ ঘরের দিকে মুখ করলো,
এবং রাত্রি সমাগত হলে প্রফুল্লচিত্তে নিদ্রার হাতে
নিজেদেরকে সঁপে দিলো।

শাহে য়মনের সমীপে ফারেদুনের পুত্রদের যাত্রা

পরদিন তিন শাহযাদা সজ্জিত হয়ে বের হোল,
সঙ্গে নিলো কতিপয় জ্ঞানীজনকে।
তখন সূর্য সবেমাত্র তার প্রতিবিম্ব আকাশের উপর ফেলেছে,
এবং নীলের উপর ছড়িয়ে দিয়েছে লালিমার আভা।
শাহাযাদাগণের সঙ্গী লোকলস্করও অনুরূপভাবে
আকাশের পটভূমিকায় সূর্যের মতো বেরিয়ে এসে
য়মনের পথ ধরলো।
সরূও তাদের আগমনের সংবাদ পেয়ে
হংস-বলাকা সদৃশ এক সৈন্যদল সজ্জিত করলেন।
রাজা সেই সৈন্যদলকে মেহমানদের অভিনন্দন জানানোর
জন্য পাঠালেন—
তারা জ্ঞানী কিংবা আত্মীয় কিংবা অনাত্মীয় তা প্রশ্ন নয়—
তারা নবাগত অতিথি।
তিন তরুণ শাহযাদা য়মনে প্রবেশ করতেই
সেখানকার নারী-পুরুষ তাদেরকে দেখবার জন্য
ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।
তারা তাদের মস্তকে মুক্তা বর্ষণ করলো—ছড়িয়ে দিলো
সুগন্ধি জাফ্রাণ,
ধরলো তাদের সামনে কস্তুরীবাসিত সুরাপাত্র।
তাদের সকল অশ্বের গ্রীবা-কেশর আর্দ্র হোল
সেই সুগন্ধি সুরায়,
অশ্ব-পদতলে নিক্ষিপ্ত হয়ে রইলো কত না সোনা রূপা!

নন্দন-কাননের মতো সুসজ্জিত এক প্রাসাদ তাদের নজরে পড়লো,
সেই প্রাসাদের ইষ্টকগুলো সোনার ও রূপার।
রোমক-দেশীয় সুচিত্রিত কিংখাবে তার মেঝে সজ্জিত,
এবং বহু মূল্যবান আসবাবে তা পরিপূর্ণ।
সহসা সেই প্রাসাদে যেন
রাত্রির অন্ধকার বিদীর্ণ করে প্রগলভ সূর্যের আগমন হোল।
ফারেদূন যেমন বলেছিলেন, তেমনি তিন কন্যাকে নিয়ে
য়মন-রাজ প্রাসাদে প্রবেশ করলেন।
এই তিন পূর্ণচন্দ্রের দিকে চোখ তুলে চাওয়ার
যোগ্যতা যেন কারো নেই।
তারা তিন জন সেই ভাবেই তাদের আসন গ্রহণ করলো
যেমন বলেছিলেন বাদশা ফারেদূন।
রাজা জিজ্ঞেস করলেন, এই তিনটি নক্ষত্রের মধ্যে
কনিষ্ঠ কোনটি তা তোমরা বলতে পারো ?
বলতে পারো এদের মধ্যে কে মধ্যমা ও কে জ্যেষ্ঠা—
যার দ্বারা আমরা তোমাদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেতে পারি ?
শাহযাদাগণ বাপের কাছে যা শিখে এসেছিল
তা অবলীলায় বলে দিল।
উত্তর শুনে য়মনের রাজা সরওয়ের মুখে হাসির রেখা ফুটলো,
এবং উপস্থিত সবাই তুষ্ট হোল।
জ্ঞানী রাজা যখন বুঝতে পারলেন যে,
রঙের পাঁচমিশালীতে ফায়দা কিছু হোল না।
তখন অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে তিনি বিবাহে সম্মতি দান করলেন,
এবং কনিষ্ঠা কন্যাকে কনিষ্ঠ শাহযাদা ও জ্যেষ্ঠাকে জ্যেষ্ঠ শাহযাদার
হাতে সমর্পণ করার বাসনা প্রকাশ করলেন।
অবিলম্বে বিবাহের জন্য তাদেরকে প্রস্তুত করা হলো,

বৈবাহিক আচরণাদিতে তাঁরা দান করলেন তাঁদের নীরব সম্মতি।
তিন কন্যাকে তিন শাহযাদার হাতে সমর্পণ করা হোল,
পিতৃসমীপে কন্যাদের মুখমণ্ডল লজ্জায় রক্তিম হলো।
লাজনম্র গমনে বাসরের দিকে তারা স্বামীদের অনুগমন করলো—
মুখমণ্ডলে রঙের খেলা, অধরোষ্ঠে সুমধুর কলধ্বনি।

সর্ও ফারেদুনের পুত্রদেরকে ইন্দ্রজাল দিয়ে পরীক্ষা করলেন

আরবদের অধিপতি য়মনের বাদশা সর্ও
মদ্য ও মদ্যপায়ীদের এক আসর সজ্জিত করলেন।
রাত্রি গভীর হলে গায়কগণ এসে সমবেত হোল সেখানে,
রাজা আনন্দিত মনে তাদের অভ্যর্থনা জানালেন।
ফারেদুনের তিন পুত্র তাঁর জামাতাগণ
রাজার সন্তুষ্টির জন্য পান করলেন সুরা।
অচিরেই মদের নেশা তাঁদের বুদ্ধিকে অভিভূত করলো,
তাঁরা সারা অঙ্গে অবসাদ বোধ করলেন ও তাঁদের চোখে
নেমে এলো ঘুমের আমেজ।
তাঁদের চেতনায় সুন্দর স্বপ্নের পদধ্বনি শোনা গেল,
নিদ্রার জন্য উপযুক্ত স্থানের আকাঙ্ক্ষা জানালেন তাঁরা।
এবং অচিরেই তিন মহদাশয় শাহযাদা
সুগন্ধি ফুলবর্ষী এক গাছের তলায় গিয়ে ঘুমে অচেতন হয়ে পড়লেন।
যাদুকরগণের সর্দার তখন
এক অভিনব কৌশল চিন্তা করে
রাজার উপবন ছেড়ে বাইরে এলো,
এবং বিস্তার করলো এক ইন্দ্রজাল।
নিয়ে এলো শীতের মৌসুম ও প্রবাহিত করলো ঝঞ্ঝা বায়ু,
এবং তা দিয়ে শাহযাদাগণের নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটালো।
সেই শীতে কাঁপতে লাগলো প্রান্তর ও উপবন,
মস্তকোপরি কাকপক্ষী উড্ডয়নে অপারগ হোল।

এই যাদুতে বাদশা-তনয়গণ ব্যতিব্যস্ত হয়ে
কঠিন শীতের হাত থেকে রক্ষার উপায় চিন্তা করতে লাগলেন।
এমন সময় বিশ্বপ্রভুর নিকট থেকে এলো সাহায্য—
প্রকটিত হোল তাঁদেব পুরুষকাব ও প্রতাপ।
ইন্দ্রজালের প্রভাব তাঁদের উপর কার্যকরী হোল না,
শীত ঋতু তাঁদের উপর দৃষ্টিপাতে অশক্ত হোল।
সূর্য যেমন তার শাণিত তলোয়াব দিয়ে আঘাত কবে
পাহাড়েব মাথায়,
তেমনি যাদুশক্তিও তাদের হাতে ঘায়েল হয়ে মস্তক
অবনত করলো।
রাজা তখন পুরুষকাবের প্রতীক জামাতাত্রয়ের নিকটে এসে
উপস্থিত হলেন,
দেখলেন, তাঁদের মুখে প্রতিভাত হচ্ছে আকাশের নির্লিপ্ততা।
অথচ তাঁর কন্যাত্রয় হিমানীর আক্রমণে
স্বামী-চিন্তায় সূর্যমুখীর মতো পরিম্লান হয়েছে।
অত্যন্ত স্নেহের দৃষ্টিতে রাজা জামাতাগণেব দিকে চাইলেন,
তাঁর নয়নযুগল যেন তৃপ্তি হোল চন্দ্রসূর্যের দর্শনে।
রাজা দেখলেন, তিন শাহযাদা তিনটি চাঁদের মতো
রাজার নতুন উপবন আলো করে আছে।
ইন্দ্রজাল তাঁদের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি—
সময় তাঁদের ব্যক্তিত্বের দ্বারা প্রতিহত হয়ে ফিরে গেছে।
য়মন-রাজ তখন দরবার করে,
সেখানে সকল দলপতিগণকে জমায়েত করলেন,
তারপর খুলে দিলেন রাজকোষের দুয়ার—
দীর্ঘদিন যা ছিল লোকচক্ষুর কাছে এক অজ্ঞাত রহস্য।
তিন শাহযাদা যেন তিনটি সূর্য, আলো করে আছে সারা মহফিল,

তারা যেন এমন তিনটি দেবদারু কোন চাষীই যা কোন দিন
জন্মাতে পারেনি।
রাজকোষের সেই অনস্পৃষ্ট মণিমাণিক্য ও রাজমুকুট যেন
অধীর হোল শাহযাদাগণের স্পর্শ লাভের আকাঙ্ক্ষায়।
রাজা সে সব দান করলেন তিন জামাতাকে—
চাঁদের মতো সুন্দর অথচ বীরত্বের প্রতিমূর্তি।
তারপর আসন্ন বিয়োগ-ব্যথায় অধীয় হয়ে রাজা বললেন,
আহা, বাদশা ফারেদূন যদি আমার কাছে না আসতেন;
যদি তিনি না পেতেন আমার সন্ধান,
কিংবা এই পরিণয়ের কন্যাপক্ষ যদি কেয়ানী বংশোদ্ভব হোত
তবে কতই না আনন্দের হোত!
যাব কন্যা নেই তাব উপর সৌভাগ্যের নক্ষত্র
দৃষ্টিপাত করে না,
কন্যার কল্যাণেই মানুষের ভাগ্য-তারা হয় উজ্জ্বলিত।
তারপর উপস্থিত সকলকে সম্বোধন করে সর্ও বললেন,
আমার চন্দ্রগণ তাদের উপযুক্ত স্বামী পেয়েছে।
আমার বিশ্ব-উজ্জ্বলকারী কন্যাত্রয়কে আমি
তাদের হাতে সমর্পণ করেছি আমারই দেশের প্রচলিত
রীতি অনুযায়ী।
আমার দুই নয়নের আলো আমার প্রাণের প্রাণ
সোপর্দ করছি তাদের সৌজন্য ও ভালবাসার হাতে।

এই বলার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি কান্নায় ভেঙে পড়লেন
ও কন্যাত্রয়ের শুভ যাত্রার ব্যবস্থা করলেন,
দ্রুতগতি অশ্ব ও প্রমত্ত উটের পিঠে তুলে দিলেন
কন্যাদের জন্য যৌতুক।

য়মন থেকে বিদায় হতে চললো তাঁর মহামূল্য মুক্তা.
প্রস্তুত হোল শিবিকার পর শিবিকা।
সন্তান সে পুত্র হোক কিংবা কন্যা—
পিতামাতার কাছে উভয়ই সমান।
দ্রুতগতি উটের পিঠে প্রস্তুত হোল হাওদা,
রাজকীয় প্রথা অনুযায়ী তাদেরকে করা হোল সুসজ্জিত।
প্রত্যেক কন্যার জন্য পৃথক পৃথকভাবে নির্দিষ্ট করা হোল
মনোরম যৌতুক,
ও তাদেরকে সেই ভাবেই সুবিন্যস্ত করে রওয়ানা করা হোল।
রাজকীয় ছত্র ও সুসজ্জিত ঘোড়ার পিঠে চড়ে
যাত্রীদলের মধ্যে শোভা পেলেন তিন জামাতা।
এইভাবে যৌবন সমৃদ্ধ শাহযাদাগণ
যাত্রা করলোন পিতা ফারেদুনের উদ্দেশে।

ফারেদুন কর্তৃক পুত্রদের পরীক্ষা গ্রহণ

পুত্রদের ফিরে আসার খবর পেয়ে
ফারেদুন পথে বেরিয়ে এলেন।
অন্তর থেকে তিনি তাদের মঙ্গল কামনা করলেন,
ও অমঙ্গল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য উচ্চারণ করলেন প্রার্থনা।
তারপর এক বিরাট আজদাহার[১] রূপ ধরে
পুত্রদের সমীপবর্তী হলেন—
কৃতান্তরূপী ব্যাঘ্রও তেমন আজদাহার মুখোমুখী হতে ভয় পায়।
ভীষণ গর্জনে মেদিনী কম্পিত করে আজদাহা ধাবিত হোল,
তার মুখ থেকে নির্গত হতে থাকলো ধূমায়মান অগ্নিশিখা।
তিন পুত্র এই দৃশ্য দেখে সহসা আতঙ্কিত হোল,
এবং তাদের চারদিকে দেখতে পেলো অন্ধকার পর্বত গুহা।
আজদাহারূপী পিতা প্রথম বড় পুত্রের শৌর্য পরীক্ষার জন্য
তার খুব কাছে এসে উপস্থিত হলেন।
পুত্র এই ভীমকায় আজদাহার সঙ্গে সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হোল,
সে হতবুদ্ধি হয়ে হারিয়ে ফেললো সকল সাহস;
এবং অবিলম্বে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে প্রয়াণপর হোল;
পিতা তা দেখে দ্বিতীয় পুত্রের দিকে মুখ করলেন।
মধ্যম পুত্র আজদাহাকে দেখেই
অত্যন্ত সপ্রশংসভাবে টেনে নিলো ধনুক ও তাতে দিলো
আকর্ণ-বিস্তারী টঙ্কার।

---

১ এক কাল্পনিক বিকট-দর্শন সাপ। অজগর আজদাহার সমার্থক শব্দ নয়। আজদাহার মুখে বিরাট দাঁত আছে, তার পাখা ও পা আছে এবং তার মুখ থেকে লেলিহান অগ্নিশিখা নির্গত হয়।

এবং বললো, যুদ্ধ যুদ্ধই,
তা সৈনিকের সঙ্গেই হোক কিংবা ক্রুদ্ধ সিংহের সঙ্গে।
কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেও তার সাহস অব্যাহত রাখতে পারল না,
মুখ ফিরিয়ে প্রয়াণপর হোল পেছনের দিকে।
এইবার বাদশা ছোট ছেলের নিকটবর্তী হলেন,
সে আজদাহাকে দেখেই চিৎকার করে এগিয়ে এলো।
এবং অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তলোয়ার কোষোম্মুক্ত করে
অশ্ববল্গা কঠিন হাতে সংযত করলো, এবং ধ্বনিত করলো
সংগ্রামী হুঙ্কার।
আজদাহাকে লক্ষ্য করে সে বললো, পৃষ্ঠপ্রদর্শন কর আমাদের
সামনে থেকে,
ব্যাঘ্র হলেও সিংহের পথে আগমন করা থেকে বিরত হ'।
তোর কানে যদি ফারেদুনের নাম পৌঁছে থাকে
তবে এমন করে আমাদের সামনে আসতে ভয় পা'।
আমরা তিন জনই তাঁর পুত্র,
আমরা তিন জনই ভীমতম প্রহরণধারী
যদি ভাল চাস তবে সরে যা আমাদের সামনে থেকে,
নয়তো তোর ভাগ্যে এখুনি নেমে আসবে চূড়ান্ত দুর্দিন।
ভাগ্যবান ফারেদুন এই পরীক্ষার দ্বারা
পুত্রদের জ্ঞান ও শৌর্যের পরিচয় পেলেন ও তখুনি অদৃশ্য হলেন।
তারপর পুনরায় স্নেহময় পিতার বেশে
তাঁর স্বকীয় রাজ-মর্যাদার সঙ্গে তাদের সামনে তিনি আবির্ভূত হলেন।
দুন্দুভি নিনাদিত হোল, মদমত্ত হস্তীদল তাঁর অনুগমন করলো,
এবং তাঁর হাতে শোভা পেল সেই গোমুখ চিহ্নিত প্রহরণ।
সৈনিক ও দলপতিগণ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে তাঁর অনুগামী হোল,
সর্বত্র উচ্চারিত হোল স্বাগতম্।

অভিজাত ও জ্ঞানিগণ বাদশাকে পথে দেখতে পেয়ে
পদব্রজে এগিয়ে এলো তাঁর সমীপে—
তারা বাদশার সামনে এসে আভূমি প্রণত হয়ে মৃত্তিকা চুম্বন করলো,
হস্তীর বৃংহণে ও দুন্দুভির আওয়াজে সর্বত্র বিরাজিত হোল
এক সঘন স্তব্ধতা।

পিতা পুত্রদের হস্তধারণ করে তাদের আনন্দিত কবলেন,
এবং মর্যাদা অনুযায়ী তাদের স্থান নির্দেশ করলেন।
তারপর প্রাসাদে ফিরে এসে
তাদেরকে সমবেত করলেন তাঁর সিংহাসনের পাশে।
স্রষ্টার অসংখ্য গুণকীর্তনের মধ্যে ব্যক্ত করলেন
কাল সম্পর্কে তাঁর ভালোমন্দের অভিজ্ঞতা।
তারপর পুত্রদের সুসজ্জিত আসনে বসিয়ে
তাদের সম্বোধন করে বললেন,
ওই ক্রুদ্ধ আজদাহা
যে তার নিঃশ্বাসে জ্বালিয়ে দেওয়াব উপক্রম করেছিল ধরিত্রী—
সে আর কেউ নয় তোমাদেরই পিতা—তোমাদের ব্যক্তিত্বের অন্বেষণে
সেখানে গিয়েছিল এবং তার পরিচয় পেয়ে হৃষ্টচিত্তে ফিরে এসেছে।
এখন আমরা তোমাদের নামকরণ করবো—
তোমাদের প্রকৃতির প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রেখে।
তুমি সকলের বড়, তোমার নাম সুল্‌ম[২] রাখা হোল,
আকাঙ্ক্ষিত বস্তুরাশিতে তুমি পূর্ণ করবে ধরিত্রী।
তুমি নিরাপত্তার অনুসন্ধান কর অস্ত্রের ঝঞ্চনা থেকে,
সময়ে পলায়নেও তুমি তৎপর।
যে-বীর মত্ত হাতী কিংবা সিংহের সামনেও পিছ্‌পা হয় না,
তুমি তাকে পাগল বলে গণ্য কর, তাকে বীর বলে সম্বোধন কর না।
আমার মধ্যম পুত্র যে শুরুতে অত্যন্ত তেজস্বিতার পরিচয় দিয়েছিল,

আজদাহার আগুন তার মধ্যে উত্তেজিত করেছিল বীরত্বের দর্প;
তার নাম রাখলাম তূর[৩] সাহসী সিংহ
কখনো মত্তহস্তীর পদতলে পিষ্ট হবে না।
বুদ্ধি নিজেই নিজের জায়গায় বীর,
উপযুক্ত সময়ে কখনো সে আত্মহারা হয় না।
আমার কনিষ্ঠ পুত্র সংকল্প ও সংগ্রামের প্রতিমূর্তি,
তার মধ্যে ক্ষিপ্রতা ও মন্থরতা সমভাবে বিরাজ করে।
মৃত্তিকা ও অগ্নির মধ্যপথ সে বেছে নেয়,
সাবধানতার সঙ্গে সে পদচারণা করে।
সে যৌবন-দীপ্ত, জ্ঞানী ও বীর
প্রশংসা তাকেই শোভা পায়।
তার নাম রাখা হোল এরজ,[৪]
সম্ভ্রম ও মর্যাদাই হবে তার পরিণাম।
সে সময়ে প্রকাশ করবে আনন্দ,
অসময়ে প্রকটিত করবে ভীষণতা।
শক্তি ও সৌন্দর্যের তুলাদণ্ড বক্ষিত হবে তার সিদ্ধান্তের উপর,
কিন্তু সর্বত্র সে প্রদর্শন করবে তার চরিত্রের স্থৈর্য।
এখন আমি আরবের সৌন্দর্য প্রতিমাগণের
নামের মাহাত্ম্যে প্রকটিত করবো আমার আনন্দ।
স্লমের পত্নীর নাম রাখলাম আরজু
আর তূরের পত্নীর নাম মাহ্ আজাদা।
এরজের ভাগ্যবতী পত্নীর নাম রাখলাম সহী,

২, ৩, ৪, প্রাচীন পাহলবী অর্থাৎ আবেস্তীয় ভাষায় এই নামগুলোর হয়তো আভিধানিক অর্থও ছিল। কিন্তু বর্তমান ভাষায় এগুলি নিছক নাম। 'এরজ' শব্দটি ভারতীয় আর্য শব্দের সমার্থক শব্দ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

স্বাতী[৫] সর্বদা অনুচরীর মতো করবে তার অনুগমন।
ভাগ্যের সূচক নক্ষত্রগণ সর্বদা আবর্তিত হয় আকাশে,
সুতরাং, জ্যোতির্বিদগণকে এনে জড়ো করা হোল প্রসাদে।
তারা তাদের গণনা লিখিতভাবে পেশ করলো,
শাহযাদাগণ তার মধ্যে দেখতে লাগলো নিজেদের ভাগ্যের নক্ষত্র
সল্‌মের ভাগ্য-লক্ষণে দেখা গেল যে,
'মুশ্‌তরী' তারকা ধনুক রাশির আলিঙ্গনে আবদ্ধ রয়েছে।
ভাগ্যবান তূরের নিয়তি লক্ষণে প্রকটিত হোল,
তরুণ সূর্য সুমঙ্গল সিংহ রাশির আকর্ষণে আকৃষ্ট।
এরজের ভাগ্য-লক্ষণে দৃষ্টিপাত করতেই দেখা গেল.
চন্দ্র সেখানে বৃশ্চিক রাশির বন্ধনে নিশ্চেষ্ট হয়ে আছে।
এই লক্ষণ যার নিয়তির মধ্যে প্রকটিত হবে
তার আয়ুষ্কাল চিহ্নিত হবে দুশ্চিন্তা ও যুদ্ধবিগ্রহ দ্বারা।
এই ভাগ্য-লক্ষণ দেখে বাদশা অন্তরে ব্যথিত হলেন,
তাঁর কলিজা ছিন্ন করে যেন এক হিম নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো।
তিনি বুঝতে পারলেন, এরজের উপর আকাশ বিরূপ,
ভাগ্য প্রসন্ন নয় তার উপরে।
বাদশা এরজের উপর আকাশের এই চক্রান্ত দেখে
তাকে সর্বদা চোখের সামনে রাখবার সঙ্কল্প করলেন।
উজ্জ্বল-হৃদয় এই পুত্রের অমঙ্গল-আশঙ্কা
তাঁর হৃদয়ে তীরের ফলার মতো গেঁথে রইলো।

৫ সৌভাগ্যের সূচক নক্ষত্র বিশেষ।

ফারেদুন তাঁর রাজ্য তিন পুত্রের মধ্যে ভাগ করে দিলেন

ফারেদুন চিত্ত-বিক্ষেপ দূরে সরিয়ে দিয়ে বাইরে এলেন
এবং তিন পুত্রকে বেঁটে দিলেন দুনিয়া।
একজনকে দিলেন রোম ও পশ্চিমের এলাকা,
অন্যকে তুর্কিস্তান ও চীন,
তৃতীয়-জনকে দিলেন দিগন্তবিস্তারী প্রান্তর সহ ইরানভূমি।
প্রথমে সুল্‌ম চারদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখলো,
রোম ও পশ্চিমের সকল এলাকা তার উপযুক্ত বিত্তই হয়েছে।
সে সমস্ত গৌরব সহ কেয়ানী তখতে সমাসীন হয়ে
নিজেকে পশ্চিমের প্রভু বলে ঘোষণা করলো।
তূরকে তূরান ভূমি দান করার ফলে
সে তূরান ও চীনের সর্বময় প্রভুপদে বরিত হোল।
বাদশা তার জন্য নির্দিষ্ট করলেন যে সৈন্যদল,
সে তাকে অবিলম্বে তূরান অভিমুখে যাত্রার আদেশ দিলো।
তারপর শাহী তখ্‌তে বসে
সে বাঁধলো তার কোমর ও হস্ত প্রসারিত করলো।
সামন্তগণ তার শিরে বর্ষণ করলো মুক্তারাজি,
ও তাকে সম্বোধন তূরানের বাদশা বলে।
তারপর পালা এলো এরজের,
পিতা তার জন্য নির্বাচিত করলেন ইরানকে।
তাকে দিলেন সমস্ত ইরানভূমি ও বর্শাধারীদের
বিচরণ ক্ষেত্র সকল মরু প্রান্তর,
তাকে দিলেন নিজের তখ্‌ত ও তাজ।

তার যোগ্যতার জন্যই বাদশা তার হাতে সমর্পণ করলেন
এই তাজ, তখত, তলোয়ার ও রাজ-অঙ্গুরীয়।
জ্ঞানী বুদ্ধিমান ও সংকল্প-সিদ্ধ সামন্তগণ
তাঁকে সম্বোধন করলেন ইরানের প্রভু বলে।
এইভাবে তিন অভিজাত নরপতি
তিন দেশে সুখে রাজত্ব করতে লাগলেন।

এরজের প্রতি সুল্‌মের ঈর্ষা

সময়ের দীর্ঘ পথ-যাত্রায়
কাল প্রকটিত করে চললো তার রহস্য।
জ্ঞানী ফারেদূন বার্ধক্যের সীমায় এসে উপস্থিত হলেন,
বসন্তের উপবনে হেমন্তের শুষ্ক বাতাসের আনাগোনা শুরু হোল।
কাব্য-কবিতার সুদিনের অন্ত হোল,
প্রাচীনত্বে জরাগ্রস্ত হয়ে পড়লো শক্তি।
শিল্প ও কলার জগতে নেমে এলো অন্ধকার,
ফলে বিত্তবানদের হৃদয়ে প্রবেশ করলো দুশ্চিন্তা।
সুল্‌মেব চবিত্রে প্রকটিত হোল বিকার,
এরজের রক্তপাতের আকাঙ্‌ক্ষায় উন্মুখ হয়ে উঠলো
তার প্রতিটি রক্তবিন্দু।
সুল্‌মের হৃদয়ের ঘটলো স্থানচ্যুতি,
তার চিন্তাধারা ও ধরন-ধারণে এলো
বিবাট পরিবর্তন।
লালসার সমুদ্রে ডুব দিল সে,
এবং পরামর্শ-দাতাগণকে নিয়ে বসলো
উপায়-চিন্তায়।
সে পিতার দানে সন্তুষ্ট হতে পারছে না,
কেননা তিনি কনিষ্ঠ জনকেই দিয়েছেন তাঁর সুবর্ণ সিংহাসন।
এই চিন্তায় অন্তর তার ঈর্ষায় পূর্ণ হলো ও ললাটে
দেখা দিল বিরক্তির রেখা,
অবিলম্বে এক দূতকে চীন অভিমুখে
পাঠাবার আয়োজন সম্পূর্ণ করে

দূতের কাছে সে তার অন্তরের বিষোদ্গার করলো,
এবং তার জন্য সজ্জিত করলো দ্রুতগামী অশ্ব।
অনুজ তূর—যার মধ্যে
চিরকাল ছিল ন্যায়পরতা ও সৎবুদ্ধির অভাব
তারই কাছে পাঠালো সে বাণী—
বললো, তুমি লাভ কর চিরযৌবন এবং চিরসুখী হও।
ওগো চীন ও তুর্কীস্তানের অধিপতি,
জ্ঞানী, জাগ্রত-চিত্ত ও মঙ্গল-সন্ধানী—
জেনে রাখ, পৃথিবীতে ক্ষতিকেই আমরা করেছি নির্বাচিত,
যদিও স্বভাবে আমরা উন্নত দেবদারুর মতোই মহীয়ান।
জেগে উঠো, শোন এই কাহিনী,
এমন কাহিনী কেউ শোনেনি কোন দিন।
আমরা ছিলাম বাদশার তিন সন্তান—তিন জনই সিংহাসনের যোগ্য
কিন্তু তার মধ্যে ছোটজনের জন্যই শুধু
উদিত হোল সৌভাগ্যের চাঁদ।
বয়সে ও জ্ঞানে বড় হয়েও আমি
বঞ্চিত হলাম কালের আনুকূল্য থেকে।
চলে গেল আমার হাত থেকে পিতার তাজ ও তখ্‌ত
এবং তোমাকেও বঞ্চিত করা হোল সে সব থেকে।
পিতার অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা লক্ষ্য কর,
তিনি আমাদের দান করেছেন দুই নিরানন্দ দেশ।
এরজ যেখানে পেয়েছে ইরান, য়মন ও বীরপ্রসূ প্রান্তর,
সেখানে আমার লাভ হয়েছে রোম ও পশ্চিমের এই এলাকা।
তুর্কিস্তান ও চীনের মরু অঞ্চল পড়েছে তোমার ভাগে,
এবং সামন্ত শোভিত ইরান ভূমি থেকে আমরা হয়েছি বঞ্চিত।
পিতার এই অসম ব্যবহারে
আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ক্ষুণ্ণ ও অসুখী।

স্থুল্‌মের এই বাণী বহন করে ধাবিত হোল অশ্ব,
এবং তূরান-পতির নিকটে এসে উপস্থিত হোল।
দূত সালঙ্কারে বর্ণনা করলো স্থুল্‌মের বাণী,
তা শুনে অপদার্থ তূরের মস্তিষ্ক পূর্ণ হোল লালসায়।
বাণীর তাৎপর্য তার মধ্যে হিংসার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করলো,
এবং সে লাফিয়ে উঠলো ক্রুদ্ধ নেকড়ের মতো।
বললো, রাজাকে তুমি আমার এই জবাব জানিয়ো
আমার মুখে যা শুনবে, হুবহু তাই তাঁকে বলো।
পিতা আমাদেরকে যৌবনের সূচনায়ই
এমনভাবে প্রতারিত করেছেন যার উপমা
স্বহস্তে রোপিত একটি বৃক্ষ—
কোথাও তার শাখা কোথাও তার পত্র।
আপনাকে এখনই আমাদের এই আলোচনা
পিতার সামনে পেশ করতে হবে।
এই সুচিন্তিত অভিমত লিপিকায় লিপিবদ্ধ করে
দ্রুতগামী অশ্ব-পৃষ্ঠে কোন সৈনিককে দিয়ে
পাঠাতে হবে বাদশার কাছে।

তাতে লিখতে হবে অব্যর্থ বাণী
এবং জ্ঞাত করতে হবে আমাদের সঙ্কল্পের দৃঢ়তা।
হে দূত, তাঁকে উপরন্তু এই বাণীও দিবে,
ওগো দৃষ্টিমান নরপতি,
সম্পদের জায়গায় প্রতারণা
সহ্য করে না কোন বীরপুরুষ।
তেমন অবস্থায় গৌণও অনুচিত,
তাতে ব্যর্থ হয় উদ্দেশ্যের সম্ভাবনা।

দূত এই জবার নিয়ে ফিরে এলো,
সঙ্গে সঙ্গে উলঙ্গ হয়ে পড়লো বহুদিনের গুপ্ত রহস্য।
স্লম্ অবিলম্বে রোম থেকে যাত্রা করে চীনে এসে ভ্রাতার সঙ্গে
মিলিত হোল,
যেন সুরার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হোল হলাহলের তীব্র জ্বালা।
সেখানে একে অপরের দ্বারা হলো উৎসাহিত,
এবং তাদের মধ্যে চললো প্রকটিত ও গুপ্ত সকল কথার আলোচনা।

ফারেদূনের কাছে সুল্‌ম ও তূরের বাণী

অতঃপর তারা এক স্মৃতিশক্তি-ধারী
বাক্‌পটু ও স্পষ্টভাষী জ্ঞানী লোককে দূত রূপে নির্বাচিত করলো।
এবং নিতান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত লোকদের ছাড়া অন্যদের
বের করে দিয়ে,
তার সঙ্গে মিলিত হোল এক পরামর্শ সভায়।
প্রথমে কথা বললো সুল্‌ম,
পিতার প্রতি পুত্রের দৃষ্টিতে যে-সম্ভ্রম থাকে
সে-ই প্রথমে তা মুছে ফেললো।
দূতকে বললো, তুমি এমনভাবে পথাতিক্রম করবে
যেন বাত্যা কিংবা ধূলিঝড় তোমাকে কিছুতেই ধরতে না পারে;
ত্বরিৎ তোমাকে গিয়ে পৌঁছতে হবে ফারেদূনের কাছে—
যতক্ষণ সেখানে না পৌছবে ততক্ষণ চলাই তোমার একমাত্র কাজ।
তারপর ফারেদূনের প্রাসাদে উপস্থিত হয়ে
প্রথমে দুই পুত্রের সম্ভাষণ তাঁকে জানাবে।
পরে বলবে, ইহ-পরকালের মঙ্গল যার কাম্য
তার মধ্যে থাকা চাই বিশ্বপ্রভুর ভয়।
যৌবনের স্বাভাবিক গতি বার্ধক্যের দিকে,
শুক্ল কেশ কখনো প্রত্যাবর্তন করে না কৃষ্ণ বর্ণে।
বয়সের সংকীর্ণতায় আপনার অবস্থান বিলম্বিত,
এই বিলম্বিত দিন আপনার জন্য হয়েছে কারাগার সদৃশ।
আপনাকে বিশ্বপ্রভু দান করেছিলেন এই দুনিয়া—
উজ্জ্বলিত সূর্যের দেশ থেকে অন্ধকারের গহনতা পর্যন্ত।
আপনি বাসনার মোহে ও আরাম আয়েশের মধ্যে নিমগ্ন থেকে
বিশ্বপ্রভুর আদেশ উপেক্ষা করেছেন।

কুটিলতা ও অপচয়ের পথেই আপনি বিচরণ করেছেন,
সরল পথে করুণার সন্ধান আপনি কোন দিন করেন নি।
আপনার তিন পুত্র ছিল—সবাই বীর ও বুদ্ধিমান,
সবাই মহত্বে মহীয়ান ও চেতনায় জ্ঞানী।
কিন্তু আপনি শুধু একজনের মধ্যেই যোগ্যতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন,
অন্যদের মস্তক ঠেলে দিয়েছিলেন নীচের দিকে।
একজনকে নিক্ষেপ করেছিলেন আজদাহার করাল গ্রাসের মুখে,
অন্যের শির উন্নত করেছিলেন মেঘমালারও উর্ধ্বে।
আপনারই শিয়রের কাছে একজনকে শোভিত করেছেন তাজ দ্বারা,
এবং রেখে দিয়েছেন তাকে চোখের মণি করে।
আমরা পিতা-মাতা কোন দিক থেকেই তার চেয়ে খাটো ছিলাম না,
কিন্তু আপনার তখ্ত ও তাজ থেকে আমরা দুয়েই হয়েছি বঞ্চিত।
হে বদান্য বাদশা,
এই বদান্যতাকে কিছুতেই সমর্থন করা যায় না।
সেই তাজ যদি তার শির থেকে নামিয়ে না আনুন
ও দুনিয়াকে তার থেকে রেহাই না দেন—
এবং তার বদলে তাকে দুনিয়ার সেই অংশ দান না করুন
যেখানে অজ্ঞাত ও অবহেলিত অবস্থায় আমরা বসে আছি
তবে অচিরেই তুর্কীস্তানের ও চীনের অশ্বারোহিগণ
রোমের অঞ্চল থেকে ঈর্ষান্বিত অন্তরে বেরুবে।
এবং সেই সৈন্যদল নিয়ে আমি অভিযান করে
ইরান ও এরজকে সমূলে বিধ্বস্ত করে দিব।
জ্ঞানবান দূত এই পৌরুষ বাক্য শোনামাত্র
মাটি চুম্বন করলো ও অবিলম্বে তার সামনে থেকে প্রস্থানোদ্যত হোল।
এইভাবে সেই স্থান সে ত্যাগ করে গেল
যেমন বাতাসের ঝাপটায় দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়ে দাবানল।

দূত ফারেদুনের রাজধানীতে পেঁছে
দূর থেকেই দেখতে পেল এক উন্নত রাজপ্রাসাদ।
সেই প্রাসাদের শীর্ষ মেঘমালার ঊর্ধ্বে স্থাপিত,
তার বিস্তৃতি জুড়ে আছে এক পাহাড়ের পাদদেশ থেকে অন্য পাহাড়ের
পাদদেশ পর্যন্ত।
সেই প্রাসাদে উপবিষ্ট রয়েছেন মহৎ সভাসদগণ,
এবং অন্তরালে অবস্থান করছেন স্বাধীনা নারী-সমাজ।
প্রাসাদের একপাশে শৃঙ্খলিত ব্যাঘ্র ও সিংহ,
অন্য পাশে মদমত্ত করীদল।
যখন বীরবৃন্দ সেখানে সমবেত হয়
তখন সেখান থেকে বহির্গত হয় সিংহের গুরুগর্জন।
প্রাসাদে সর্বদা প্রহরারত রয়েছে
একদল সুদর্শন নারী-সৈনিক।
তারা সর্বকাজে সদাজাগ্রত,
তারাই বাদশাকে গিয়ে জানালো,
কোন এক সুজন দূত উপঢৌকনসহ
রাজদ্বারে দর্শনপ্রার্থী।
বাদশার অনুমোদন নিয়ে প্রহরিণীগণ যবনিকা উত্তোলন করে
দূতকে তাঁর সমীপে নিয়ে এলো।
ফারেদুনের দর্শন লাভে দূতের আশা পূর্ণ হোল,
ও তার হৃদয় মন ভরে উঠলো তৃপ্তির আনন্দে।
বাদশা বসেছেন, যেন উন্নত দেবদারুর মাথায় সূর্যের উদয় হয়েছে,
অথবা রক্ত গোলাপের চারপাশে বিস্তৃত রয়েছে কর্পূর সদৃশ
শুভ্র ফুলের সমারোহ।
তাঁর অধরোষ্ঠে স্ফুরিত হচ্ছে ঈষৎ হাসির রেখা—গণ্ডদেশে
ফুটে বেরুচ্ছে সৌজন্য সূচক লজ্জায় রক্তিমাভা,
আর সেই সঙ্গে তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হচ্ছে কেয়ানী বংশ-সুলভ
মৃদুমন্দ বচন-ধ্বনি।

এই দৃশ্য দেখামাত্র দূত সাষ্টাংগে প্রণত হোল,
ও মৃত্তিকার উপবে অঙ্কিত করলো অসংখ্য চুম্বনের রেখা।
ফারেদুন তখন তাকে তাব উপযুক্ত এক উন্নত আসনের
উপর বসবার আদেশ করলেন।
প্রথমেই তিনি তাঁর স্নেহাস্পদ দুই পুত্রের
কুশল ও স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করলেন।
তারপর মরু-প্রান্তরময় দূর পথের দুর্গম যাত্রায়
দূতের ক্লান্তি ও বিপদ-আপদের কথা জানতে চাইলেন।
দূত বললো, মহান বাদশা,
সর্বত্র আপনারই শাসনের সুমঙ্গল চিহ্নগুলো ছড়ান রয়েছে।
প্রতিটি মানুষ কীর্তন করেছে আপনার যুগের সফলতা,
এবং সকলে জীবন পাচ্ছে আপনার নামের থেকে।
হে বাদশা, আমি আপনারই এক অযোগ্য দাস,
পাপী ও জ্ঞানহীন।
আপনার সমীপে এক পরুষ বাণী নিয়ে আমার আগমন,
আমি দূত মাত্র—বাণীবাহক, আমার অপরাধ আপনি মার্জনা করুন।
আমি তাই বলবো, যা বলবার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি
এবং বাণী বহন করে এনেছি দুই অবিবেচক যুবকের কাছ থেকে
এই বলে সে আবৃত্তি করে চললো
আত্মন্ত শাহাযাদাগণের সেই পরুষ বাণী।

পুত্রদের প্রতি ফারেদুনের প্রত্যুত্তর

ফারেদুন দূতের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন
ও আবেগে মর্দিত করলেন নিজের অন্তর।
দূতকে সম্বোধন করে তিনি বললেন, হে বিচক্ষণ,
নিজের কাজের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার প্রয়োজন তোমার নেই।
এ'তো আমারই নিজের দুই চোখ—
আমারই অন্তর।
তুমি সেই অপবিত্র অকর্মণ্যদের গিয়ে বলো—
বলো সেই শয়তানদ্বয়কে,—যারা স্বীয় মস্তিষ্ককে
করেছে মালিন্যযুক্ত—
তোমাদের মতো যুবকের মুখেই এমন বাণী শোভা পায়
যারা মণিমুক্তা ও বাইরের উজ্জ্বলতাকেই জ্ঞান করেছে
চরম ও পরম বলে।
আমার উপদেশ যদি ভুলেই গিয়ে থাক,
তবে স্বীয় বুদ্ধিরই দ্বারস্থ হওয়া তোমাদের উচিত ছিল।
তোমরা নির্লজ্জ; বিশ্বপ্রভুর ভয়ও তোমাদের অন্তরে নেই;
জ্ঞান ও বিবেচনা দুই থেকেই তোমরা হয়েছ বঞ্চিত।
তরুণ বয়সে আমারও কেশরাজি কৃষ্ণবর্ণ ছিল,
দেহ ছিল দেবদারুর মতো সোজা ও উন্নত, মুখমণ্ডল
পূর্ণ চাঁদের মতো।
মনে রেখো, যে-কাল আজ আমার দেহকে করেছে ন্যুব্জ,
সে এখনও চক্রবৎ ঘূর্ণিত হচ্ছে।
সেই কাল উপহাসচ্ছলে হাসছে আজ তোমাদের দিকে চেয়ে,

মনে রেখো, তোমাদের হাসিও একদিন আপনিই মিলিয়ে যাবে,
সেই বিশ্বপ্রভুর নামই চির সমুন্নত থাকবে,
যিনি জ্যোতিষ্মান সূর্য ও অন্ধকার পৃথিবী দুয়েরই আলোর উৎস।
এই তাজ ও তখ্‌ত, চন্দ্র ও শুকতারার শপথ—
আমি অন্যায় করিনি তোমাদের উপর।[১]
আমি জ্ঞানীদের এক সভা আহ্বান করেছিলাম,
তাতে জমায়েত কবেছিলাম সকল জ্যোতির্বিদ ও জ্ঞান বৃদ্ধদের।
বহুদিন অতীত হয়েছে সেদিন থেকে—
যেদিন আমি দান করেছিলাম তোমাদেরকে এই ধরিত্রী।
আমার সেদিনের ইচ্ছায় সত্য ছাড়া আর কিছুই ছিল না,
ছিল না কুটিলতা, অসৎ উদ্দেশ্য কিংবা আর কিছু।
ছিল শুধু বিশ্বপ্রভুর ভয়,
এবং পৃথিবীতে ন্যায়ের পথ অনুসরণের ঐকান্তিক কামনা।
যে-ধবণীকে আমি সুশোভিত করেছিলাম ফুলে শস্যে—
তার সৌন্দর্য কি আমি নিজ হাতে বিনষ্ট কবতে পারি?
তাই আমারই রচিত তখ্‌ত আমি বিতরণ করেছিলাম
আমার পুণ্যবান তিন ছেলের মধ্যে।
সেই তোমবাই আজ আমার সিদ্ধান্ত বাতিল করে
মুখ ফিরিয়েছ শয়তানের প্ররোচনার দিকে।
মনে রেখো এইবার স্বয়ং বিশ্বপ্রভু নির্বাচিত করবেন
তোমাদের মধ্যে থেকে একজনকে।
যদি মনোযোগ দিয়ে শোন, তবে এক কাহিনী তোমাদেরকে বলবো,
যে যেমন করে তাব পরিণামও ঠিক তেমনিই হয়।

---

১ কুরআনের ভাষাব আত্মীকবণ লক্ষণীয়। এই ভাষা ফাবেদুনের নির্বিকার মনোভাবের দ্যোতক। পবে ফাবেদুন পুত্রদের সঙ্গে যে কঠোব ব্যবহার করবেন, এই ভাষা যেন তারই ভূমিকা হয়ে রইলো।

একবার আমাকে এক জ্যোতিষ বলেছিল,
আমার সিংহাসন দীর্ঘস্থায়ী হবে না।
যদি তোমরা লালসাকে পদদলিত করতে না পার
তবে দৈত্যদল তোমাদের সমকক্ষ হয়ে উঠবে।
আমার হৃদয় আজ এই আশঙ্কায় কম্পিত হচ্ছে,
পরিণামে হয়তো এই আজদাহারই গ্রাসে তোমরা পতিত হবে।
দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার কাল আমার সমাগত,
তার জন্য ভয় কিংবা ভাবনা আমার নেই।
কিন্তু সেই জ্যোতিষীর কথামতো
আমার মুক্ত-প্রাণ পুত্রদের মধ্যে যখন
দেখা দিবে লালসা,
তখন তাদের সম্পদ ও সিংহাসন সমস্তই ধূলায় মিশে যাবে।
মনে রেখো, যে ধ্বংস করে তার নিজের ভাইকে,
একদিন সেই এক ভৃঙ্গার শীতল পানির জন্য মাথাকুটে মরবে।
দুনিয়াকে তোমরা আজ যেমন করে দেখ্‌ছ, তেমনভাব দেখেছে অনেকেই,
কিন্তু দুনিয়া কারো বশীভূত হয়নি কোনদিন।
তাই, এখনও সময় আছে, বিচারের দিনে
রেহাই পাওয়ার সম্বল বিশ্বপ্রভুর সমীপ থেকে
এখনও হাত পেতে নাও।
অনুসন্ধান কর মুক্তির সেই পাথেয়,
যত্নবান হও, যাতে দুঃখকে লাঘব করতে পার।
রুদ্ধ নিঃশ্বাসে দূত বাদশার এই কথাগুলো শুনলো,
ও মৃত্তিকা চুম্বন করে দরবার ত্যাগ করলো।
এবং এমন দ্রুতগতিতে সে পথাতিক্রম করে চললো
যেন বায়ু তার যাত্রাসঙ্গী হয়েছে।
সুলমের দূত চলে গেলে

শাহিনশাহ ব্যক্ত করলেন তার আগমনের গূঢ় তাৎপর্য।
পুত্রকে ডেকে কাছে বসিয়ে
সব কথা তাকে বললেন।
বললেন, আমার দুই যুদ্ধকামী পুত্র
পশ্চিমাঞ্চল থেকে মুখ করেছে আমাদের দিকে।
সৌভাগ্য তাদেরকে এমনভাবে অন্ধ করেছে যে,
তারা তাদের অসৎ কার্যকে আর অসৎ বলে চিনতেও পারছে না।
দুই রাজ্য থেকে তারা অগ্নি-গোলকের মতো উত্থিত হয়েছে,
এবং তাই প্রকাশ করেছে তারা তাদের বাণীতে।
এমন ভাই ভাই-নামের অযোগ্য,
এবং তোমার মাস্তবরের মর্যাদা পেতে পারে না।
কারণ, তোমার সুন্দর মুখ মলিন হলে
এরা কখনো তোমার শিয়রের কাছে উপস্থিত হবে না।
তুমি তাদের সামনে প্রেমের তলোয়ার নিয়ে উপস্থিত হলেও
তারা তাদের মস্তিষ্ককে পূর্ণ করবে যুদ্ধের ভয়াবহ পরিকল্পনায়।
দুই দূর দেশ থেকে আমার দুই পুত্র
এই গূঢ় ইঙ্গিতই যেন আমার কাছে বাণীরূপে পাঠিয়েছে!
তাই, যদি ভোর বেলায় তুমি হাতে লও সুরা পাত্র
এবং সন্ধ্যা পর্যন্তও তা পান না করে হাতেই ধরে রাখ—
তবু দুঃখ ভুলবার কিংবা সুখ পাবার জন্যে
তেমন বন্ধুর খোঁজ করো না।
এই কথা শুনে বুদ্ধিমান এরজ
সম্মানিত পিতার দিকে চাইলেন,
এবং বললেন, ওগো দুনিয়াপতি,
কালের পরিবর্তনের দিকে চেয়ে দেখুন!
যদি অনুকূল হাওয়া আমাদের উপর দিয়ে বয়ে যায়,

তবে বুদ্ধিমানের তাতে মনো-দুঃখের কি কারণ থাকবে ?
বরং গোলাপের রঙিন মুখ মলিন হলেই তো
শুদ্ধচিত্ত মানুষের দৃষ্টিতে অন্ধকারের ছায়াপাত হয়।
সূচনায় সম্পদ ও পরিণামে দুঃখ—
দুনিয়ার এই পর্ণ কুটিব থেকে বেদনা নিয়েই তো ফিবে যেতে হয়।
মাটিতে শয়ন ও পাথরে সিথান দিয়ে
যে বৃক্ষ-শিশু আজ শো'লো-
কাল তারই মাথার উপরে ঘূর্ণিত হবে মহাকাশ—
শিকড় দ্বারা যে শোণিত-রস সে পান করবে, তাই একদিন
রক্তের ফল হয়ে ফলবে।
তাজ, তলোয়াব ও অঙ্গুরীয়েব অধিকারী নরপতি,
আপনি আমাদের দেখছেন ও দেখেছেন এই দুনিয়া।
কোথায় গেলেন অতীত কালের সেই সব নরপতি
যাঁরা নিজেদের অন্তরে উপ্ত করেছিলেন ঈর্ষার বীজ ?
মহান বাদশার হাত থেকে যে-রাজ্য আমি দানরূপে লাভ করেছি,
তাকে অমঙ্গলের মধ্যে নিক্ষেপ করা কি আমার জন্য শোভন হবে ?
চাই না আমার তাজ, তখ্‌ত ও রাজ্য,
সৈন্যসামন্ত না নিয়ে একাকীই আমি ভাইদের কাছে যাবো।
তাঁদেরকে গিয়ে বলবো, আপনারা আমার নমস্য, আপনারা গুরুজন,
আপনারা আমার উপর রাগ করবেন না, ঈর্ষান্বিতও হবেন না,
ধর্মানুগামী মানুষের জন্য ঈর্ষা শোভন নয়।
এই দুনিয়া থেকে এত কি আশা আপনারা করেন,
ভেবে দেখুন জামশেদের কথা, কি সে দিয়েছিল তাকে ?
পরিণামে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল সে দুনিয়া থেকে
দুনিয়া কেড়ে নিয়েছিল তার তাজ ও তখ্‌ত।
আপনাদের সঙ্গে সেই ভয়ঙ্কর পরিণামের স্বাদ

আমারও গ্রহণ করা উচিত হবে না।
চলুন, আমরা একে অন্যের প্রতি সন্তুষ্ট থাকি,
এবং শত্রুর মুখে রচনা করি এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর।
এইভাবে আমি তাঁদের শত্রুতার সম্মুখীন হব,
এবং তাঁদের হৃদয় থেকে ঈর্ষা কণ্টক কর্তিত করতে যত্নবান হবো।
পুত্রের এই কথা শুনে ফাবেদূন সুখী হলেন,
তাঁর স্নেহার্ত মুখে তিনি দেখলেন আশার আলো।
তবু তাকে বললেন, হে আমার ধীমান পুত্র,
ভায়েরা যেখানে যুদ্ধসাজে সজ্জিত, তুমি সেখানে শান্ত।
আমার কথা মনে রেখো,
চাঁদ থেকে আলো ছাড়া আর কি আশা করা যায়।
তোমার মুখ থেকেও তেমনি এমন বাণীই সম্ভব,
আমি বুঝলাম, প্রেমের সম্পর্কেই তুমি ভাইদের সঙ্গে
সম্পর্কিত হতে চাও!

কিন্তু আজদাহার মুখের সামনে যদি
তুমি পেতে দাও তোমার মাথা,
তবে সে তোমার উপর বিষোদ্গার ছাড়া আর কি করবে?
তেমন করাই তো তার প্রকৃতি।
হে বৎস্য, তবু ভাইদের সঙ্গে যদি আপোষই তোমার কাম্য হয়ে থাকে
তবে আর বিলম্ব করো না।
সৈন্যদের মধ্যে থেকে কতিপয় বিশ্বস্ত ও অনুগত জনকে ডেকে বলো,
তারা প্রস্তুত হয়ে এসে তোমার যাত্রাসঙ্গী হোক।
হৃদয়-বেদনায় সিক্ত করে এক লিপিকা
আমি তাদের কাছে লিখছি, এবং তোমাকে পাঠাবার আয়োজন করছি।
অচিরেই তুমি ফিরে আসবে সুস্থ দেহে,
তোমার দর্শনে আমার হৃদয় আবার আলোয় ভরে উঠবে।

ভাইদের কাছে এরজের যাত্রা

পশ্চিমের নরপতি ও চীনের নায়কেব কাছে
বাদশা এক লিপি লিখলেন।
প্রথমেই লিখলেন বিশ্বপ্রভুর গুণগ্রাম,
সর্বত্র যিনি বিদ্যমান, সর্বকালে যিনি অনুস্যূত।
তারপর লিখলেন, আমার এই উপদেশ-মূলক লিপি
উদীয়মান দুই সূর্যের প্রতি—
দুই পাষাণ-হৃদয় যুদ্ধকামী নর-নায়কের প্রতি—
একজন পশ্চিমাঞ্চলের প্রভু, অন্যজন চীনের অধিপতি।
এই লিপি তেমন এক অভিজ্ঞ মানুষের কাছ থেকে যাচ্ছে
যে দেখেছে দুনিয়ার বহু পরিবর্তন ও জেনেছে তার অন্তর বাহির,
যার জন্য শোভন হয়েছে খরশান কৃপাণ ও ভারী প্রহরণ,
সন্ত্রান্ত সামন্তদল যাকে সর্বদা ঘিরে আছে।
যে দিনের আলোর মধ্যেও রাত্রির অন্ধকারকে দেখতে পায়,
যে ভয় থেকে আশাকে ও অভাব থেকে সম্পদকে
বের করে আনতে পারে।
সমস্ত দুরূহ কাজ তার জন্য হয়েছে সহজসাধ্য,
এবং ফলে তার লাভ হয়েছে অন্তরের আলো।
মনে রেখো আমারই জন্য আমি রাজমুকুট কামনা করিনি,
পূর্ণ করিনি রাজকোষ ও রচনা করিনি সিংহাসন ও সৈন্যদল।
আমার তিন পুত্রেরই সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য আমি কামনা করেছি,
এবং তারই জন্য নিজের উপর টেনে এনেছি দীর্ঘদিনের পরুষ বিরাগ।
যে-ভায়ের জন্য তোমাদের অন্তরে জ্বলছে ঈর্ষার আগুন,

সে হয়তো কারো জন্যে সুশীতল বসন্ত বায়ু।
সেই ভাই তোমাদের মনোদুঃখের কথা শুনে দৌড়ে এসেছে,
এবং তোমাদের দর্শনের জন্য হয়েছে অস্থির।
তার রাজ-মর্যদা ও শক্তি কখনো তোমাদের দুঃখের কারণ হবে না,
ঐ দেখ তার উদ্যত ফণা কি করে সে নামিয়ে দিয়েছে।
সিংহাসন ছেড়ে সে সোপানের উপব এসে বসেছে,
এবং সেইভাবে সে প্রকাশ করছে তোমাদের প্রতি তার আনুগত্য।
সে বয়সে তোমাদেব ছোট,
তোমাদের স্নেহের প্রত্যাশী সে।
তোমরা তার মাননীয় ও সর্বদা মান্যবর,
আমি যেমন তাকে করি, তোমরাও তাকে তেমনি করবে।
তোমাদের সহবাসে কয়েকটি দিন যাপন করার জন্যে
আমি তাকে পাঠাচ্ছি।
দূত বাদশাদের যত্ন লাভ করে সর্বত্র,
ওগো, মনে রেখো এরজ আমার দূতরূপে নির্গত হচ্ছে প্রাসাদ থেকে।
তার সঙ্গে যাচ্ছে কতিপয় বৃদ্ধ ও যুবক,
যাতে পথাতিক্রম তার জন্য বিরস না হয়।

এরজ ভাইদের সমীপে পৌঁছে অশ্ব-বল্গা টেনে ধরলো,
তাদের মনের অন্ধকার সম্পর্কে সে কিছুই আঁচ করতে পারল না।
কারণ, প্রথানুযায়ী তাকে জানানো হোল সাদর সম্ভাষণ,
এবং সৈনিকরা তাকে আগু বাড়িয়ে নিয়ে এলো।
ভায়েরা পরস্পরের মুখ দেখে
আনন্দে ফুল্ল হোল।
দুই অমঙ্গলকামী ও এক শুভাকাঙ্ক্ষী
পরস্পর বিনিময় করলো শুভ সম্ভাষণ।
তৎপর দুইজন ঈর্যান্বিত ও একজন সরলান্তঃকরণ—

এই তিন জন বাহুতে বাহু সংলগ্ন করে প্রবেশ করলো রাজপ্রাসাদে।
সৈন্যরা এরজের দিকে চেয়ে ভাবলো,
সত্যিই এমন লোক তাজ ও তখ্‌তের যোগ্য।
তার দর্শনে তাদের অস্বস্তিকর চিত্তে ফিরে এলো এক স্বাচ্ছন্দ্য,
এবং হৃদয় পূর্ণ হোল এক অপার্থিব করুণায়।
দলে দলে সৈনিকরা হেথায় হোথায় দাঁড়িয়ে
এরজের কথা অস্ফুট কণ্ঠে বলাবলি করতে লাগলো।
বললো, ইনি সর্বতোভাবে সম্রাট পদের যোগ্য ;
ইনি ছাড়া আর কারো শিরে শাহী মুকুট শোভা পায় না।
স্থল্‌ম অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করে সৈনিকদের এই কীর্তিকলাপ
দেখতে পেলো,
এবং তাতে ভারী হয়ে উঠলো তার মস্তিষ্ক।
সে সজ্জিত চন্দ্রাতপের নীচে থেকে বাইরে বেরিয়ে এলো—
হৃদয়ে তার শোণিত ঝরছে, ললাট কুঞ্চিত হয়েছে দুর্ভাবনায়।
তারপর সেও তূর আসর ছেড়ে
অন্তঃপুরে এসে বসলো।
রাজধানীর সকল দ্বার-বাতায়নে
আলোচনা চলছে রাজা, রাজ্য ও রাজমুকুটের উপর।
স্থল্‌ম তূরক বললো,
দেখ, সৈন্যরা আজ কেমন দলে দলে বিভক্ত হয়েছে!
তারা কি বিচ্যুত হয়ে পড়েছে তাদের স্ব স্ব পথ থেকে ?
তুমি কি তাদের দিকে লক্ষ্য করে দেখনি ?
কত লোক পথ দিয়ে যাচ্ছে,
কিন্তু একটি দৃষ্টিও এরজের মুখের উপর থেকে সরে যাচ্ছে না
আমি কতই না ফন্দি এঁটেছিলাম,
কেউ যেন তার মুখের দিকে না চায়।
এরা যদি তার জনপ্রিয়তা ও মাহাত্ম্য এইভাবে অবলোকন করে,

তবে অচিরেই এক আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠবে তাদের মধ্যে।
দুই রাজার সৈন্যদলই তার আনুগত্যের জন্য
সরে দাঁড়াবে তাদের প্রভুদের পাশ থেকে।
এরজের আগমনের ফলে আমার হৃদয় অন্ধকারে ছেয়ে গেছে,
আশঙ্কার পব আশঙ্কাই বেড়ে চলছে আমার অন্তরে।
দুই রাজ্যের সৈন্যদলের দিকেই আমি লক্ষ্য করে দেখেছি,
তাবা যেন তাকে ছাড়া আর কাউকে বাদশা বলে গণ্যই করছে না।
যদি তার মূলোচ্ছেদ এখুনি না করা হয়
এবং এই উচ্চাসন থেকে তাকে মাটিতে নামিয়ে আনা না যায়,
তবে সৈন্যদল আমাদেবই বিরুদ্ধে উত্থিত হবে,
এবং রাতারাতিই আয়োজন কবে ফেলবে এক অভ্যুত্থানেব।

ভাইদের হাতে এরজের নিধন

সূর্যের মুখের উপর থেকে যবনিকা উঠে গেলে
পূর্ব দিকে উদিত হোল এক স্বপ্নময় আলো।
দুই অপদার্থই সেমুহূর্তে কর্মচঞ্চল হয়ে উঠলো,
এবং চোখ থেকে ধুয়ে মুছে নিলো সমস্ত লজ্জা।
সাপের মতো ফণা উদ্যত করে তারা নির্গত হোল,
এবং এরজ যে শিবিরে রাত্রি যাপন করেছে তার দিকে
মুখ করলো।

এরজ তখন ঘুম থেকে উঠে পথের দিকে চেয়েছিল,
ভাইদের আসতে দেখে অত্যন্ত খুশি হয়ে সে দৌড়ে গেল তাদের কাছে।
তারপর একথা-ওকথা বলতে বলতে
তাদেরকে নিয়ে ফিরে এলো শিবির-মধ্যে।
এই সময় তূর তাকে বললো, তুমি যদি নিজেকে
আমাদের কনিষ্ঠ বলেই মনে করো

তবে কেন এই রাজমুকুট মাথার উপর তুলে নিয়েছ?
তোমার জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে ইরান ও কেয়ানী সিংহাসন,
আর আমাকে বেঁধে দেওয়া হয়েছে তুর্কিস্তানের সিংহদ্বারের সঙ্গে।
আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পরানো হয়েছে পশ্চিমের হাতকড়ি,
আর স্থাপন করা হয়েছে তোমার শিরে মাহাত্ম্য এবং পদতলে বিছিয়ে
দেওয়া হয়েছে স্বর্ণ-সম্পদ।

বাদশা এমনই বদান্যতা প্রদর্শন করেছেন যে,
তাঁর সমস্ত দান নিঃশেষিত হয়েছে একমাত্র কনিষ্ঠ পুত্রের উপরে।

তূরের মুখে এই কথা শুনে

এরজ সুন্দর এক প্রত্যুত্তর উপস্থাপিত করলো;

বললো, ওগো যশঃ-সন্ধানী মহাত্মন,

আপনি যদি সন্তুষ্ট হন ও আপনার হৃদয় যদি শান্তি বোধ করে,

তবে চাই না আমি কেয়ানী তাজ কিংবা রাজ্য,

চাই না যশঃ এবং ইরানীয় সৈন্যবাহিনী।

ইরানে আমার প্রয়োজন নেই, চীন কিংবা পশ্চিমাঞ্চলও

নয় আমার কাম্য,-

বাদশাহী কিংবা প্রান্তর-শোভিত ধরণীতেও

[illegible] কোন আগ্রহ নেই।

যে-গৌরবের পরিণতিতে আছে [illegible]র,

তেমন গৌরব থেকে পলায়নই আমার কাম্য।

এই উন্নত আকাশ মাথার উপরে রাজচ্ছত্র ধরলেও

পরিণামে দেখা দিবে মৃত্তিকায় শয়ন।

আমার ইরানীয় সিংহাসনও একদিন লয়প্রাপ্ত হবে,

তাই এখনই আমি তাকে বিদায় জানাতে প্রস্তুত আছি।

আমার মুকুট ও অঙ্গুরীয় আমি আপনাদের হাতে সমর্পণ করছি,

আমার প্রতি আপনারা আর শত্রুভাব পোষণ করবেন না।

আপনাদের সঙ্গে আমার কোন সংগ্রাম কিংবা কলহ নেই,

আমার প্রতি কোন ঈর্ষা আপনারা রাখবেন না

আপনাদের মনে দুঃখ দিয়ে দীর্ঘজীবন আমি কামনা করি না,

যদি আমার দূরত্ব আপনারা কামনা করেন তবে তাও আমি

করতে সম্মত আছি।

বিনয় ছাড়া আমার আর কোন রীতি নেই,

মনুষত্ব ছাড়া নেই আমার আর কোন ধর্ম।

তূর আদ্যন্ত সবকথা শুনলো,
কিন্তু কোন কথারই কোন জবাব সে দিলো না।
এরজের একটি কথাও মনঃপূত হোল না তার,
কোন রকম সন্ধি কিংবা মিটমাটের চিন্তাই সে করতে পারল না।
শুধু ক্রোধান্বিত মনোভাব নিয়ে সে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো,
ও অত্যন্ত অশান্তভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলো।

তারপর সহসা ঘুরে দাঁড়িয়ে
অতর্কিতে চেপে ধরলো গুরুভার স্বর্ণ-আসন
ও তা দিয়ে আঘাত করলো এরজের মস্তকে,
এরজ তখন তার কাছে প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে বললো—
আপনার প্রাণে কি খোদার ভয় নেই,
কোন লজ্জায় আপনি পিতার কাছে মুখ দেখাবেন, নিজের
বিবেককেই কি বলবেন ?

আমাকে হত্যা না করে আমার প্রাণের বিনিময়ে
কালের করুণা লাভ করে সুখে জীবন যাপন করুন।
নিজেকে ভ্রাতৃহন্তার পর্যায়ভুক্ত করবেন না
এর ফলে আমার সিংহাসন আপনার লভ্য হবে না.
তার চেয়ে আনন্দ ও সাহচর্যের স্বাদ উপভোগ করুন,
জীবনধারী হয়ে জীবনের সন্তুষ্টি বিধানে তৎপর হউন।
যে জ্ঞানী সে একটি পিপীলিকাকেও কষ্ট দেয় না,
আপনি জীবনের অধিকারী জীবনেরই প্রশংসা উচ্চারণ করুন।
আমি আজ থেকে দুনিয়ার নির্জন কোন স্থান খুঁজে নিব,
এবং চেষ্টা করবো যাতে দূর হয় আপনাদের মনোকষ্ট।
ভায়ের রক্তে হস্ত প্রক্ষালনের জন্য কেন উদ্যত হয়েছেন !
কেন বৃদ্ধ পিতার অন্তরে প্রজ্বলিত করতে চাইছেন
শোকের আগুন ?

যদি দুনিয়াই আকাঙ্ক্ষা করে থাকেন তবে তাই গ্রহণ করুন, শোণিতপাত
থেকে বিরত হোন,

সর্বজয়ী বিশ্বপ্রভুর সঙ্গে সংগ্রামে অবতীর্ণ হবেন না।
এরজের এত কথার কোন উত্তর সে দিল না,
শুধু অন্তর পরিপূর্ণ করলো ক্রোধে ও মস্তিষ্ক গর্বোদ্ধত
বাসনা-রাজিতে।

তারপর পদাচ্ছাদনী থেকে উন্মুক্ত করলো এক উজ্জ্বল খঞ্জর
এবং স্বীয় উত্তরীয় শোণিতে অনুরঞ্জিত করলো।
সেই বিষাক্ত খরশান অস্ত্রে
মুহূর্তমধ্যে সে বিদীর্ণ করে দিলো কেয়ানী বক্ষঃ।
এইভাবে উন্নত দেবদারু সদৃশ রাজ-ব্যক্তিত্বকে খর্ব করে
সে তার বুকের উপর থেকে নেমে দাঁড়ালো।
এরজের বুক থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এসে
ভিজিয়ে দিতে লাগলো তার যৌবন-ফুল্ল সুন্দর মুখমণ্ডল।
তারপর সেই নৃশংস হন্তা রাজার দেহ থেকে
মস্তক বিচ্ছিন্ন করে তার কাজ শেষ করলো।

হায়রে দুনিয়া, যাকে তুমি বুকে করে লালন করেছিলে,
আজ তার প্রাণটুকু রক্ষা করতেও অপারগ হলে,
জানি না কে তোমার বন্ধু ?—এই রহস্য
কোন দিন তুমি উন্মোচিত করলে না !

এদিকে এরজের মস্তক কস্তুরী ও অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্যে সিক্ত করে
রাজ্যদানকারী বৃদ্ধ বাদশার সমীপে পাঠিয়ে দেওয়া হোল।
তাঁকে বলে পাঠান হোল, এই আপনার প্রিয়জনের শির,

ইচ্ছা হয় আবার তাতে পরিয়ে দিন মাহাত্ম্যের রাজমুকুট।
এই সেই ছায়াদানকারী কেয়ানী বৃক্ষ,
অভিলাষ হয় আবার তাকে দান করুন তাজ এবং তখ্‌ত।
তারপর দুই পাষাণ-হৃদয় মূর্তিমান অকল্যাণ—
একজন চীনের ও অন্যজন রোমের পথ ধরলো।

ফারেদুন কর্তৃক এরজের হত্যার সংবাদ শ্রবণ

ফারেদুন তাঁর দুচোখ পেতে রেখেছেন পথেব উপর,
সৈন্যদল বাদশার[১] প্রত্যাগমনের প্রহর গুনছে।
সময় যাচ্ছে, এখনও বাদশা ফিরে আসছেন না,
পিতাব মনে কত কি ভাবনা!
তিনি বাদশার জন্য প্রস্তুত কবে রেখেছেন তাঁব বিজয়ী সিংহাসন,
মুকুটে গেঁথে রেখেছেন মণিমুক্তা।
প্রত্যুদগমনের সকল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে রাখা হয়েছে,
সুবা ও পানীয় প্রস্তুত, গায়কদল সমাগত।
বাদ্যকবগণ দুন্দুভিসকল হস্তিপৃষ্ঠে বাঁধছে,
ও সমস্ত নগরী সজ্জিত হয়েছে উৎসব-সাজে।
এমন সময় ফারেদুন ও সৈন্যদল দেখতে পেলো
পথে এক কৃষ্ণবর্ণ ধূলিমেঘের উদয় হয়েছে।
তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে এক উটের কাফেলা
তাব আরোহিগণ সবাই বিষণ্ণ ও শোকাচ্ছাদিত।
তারপর সেই শোকাকুল যাত্রীদের মধ্যে উত্থিত হোল ক্রন্দন-ধ্বনি,
এবং তাদের মধ্যে দেখা দিল এক সুবর্ণ-মণ্ডিত শবাধার।
মূল্যবান কৌশিক বস্ত্রে আচ্ছাদিত সেই শবাধারের মধ্যেই
রক্ষিত আছে এরজের শির।
বিলাপ ও আহাজারির সঙ্গে পুণ্যাত্মা বাহক
ফারেদুনের সমীপবর্তী হোল।
শবাধারের ডালা উত্তোলন করার পর

১ এরজই তখন ইরানের বাদশা।

সকলে বুঝতে পারলো বাহকের বিলাপের কারণ।
তারপর কৌশিক আচ্ছাদনী সরিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে
প্রকাশ হয়ে পড়লো এরজের কর্তিত মস্তক।
এই দৃশ্য দেখে ফারেদূন লুটিয়ে পড়লেন অশ্বপৃষ্ঠ থেকে মাটিতে,
এবং সৈন্যগণ শোকাবেগে বিদীর্ণ করলো তাদের বক্ষবাস।
সকলের মুখ কৃষ্ণবর্ণ হোল, চোখ হোল সাদা,
কারণ, তারা আর কোন দৃশ্য অবলোকনেরই প্রত্যাশী ছিল।
কিন্তু হায়, রাজা ফিরে এসেছে অন্যভাবে,
সুতরাং তার অভ্যর্থনাও হবে তদনুরূপ।
পতাকা ছিন্ন করা হোল, দুন্দুভি নিনাদ হোল মন্দীভূত,
সামন্তগণের মুখমণ্ডল শোকে অন্ধকার হোল।
হস্তিযূথের মুখে এঁকে দেওয়া হোল কালিমা-চিহ্ন,
অশ্বদল বদনে নীলাঞ্জন মেখে প্রয়াণপর হোল।
সেনাপতি ও সেনাদল পদব্রজে
মাথায় ধূলিমাটি মেখে নেমে এলো।
বীরগণ শোকে উত্থিত করলো বিলাপের রোল
এবং দুঃখে দংশন করতে লাগলো নিজেদেরই বাহুদেশ।
ওগো, কালের কাছে কখনো করুণা প্রত্যাশা করো না,
বাঁকা ধনুক কারো প্রত্যাশায় ঋজু কোনদিন হয় না।
আমাদের মস্তকের উপর আকাশ এমনভাবে ঘূর্ণিত হয় যে,
আকাঙ্ক্ষিত জনের মুখ প্রকাশ হওয়া মাত্র সে তাকে
ছিনিয়ে লয়।

তুমি যদি তার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হও তাহলেও
তার মুখ সে দেখাবে

আর যদি প্রত্যাশী হও তার বন্ধুত্বের তবে সে বঞ্চিত করবে

তাই, একটি উপদেশ আমি তোমাকে দিব যদি তা গ্রহণ করো,
ডুনিয়ার সৌজন্য-প্রত্যাশা থেকে প্রক্ষালন করো তোমার হাত।

শোকাকুল বাদশা পরম পরিতাপের সঙ্গে
এরজের উপবনের দিকে মুখ করলেন।
আহা, একদিন যেখানে রাজন্যবর্গের আসর বসতো,
তার আয়োজন হোত উৎসবের.
আজ ফারেদন যুবক পুত্রের মস্তক বুকে ধারণ করে
কাঁদতে কাঁদতে সেই উপবনে প্রবেশ করলেন।
সেখানে দেখলেন, তেমনি ঠায় দাঁড়িয়ে আছে রাজাসন,
আহা, রাজাশূন্য সে আসন আজ অমাবস্যার অন্ধকার।
ঐ রাজকীয় কেলি সরোবর, ঐ সবল উন্নত দেবদারু,
ঐ পাপড়ি ঝরানো গোলাপ তরু, ঐ গন্ধ ছড়ানো বেতসকুঞ্জ।
বাদশা ছুঁড়ে দিলেন ধূলি মুষ্টি আসনের দিকে,
সৈনিকদের ক্রন্দনধ্বনিতে বিদীর্ণ হোল আকাশমণ্ডল।
অন্তঃপুর থেকে নির্গত হোল ক্রন্দন. চুল ছিঁড়তে লাগলো সকলে
ঝরে পড়লো অশ্রুর ধারা, বিষণ্ণ হোল চরাচর।
বাদশা তাঁর কোমরে জড়ালেন রক্তমাখা উপবীত;
এবং তাঁর আসনের উপর ছাড়িয়ে দিলেন জ্বলন্ত অঙ্গার।
ফুলবন পরিম্লান হোল, শুকিয়ে গেল সতেজ দেবদারু,
সারা ডুনিয়ার সৌন্দর্য-পিয়াসী চোখের তারা যেন সহসা মুদে এলো।
ফারেদুন এরজের মস্তক বুকে নিয়ে
বিশ্বপ্রভুর দিকে মুখ তুলে বললেন,
হে প্রতিদানের প্রভু—বিশ্বচরাচরের শাসনকর্তা,
এই নির্দোষ হতজনের দিকে চেয়ে দেখ!

তার শির কর্তিত করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে আমার কাছে,
এবং তার দেহকে করা হয়েছে ছিন্নভিন্ন।
হে প্রভু, সেই দুই নিষ্ঠুরের প্রাণে দান কর তুমি এমন জ্বালা—
যাতে জীবনে তারা কুদিন ছাড়া সুদিনের মুখ দেখতে না পায়।
প্রভু, তুমি তাদের হৃদয়কে লাঞ্ছিত কর দুরারোগ্য ক্ষতচিহ্ন দ্বারা,
যেন ক্ষমা বার্ধক্যের রূপ ধরে আসে তাদের সামনে।
ওগো বিশ্বচরাচরের একচ্ছত্র শাসনকর্তা,
আমাকে তুমি দান করো আরো কয়েকটি দিনের অবসর—
যেন আমি এরজের বংশোদ্ভূত কোন মহামতিকে
পিতৃ প্রতিশোধে কোমর বাঁধতে দেখে যেতে পারি।
যেন এই নির্দোষ জনকে যে-ভাবে তারা মস্তকহীন করেছে
তেমনিভাবে সে-ও করতে পারে তাদের শিরচ্ছেদ।
এই দৃশ্য দেখার পরই আমার সকল তৃষ্ণার অবসান হবে,
আমি তখন সমান মনে করতে পারবো প্রাসাদ এবং মৃত্তিকা উভয়কে।
এইভাবে কাঁদতে কাঁদতে ফারেদুন পুত্রকে বুকে নিয়ে
সমাধি সমীপে এসে উপস্থিত হোলেন।
পুত্রের জন্য প্রস্তুত করলেন মাটির শয়ন ও সিথান,
তারপর সেই নয়নের আলোকে চিরদিনের জন্য আড়াল করে দিলেন
চোখের সামনে থেকে।

বললেন, হে যুবক বীর,
কোন মুকুটধারীর মৃত্যুই
তোমার মৃত্যুর মতো এমন করুণ নয়।
শয়তানরা কি নিষ্ঠুরভাবে বিচ্ছিন্ন করেছে তোমার শির,
দেহকে তোমার সঁপে দিয়েছে বাঘের মুখে।
এই বলে আবার কাঁদতে লাগলেন—ঝরাতে লাগলেন দরবিগলিত অশ্রুর ধারা
তাঁর বিলাপে হরিণাদি চতুষ্পদের চোখ থেকেও উঠে গেল নিদ্রা।

রাজ্যের আবাল-বৃদ্ধ নরনারী
নিজ নিজ ঘরে জটলা করে বসলো;
তারা নিজেদের বসন রাঙালো নীল ও কালো রঙে।
নিজেদের বাদশার বিয়োগ-ব্যথায় তারা নিমজ্জিত করলো তাদের
আপাদ-মস্তক।

কি অমূল্য মণিই না তাদের হারিয়ে গেছে,
যার জন্য তাদের জীবন আজ হয়ে উঠেছে এমন বিষময়।

এরজের কন্যার জন্ম-বৃত্তান্ত

কিছুদিন গত হলে
ফারেদূন এরজের মহলের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন।
একটি একটি করে তিনি মহলের কক্ষগুলো ঘুরে দেখতে লাগলেন,—
এরজের পরে সেখানকার সুন্দরীদের কি অবস্থা হয়েছে তা পরখ করার
জন্যে।

হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়লো এক পরমা সুন্দরী নারীর উপর,
নাম তার মাহ্‌আফরীদ।
এই মহিলা এরজের খুবই প্রিয় ছিল.
ভাগ্য তাকে তারই দ্বারা গর্ভবতী করে রেখেছিল।
পরীসদৃশ এই সুন্দরীকে অন্তঃস্বত্তা দেখে
বাদশার হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হোল।
তাঁর অন্তরের দিগ্দেশে উদিত হোল আশার আলো,
তিনি যেন পুত্রের মৃত্যুর প্রতিশোধবাহী এক শুভ সন্দেশবাণী শুনতে
পেলেন।

কিছুদিন পরেই সন্তান-জন্মের লগ্ন উপস্থিত হোল,
দেখা গেল, মাহ্‌আফরীদ এক কন্যার জন্ম দিয়েছে।
এতে বাদশার দীর্ঘ আশার সূত্র কিছুটা খর্ব হোলেও
অত্যন্ত আদর-যত্নের সঙ্গেই তিনি তার লালন-পালনের ব্যবস্থা করলেন।
সারা দুনিয়া তার পরিচর্চায় নিযুক্ত হোল,
তার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাদশার স্নেহও বেড়ে চললো চন্দ্রকলার
মতো।

সে হলো পিতামহের বুকে শোকের সান্ত্বনা—

তাঁর চোখে পুত্রের স্মৃতির মহত্তম অবলম্বন।
এই লালাফুল-সদৃশ সৌন্দর্যময়ীর মধ্যে বাদশা দেখতেন
এরজের‍ই অবিকল প্রতিমূর্তি।
দেখতে দেখতে তার সারা অঙ্গে ছেয়ে এলো যৌবনের সমারোহ,
তার মুখমণ্ডল পূর্ণ হোল উজ্জ্বল পারবীন তারার মতো—কেশদাম
হোল ভ্রমর-বৃ

পিতামহ আর বিলম্ব না করে
তাকে পিশঙ্গের সঙ্গে বিয়ে দিলেন।
পিশঙ্গ ছিল তাঁরই এক ভাইয়ের পুত্র—
আভিজাত্য-গৌরবেব অধিকারী ও স্বভাবে মুক্তাতুল্য।
তার বংশ-সূত্র বাদশা জামশেদের সঙ্গে যুক্ত,
সে রাজ্য ও তাজ-তখ্‌তের যোগ্যতার অধিকারী।
ফারেদুন এমনি যোগ্য বরের হাতে নাতনীকে দান করলেন;
আনন্দের সঙ্গে নব-দম্পতির সময় অতিবাহিত হতে লাগলো।

মাতৃগর্ভ থেকে মনূচেহ্‌রের জন্ম

নীল আকাশে নয়টি পূর্ণ চাঁদের আবর্তন সমাপ্ত হলে
আনন্দের দিন এলো।
সেই বুদ্ধিমতী রাজকন্যা এক পুত্রের জন্ম দিলো—
তাজ ও তখ্‌তের যোগ্য সমস্ত সুলক্ষণের অধিকারী।
মাতৃগর্ভ থেকে জাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই
দূত দৌড়ে গেল বাদশার সমীপে—
তাঁকে গিয়ে বললো, হে মুকুটধারী, আসুন
এসে একবার এরজের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করুন।
সংবাদ-শ্রবণে রাজ্যদানকারী বাদশার ওষ্ঠাধরে হাসি ফুটে উঠলো,
তাঁর বিশ্বাস হলো, এরজ আবার নব-জন্ম লাভ করেছে।
শিশুকে বুকে নিয়ে বাদশা
বিশ্বপ্রভুর দিকে মুখ করে বললেন,
হে প্রভু, তুমি আমাকে দান কর এমন দৃষ্টি,
যেন আমি তার উপর ভবিষ্যৎ আনুকূল্যের লক্ষণসমূহ প্রত্যক্ষ করতে পারি।

বিশ্বপ্রভু তাঁর প্রার্থনা গ্রহণ করলেন,
ও তাঁকে দান করলেন দৃষ্টি।
ফারেদুন দেখলেন বিশ্ব উজ্জ্বলিত হয়েছে স্বর্গীয় প্রভায়,
তিনি দৃষ্টি ফিরালেন নবজাতকের প্রতি।
তারপর বললেন, শুভ হোক এই উজ্জ্বল দিন,
আমাদের শত্রুদের অন্তর হোক পরিম্লান!
বাদশার আদেশে মূল্যবান সুরাপাত্র ও উজ্জ্বল সুরা আনিত হোল,

বাদশা নবজাতকের নাম রাখলেন মনুচেহর।
বললেন, পুণ্যশীল পিতামাতার বক্ষ: থেকে উদ্‌গত
এই শিশু বৃক্ষ পল্লবিত ও ফুল্ল হোক!
তার পরিচর্যার ব্যবস্থা হোল এমনি নিখুঁত যে,
মুক্ত বাতাস তার উপব দিয়ে শান্ত হয়ে বইলো।
পূজনীয় প্রতিমাব মতো সে বুকে বুকে বিচরণ করতে লাগলো
তার পদতল স্পর্শ করলো না মৃত্তিকার মালিন্য।
কস্তুরী ও সুগন্ধী অম্বব ছড়িয়ে দেওয়া হোল তার চলার পথে,
কারুখচিত রাজছত্র তুলে ধরা হোল তার মাথার উপরে।
এইভাবে অতিক্রান্ত হয়ে গেল কয়েকটি বছর—
নিয়তি-সমর্থিত, সুন্দর ও সুমঙ্গল।
এই সময়ের মধ্যে রাজযোগ্য সকল বিদ্যা
তাকে শিখানো হোল।
বাদশা দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখলেন,
দুনিয়া আবার তাঁর যশ: কীর্তনে মুখর হয়ে উঠেছে।
পিতামহ তখন তাকে দান করলেন রত্ন সিংহাসন ও গুরুভার প্রহরণ,
দিলেন তাকে নিজের বিজয়ী রাজমুকুট।
সমস্ত মণিগৃহের দ্বার অর্গলমুক্ত করে দিলেন,
যাতে রয়েছে মূল্যবান আসন, বর্ম, মুকুট ও কোমরবন্ধসমূহ।
প্রাসাদের দ্বার-সজ্জা রূপী বিচিত্র বর্ণের কিংখাব-যবনিকা,
ব্যাঘ্রচর্ম বিখচিত শিবিরসমূহ,
সুবর্ণ ঝালর সমন্বিত অশ্ব-সজ্জা,
স্বর্ণ কোষযুক্ত হিন্দুস্তানী তলোয়ার;
তুর্কীস্তানী সাঁজোয়া, রোমদেশীয় বর্ম—
সব বের করে আনা হোল।
তুরানের অন্তর্গত চাচ প্রদেশের সুবিখ্যাত তীর-ধনু ও তূণীর,

চীনের ঢাল ও বর্শা—
সমস্ত সম্পদ এনে
স্তূপীকৃত করা হোল।
বাদশা দেখলেন, এগুলো মনুচেহরেরই যোগ্য;
আরো দেখলেন নিজের অন্তঃকরণকে—সন্তোষ ও করুণায় পরিপূর্ণ।
তিনি মণিগৃহের চাবি ও কুঞ্চিবক্ষক
দুই-ই দান কবলেন তাকে।
তারপর ডাকলেন সৈন্যদলের মধ্য থেকে পাহ্‌লোয়ানগণকে[1]
এবং রাজ্যমধ্য থেকে সামন্তগণকে।
তাদের সবাইকে তিনি জড়ো কবলেন মনুচেহরেব চাবপাশে—
এরা সবাই কুশলী যোদ্ধা ও সমর-পিপাসু।
আনন্দিত মনে তারা যুবরাজকে জানালো তাদেব অভ্যর্থনা,
এবং তাঁর মুকুটে মণি-বৃষ্টি কবলো।
উৎসবের এই নতুন দিনে কার্যকরী হোল নতুন আইন,
মেষদল ও নেকড়ে একত্রিত হোল একই স্থানে।
জোহাকের যুগের যোদ্ধ্‌গণ—
বীর প্রবর কারেন,
সেই খরশান কৃপাণধারী গার্‌শাস্‌প,
সেই বীরবরেণ্য সামনুরীমান,
সেই সুবর্ণ মুকুটধারী কোবাদ—
সকল বিশ্ব রক্ষক বীরবৃন্দই
সারি বেঁধে এসে দাঁড়ালেন
যুবরাজকে দান করা হোল তাঁদের নেতৃত্ব।

১ সেনাপতিগণ। এই অর্থেই রুস্তমকে পাহ্‌লোয়ান বলা হয়। মল্লযোদ্ধা অর্থে পাহ্‌লোয়ান শব্দেব ব্যবহাব পরবর্তী কালের।

মনুচেহের সম্পর্কে সুলম্ ও তূরের অবগতি

সুলম্ ও তূবেব কানে সংবাদ পৌঁছল,
ইরানের শাহী তখ্‌ত আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।
এই সংবাদে তাদের সজাগ মনে ভয়ের সঞ্চার হোল,
তাদের ভাগ্যের নক্ষত্র বুঝি এইবাব অস্তগমনের পথে।
দু'জনই অত্যন্ত চিন্তাকুল মন নিয়ে বসে পড়লো,
চোখের সামনে তাদের যুগের অবসান তাবা দেখতে পাচ্ছে।
সহসা একটি সিদ্ধান্ত তাদের চিন্তায় চমক দিয়ে উঠলো
সঙ্গে সঙ্গে তাদের মুখ থেকে মুছে গেল অস্বস্তির কালিমা।
ফারেদূনের কাছে কোন লোককে পাঠাবার কথা তারা ভাবলো,
ক্ষমা প্রার্থনা ছাড়া অন্য উপায় নেই।
এই ফন্দী এঁটে সারা রাজ্য থেকে বেছে
এক বাক্‌পটু সাহসী লোককে তারা নির্বাচিত করলো।
সেই জ্ঞানী ও সম্ভ্রমশালী লোকের সামনে
নিজেদের সৌজন্য ও প্রীতিমূলক এক লম্বা-চওড়া ভাষণ তারা
দান করলো।

তারপর প্রাচীন রাজকোষ থেকে বের করে আনলো মণিমুক্তাসম্পদ ও
স্বর্ণ-মুকুট,
ও হস্তিযূথকে সজ্জিত করলো।
রথ-যানের উপর তুলে দিল কস্তুরী, চন্দন প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য,
এবং থরে থরে সাজিয়ে দিল তাতে কিংখাব, পট্টবস্ত্র ও স্বর্ণমুদ্রা।
তারপর সেই হস্তিদল ও রথ-যান রং ও গন্ধের সম্ভার নিয়ে
পশ্চিমাঞ্চল থেকে যাত্রা করলো ইরানের অভিমুখে।

দরবারে যারা উপস্থিত ছিল
সহসা তাদের স্মৃতিতে জেগে উঠলো অন্য এক দূতের ছবি
সভাগৃহ শূন্য হলে পরে তারা তাদের মনের কথা
দূতের কাছে বললো।
বললো, ফারেদূনের কাছে পৌঁছাতে হবে এই বাণী,
প্রথমে তারা উচ্চারণ করলো, বিশ্ব-প্রভুর নাম।
তারপর বললো, মহাবীর ফারেদূন চিরজীবী হউন,
বিশ্ব-প্রভু তাঁকেই দান করেছেন শাহী গৌরব বহনের
পরিপূর্ণ যোগ্যতা।

মস্তক তাঁর চির সবুজ ও দেহ অটুট থাকুক,
উন্নত আকাশ সঞ্চারিত করুক তাঁর প্রকৃতিতে চির-উদারতা।
তাঁর দুই দাসের বিনীত আবেদন
শাহিনশাহের দরবারে যাচ্ছে।
দুই অপরাধীর মতো তারা
পিতার সামনে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে অশ্রুর ডালি।
কত অপরাধের কলঙ্কে তাদের হৃদয় অনুতপ্ত,
তাই ক্ষমার পথে আজ তারা অসহায় পথিক।
তাদের মর্মের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে
এমন কেউ কোথাও বর্তমান ছিল না।
জ্ঞানী লোকেরা বলেছেন, অন্যায় যে করে,
শাস্তি তার অবশ্য প্রাপ্য।
বেদনার্ত যেমন প্রতিকারের প্রত্যাশায় দিন গুণে,
হে বাদশা, আমরাও তেমনিভাবে করেছি কালক্ষয়।
প্রথমতঃ, আমাদের নিয়তির লিখন
আমরা খণ্ডাতে পারিনি;
কালান্তক ব্যাঘ্র ও যমদূতাকৃতি আজদাহার

জাল থেকে মুক্তিলাভে আমরা ব্যর্থ হয়েছিলাম।
দ্বিতীয়তঃ, অপবিত্র দৈত্যদের প্ররোচনায়
আমাদের হৃদয় থেকে পলায়ন করেছিল বিশ্ব-প্রভুর ভয়।
তাদের সেই প্ররোচনা আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল,
আমাদের সুচেতনা হয়েছিল তাদের কবলগ্রস্ত।
বাদশাব কাছে ক্ষমা প্রার্থনাব যোগ্যতা আমাদের নেই.
অনুতাপে আমরা সতত নত-দৃষ্টি।
যদিও আমাদের অপরাধ গুরুতর,
তবু অজ্ঞতার অজুহাত নিয়েই আপনার সমীপে উপস্থিত হচ্ছি।
অন্য কাবণ, এই নিয়ত পরিবর্তনশীল আকাশ,
কখনো সে দান করে আশ্রয়—কখনো দেয় দুঃখ।
তৃতীয় কারণ. শয়তান, দুরন্ত অশ্বের মত
সে সর্বদা অনর্থ সৃষ্টিতে তৎপর।
বাদশা যদি স্বীয় অন্তর থেকে দূর করে দেন ক্রোধ,
ও তাঁর হৃদয়ের আলোতে রক্ষা করেন আমাদের প্রার্থনা,
তবে অবিলম্বে মনুচেহেরকে বিপুল সেনাবাহিনী সহ
আমাদের কাছে প্রেরণ করে আমাদের কৃতকৃতার্থ করুন।
আমরা তার সামনে দাসের মতো কৃতাঞ্জলী হয়ে
সর্বদা অবস্থান করবো।
যে বৃক্ষ আমাদের প্রতি শত্রুতা নিয়ে বেড়ে উঠেছে,
চোখের জলে আমরা তার পাদপীঠ ধুয়ে সজল করে দিব।
আমরা সর্বস্থান থেকে খুঁজে আনবো রং ও রূপের সম্ভার,
যাতে বৃদ্ধি পায় তার মাহাত্ম্য ও চিরহরিৎ থাকে
তার রাজ্য, মুকুট ও সিংহাসন।

ফারেদুনের কাছে পুত্রদের সন্দেশ প্রদান

বাণীবাহক দূত হস্তী, স্বর্ণমুদ্রা ও উপঢৌকনসহ
বাদশার দরবারে এসে উপস্থিত হোল।
সুভাষী দূতের অন্তরে গুঞ্জিত হতে লাগলো
বাদশার জন্য আনীত বাণীর সম্ভার।
ফাবেদূনেব কাছে যখন এই সংবাদ পৌঁছলো,
তখন তিনি শাহী তখ্‌ত
রোম-দেশীয় কিংখাব দ্বারা সজ্জিত করার,
ও কেয়ানী তাজ প্রস্তুত কবে বাখার আদেশ দিলেন।
তাবপর বিজয়ী বাদশা বসলেন তাঁব সিংহাসনে,
যেন উন্নত দেবদারুর মাথায় শোভা পেল জ্যোতির্ময় চন্দ্রমণ্ডল।
মুকুট, কণ্ঠমালা ও অন্যান্য রাজযোগ্য আভরণ
তিনি তুলে নিলেন অঙ্গে।
পাশে বসালেন ভাগ্যবান মনুচেহেরকে,
এবং তার শিরে তুলে দিলেন বাজমুকুট।
দুই সারিতে শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হোল সামন্তবর্গ,
তাদের সারা অঙ্গে সুবর্ণ-খচিত পরিধেয়।
দরবার কক্ষের ছাদ ও স্তম্ভসমূহ স্বর্ণমণ্ডিত--
সর্বত্র যেন বিকীর্ণ হচ্ছে সূর্যের আলো।
একদিকে শৃঙ্খলিত রয়েছে সিংহ ও ব্যাঘ্র,
অন্যদিকে মদমত্ত করীদল।
এই সময় বীরপ্রবর শাপূর সুল্‌মের দূতকে নিয়ে
প্রাসাদে প্রবেশ করলো।
দূত বাদশার দরবারের এই আড়ম্বর দেখে
অভিভূত অন্তরে পদব্রজে দ্রুত ধাবিত হোল সিংহাসনের দিকে।

ফারেদুনের সমীপবর্তী হয়ে
সে তাঁর মুকুট-চূড়া ও উন্নত সিংহাসনের দিকে দৃষ্টিপাত করলো।
সঙ্গে সঙ্গে তার দৃষ্টি নেমে এলো উপর থেকে নীচের দিকে,
এবং আনত হয়ে সে চুম্বন করলো মৃত্তিকা।
ধরণীর অধীশ্বর মহান বাদশা তখন
তাঁর উন্নত স্বর্ণাসন থেকে দূতকে বসবার অনুমতি দিলেন।
দূত উচ্চারণ করলো বাদশার গুণগ্রাম,
বললো, হে তাজ, তখ্‌ত ও অঙ্গুরীয়ের শোভাদানকারী,
আপনার সিংহাসনের পদস্পর্শে ধরণী হয়েছে উজ্জ্বলিত,
আপনার সৌভাগ্যের সম্পদে কাল হয়েছে উৎফুল্ল।
আমরা সবাই আপনার পদধূলির তুল্য,
আমরা সবাই প্রাণ পাচ্ছি আপনার অনুগ্রহ থেকে।
এইভাবে গুণকীর্তন দ্বারা বাদশার মনোরঞ্জন করে
দূত তাঁর সামনে বিছিয়ে দিলো বাৎসল্যের উত্তরীয়।
তারপর সতর্ক দূত তার রসনা উন্মুক্ত করে
বাদশার মনোযোগ আকর্ষণ করলো।
বর্ণনা করলো দুই হন্তার বাণী,
সরলভাবে প্রকট করলো তাদের অভিপ্রায়।
বললো, তাঁরা তাঁদের অপরাধের মার্জনা ভিক্ষা করে
মনুচেহেরকে তাঁদের কাছে পাওয়ার ঐকান্তিক কামনা ব্যক্ত করেছেন।
দাসের মতো কৃতাঞ্জলী হয়ে তাঁরা মনুচেহেরের সামনে অবস্থান করবেন,
এবং তাঁকেই দান করবেন রাজমুকুট ও রাজসিংহাসন।
মনুচেহেরকে পিতৃ-শোণিতের মূল্যরূপে দান করবেন
রাজ্য, সম্পদ, স্বর্ণ-মুদ্রা ও সকল বিত্ত।
দূত এইভাবে তার কাজ সমাপন করে
জবাবের প্রত্যাশী হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো।

পুত্রদের প্রতি ফারেদুনের প্রত্যুত্তর

বাদশা তাঁর দুই অপবিত্র পুত্রের
অভিপ্রায় শ্রবণের পর
জ্ঞানী দূতকে সম্বোধন করে বললেন,
সূর্য কখনো নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারে না।
এই দুই অপবিত্র ব্যক্তির মনের কথা
সূর্যের চেয়েও অধিকতর প্রকটিত হয়েছে আমার কাছে।
তুমি যা বললে সব আমি মনোযোগ দিয়ে শুনেছি,
এখন তুমি শুনে নাও আমার প্রত্যুত্তর।
সেই দুই নির্লজ্জ কলুষ-অন্তর নরাধমকে বলো,
বলো সেই অকৃতজ্ঞ উদ্ধতদেরকে—
কলুষিত বাণীর কোন মূল্য নেই,
তা দিয়ে দুনিয়ায় কিছুই কেনা যায় না।
মনুচেহেরের প্রতি তোমাদের যে-স্নেহ উদ্বেল হয়ে উঠেছে,
এরজের বেলায় কোথায় তা ছিল ?
তোমাদের সেই পাশব আকাঙ্ক্ষা আজো লুকিয়ে আছে,
যার বশবর্তী হয়ে তোমরা তার মস্তক পুরে দিয়েছিলে এক সঙ্কীর্ণ
শবাধারের মধ্যে।

যেভাবে তোমরা দুনিয়াকে এরজ-শূন্য করেছিলে,
আজ মনুচেহেরের রক্তে তারই পুনরাবৃত্তি করতে চাইছ।
কিন্তু মনে রেখো, কেবল লৌহ-শিরস্ত্রাণধারী
প্রবল সৈন্যবাহিনীর মধ্যেই তোমরা তার সাক্ষাৎ পাবে।

তোমরা তাকে দেখবে ভীমতম প্রহরণধারীদের সঙ্গে কাওয়ানী
নিশানের ছত্র-ছায়ায়,—
তাকে দেখবে, যখন তার অগণিত অশ্ব-খুরে বেদনা-নীল
হয়েছে ধরিত্রী, তখন।
তার সঙ্গে থাকবে কারেনের মতো সংগ্রামী সেনাপতি
সৈন্যদলের রক্ষক বীর-প্রবর শাপূর ও নস্তোহ্,
একদিকে থাকবে মহাবীর শেদ্ওশ্
অন্যদিকে সিংহ-বিক্রম শিরোয়া।
আরও থাকবে, সৈন্য দলের পরামর্শদাতা
মহাসামন্ত তলীমান ও য়মনের নরপতি সর্ও।
এরজের শোণিত প্রতিশোধের সঙ্কল্প নিয়ে যে বৃক্ষ মাথা তুলেছে,
সে তা'র অঙ্গ ধৌত করবে শত্রুরই শোণিত-সিঞ্চনে।
দীর্ঘদিনের সেই শত্রুতা কেউ কি ভুলতে পারে কখনো?
কালের বাঁকা পিঠ তো আমরা সোজা হ'তে দেখিনি কোনদিন!
নিজের সন্তানের স'ঙ্গ যুদ্ধ কি আমার কাছে সুখের বলে মনে হতে পারে?
শত্রু ছেদন করেছিল যে-বৃক্ষ,
গজিয়েছে তাতেই নতুন প্রশাখা এবং আজ তা' অবনত হয়েছে
ফুল ও ফলভারে।

মনুচেহের আজ ক্রুদ্ধ সিংহের মতো
পিতৃ-প্রতিশোধে কোমর বেঁধেছে;
তার সঙ্গে রয়েছে যশস্বী সেনাপতিগণ —
রয়েছেন সামনুরীমান ও গর্শাস্পের মতো মহাবীরগণ।
তার সৈন্যদল এক পাহাড়ের পাদদেশ থেকে
অন্য পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে,
তাদের পদভারে দলিত হচ্ছে ধরণীতল।
অথচ তোমরা বলছ যে, বাদশা যেন
অন্তর থেকে মুছে ফেলে দেন শত্রুতার সকল চিহ্ন।

কিন্তু আজ অবস্থা দাঁড়িয়েছে অনুরূপ : আকাশের আবর্তনে
সর্বত্র ছেয়েছে অন্ধকার — তলিয়ে গেছে তাতে দয়া আর অনুগ্রহ।
আমরা শুনেছি, অসহিষ্ণুর উপর ক্ষমা
অনুচিত ও অর্থহীন।
কারণ, অত্যাচারের বীজ যে বপন করেছে,
সে দেখবে না শান্ত দিন, পাবে না আনন্দিত নন্দন-কানন।
বিশ্বপ্রভুর অনুগ্রহ লাভ যদি তোমাদের ভাগ্যে থাকতো,
তবে ভ্রাতৃরক্তে অনুরঞ্জিত করতে না তোমরা তোমাদের হাত।
বুদ্ধি যার আছে সে তেমন অপরাধই করবে
যা ক্ষমার যোগ্য।
তোমরা প্রদর্শন করেছ নির্লজ্জতার পরাকাষ্ঠা,
অন্তরে ঈর্ষার বিষ গোপন রেখে প্রকাশ করেছ বিনয়-বাণী।
এর বিনিময় তোমরা বিশ্বপ্রভুর কাছ থেকে
লাভ করবে উভয় লোকে।
তোমরা পাঠিয়েছ উজ্জ্বল তখ্‌ত,
পাঠিয়েছ মদমত্ত করী ও স্বর্ণ মুকুট ;
আশা করেছ এই বিচিত্র উপঢৌকন পেয়ে
আমরা ভুলে যাব শত্রুতা ও ধুয়ে ফেলবো রক্তচিহ্ন!
মুকুটধারীর শির বিক্রী করে দেব সোনার বদলে,
ফলে না থাকবে তাজ না থাকবে তখ্‌ত!
কে বলেছে যে, মহামূল্য পুত্রকে পিতা স্বর্ণমূল্যে বিক্রী করে দিয়েছেন!
কাজেই এই উপহার আমার জন্য নয় —
ফিরিয়ে নিয়ে যাও তুমি এসব।
তোমার বার্তা আমি শুনেছি, আমার বার্তা তুমি শুনলে,
এখন এই বার্তা নিয়ে অবিলম্বে তুমি প্রত্যাবর্তন কর।
দূত এই ভয়ানক বার্তা শুনে
ও মনুচেহেরকে রাজাসনে উপবিষ্ট দেখে

ভয়ে কম্পিত-কায় হোল, ও অবিলম্বে স্থান ত্যাগ করে
অশ্ব-পৃষ্ঠে প্রয়াণপর হোল।
তার সারা অস্তিত্বে সেই পুরুষ প্রবরের
যৌবন-দীপ্ত প্রভাবের ক্রিয়া অনুরণিত হতে লাগলো।
সে দেখতে পেলো, সুলম ও তূরের উপর
ঘূর্ণিত হচ্ছে গগনচক্র।
দুরন্ত বাতাসের গতিতে সে এগিয়ে চললো—
তার মস্তিষ্কে আছড়ে পড়ছে বাদশার প্রত্যুত্তর
ও অন্তর পরিপূর্ণ হচ্ছে দুশ্চিন্তায়।

ক্রমে সে এসে উপস্থিত হোল পশ্চিমের অঞ্চলে,
এবং প্রান্তর উপত্যকার উপর দিয়ে চেয়ে দেখলো অদূরে রাজপ্রাসাদ।
দেখতে দেখতে সে প্রাসাদের দ্বারদেশে প্রলম্বিত
যবনিকার পাশে এসে দাঁড়ালো,

এই যবনিকারই অন্তরালে অবস্থান করছেন পশ্চিমের অধিপতি।
সেখানে রেশমী বস্ত্রে সজ্জিত করা হয়েছে এক পট্টাবাস,
এবং তাতে খচিত করা হয়েছে সোনালী নক্ষত্র।
দুই রাজ্যের দুই বাদশা আসন গ্রহণ করেছেন সেই শিবিরে,
তাঁরা বলাবলি করছেন দূত ইরান থেকে ফিরে এসেছে।
এমন সময় এক সেনাপতি দূতকে নিয়ে
দরবারে উপস্থিত হোল।
দূতের জন্য পূর্বেই নতুন আসন তৈরী করে রাখা হয়েছিল,
সেখানে তাকে বসতে দিয়ে জিজ্ঞাসা করা হোল ইরানের
নতুন বাদশার রীতিনীতির কথা।

দূতের কাছে তারা সকল কথা জানতে চাইলো—
সেখানকার রাজ্য, তাজ ও তখ্‌ত—সকল কিছুর সংবাদ!
জানতে চাইলো, বাদশা ফারেদূনের কথা, তাঁর সৈন্যবাহিনীর কথা,

তাঁর যুদ্ধবাজ সেনাপতিদের কথা, তাঁর রাজ্যের কথা।
প'বিবর্তনশীল আকাশের অন্য সব কীর্তির কথাও তারা
জানতে চাইলো—
যে-আকাশ মনুচেহেরের প্রতি এত করুণাপ্রবণ।
কোন্ কোন্ বীর আলো করে আছে ইরানের রাজপ্রাসাদ, কী রীতি
সেখানে প্রচলিত আছে?
রাজকোষে ও প্রাসাদে কোন্ কোন্ মূল্যবান সম্পদ আছে রক্ষিত?
সেনাপতি কা'রা—তাদেব মধ্যে মহত্তম কে?
কে কে সংগ্রামে অর্জন করেছেন যশঃ—সব সব তা'রা
জানতে চাইলো।
উত্তরে দূত জানালো, বসন্তের এমন সমারোহ
সে কোথাও দেখেনি, যেমন দেখে এসেছে ইবানের প্রাসাদে।
স্বর্গোদ্যানে যেন বসন্ত এসেছে,—
তার সমস্ত মাটি সুগন্ধিত অম্বব ও তাব সকল কঙ্কব
মুঠি মুঠি সোনা।
প্রাসাদের আকাশ পাখীদের কলগুঞ্জনে মুখরিত,
তার প্রশান্ত মাঠ ফুলবনে সুসজ্জিত।
যখন সেই উন্নত প্রাসাদের সমীপে এসে উপস্থিত হলাম,
তখন দেখতে পেলাম, তার শীর্ষ নক্ষত্রদের সঙ্গে রহস্যালাপে নিরত রয়েছে।
প্রাসাদের একপাশে সিংহ, অন্যপাশে হস্তী;
তখ্‌তের নীচে যেন বিস্তৃত রয়েছে এক সুবিশাল দেশ।
তার স্বর্ণময় পাদপীঠ রক্ষিত আছে হস্তিপৃষ্ঠ সদৃশ মেঘদলের উপরে,
তার পদতলে স্বর্ণ-শৃঙ্খলে. আবদ্ধ রয়েছে কত না সিংহ।
হস্তিদলের নিকটে দণ্ডায়মান রয়েছে বাদকদল,
তাদের বাদ্যধ্বনিতে বধির হয়ে যাচ্ছে জগতের কান।
যেন মনে হচ্ছে, যুদ্ধভূমির মত্ততা ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র,
আকাশ ও মাটির শূন্যতা পূর্ণ হয়ে গেছে প্রমত্ত চিৎকারে।

মৃদুমন্দ গতিতে আমি এগিয়ে গেলাম সেই মহত্তম নরপতির দিকে, দেখলাম
চোখের সামনে উন্নীত রয়েছে এক মূল্যবান
নীলার সিংহাসন।
তাতে উপবিষ্ট রয়েছেন বাদশা পূর্ণচন্দ্রের সমারোহে,
এবং তাঁর সূর্যকান্ত মণি-সদৃশ মুখমণ্ডলের উপরে
শোভা পাচ্ছে মহিমময় রাজমুকুট।
কর্পূরের মতো সাদা তাঁর কেশরাজি, গোলাপ পাপড়ির মতো
তাঁর মুখের বর্ণ,
তাঁর বাণীতে বৃদ্ধি পাচ্ছে ভাষার মর্যাদা।
জগৎ তাঁর থেকে লাভ করছে যুগপৎ আশা ও শঙ্কা,
যেন পুনর্জন্ম লাভ করেছেন স্বয়ং বাদশা জামশেদ।
উন্নত শির মনুচেহেরকে দেখলে মনে হয়,
যেন আবার জন্ম নিয়েছেন দৈত্য-দমন তহ্‌মূরস।
তিনি বসে আছেন বাদশার ডান পাশে,
যেন তিনি বাদশার জীবন ও প্রাণ দুইই।
সামনে উপস্থিত রয়েছে বহু-যুদ্ধজয়ী
কুশলী কাওয়া কর্মকার।
সর্বত্র সে বাদশার সহযোগী বলে পরিচিত,
শত্রু-ধ্বংসকারী রূপে তার যশঃ সর্বত্র কীর্তিত।
আরো রয়েছে বাদশার আইন সম্পর্কে পরামর্শদাতা য়মনের সর্‌ও,
বাদশার কোষাধ্যক্ষ বিজয়ী গারশাস্‌প্‌।
গারশাস্‌পের বামে দণ্ডায়মান রয়েছে
তার দুই যশস্বী পুত্র।
সংগ্রামী সাম নূরীমান সহাস্য-বদনে সেখানে উপস্থিত,
যিনি সিংহ ও হস্তীর নিকট থেকেও আদায় করে নিতে
পারেন স্বীয় কাঙ্ক্ষিত বস্তু।
হাজার হাজার রোমক ও চীন দেশীয় দাস

সোনার তকমা পরে সেখানে উপস্থিত রয়েছে।
তারা একের সঙ্গে অন্যে কাঁধ মিলিয়ে
কৃতাঞ্জলীপুটে গারশাস্পের পেছনে দণ্ডায়মান।
তারপর সেনাপতি জাহান,—সে যুদ্ধরত হোলে
সারা দুনিয়া তার সঙ্গে টিকে থাকতে পারে না।
সেই সংগ্রামী নায়ক ময়দানে অবতীর্ণ হোলে
হাতে তুলে নেয় ছয় শত মণ ভারী গদা।
সে যখন ক্রুদ্ধ হয়ে পদাঘাত করে মাটির উপব
তখন ভয়ে কাপ শিহরিত হয় ও কম্পিত হয় ধরণী।
তার সামনে শৃগাল ও হিংস্র ব্যাঘ্র দুইই সমান,
এক ব্যক্তি কিংবা তিন শো বীর উভয়কেই সে গণ্য করে একভাবে।
সামনূরীমান যখন হাতে নেয় তলোয়ার,
তখন তার ভয়ে সর্বত্র ক্ষরিত হয় রক্তবিন্দু।
বাদশাব সম্পদের হিসাব কারো জানা নেই,
সম্পদের এমন আধিক্য দুনিয়ায় কেউ দেখেনি কোনদিন।
তাঁর প্রাসাদের সর্বত্র বিচরণ করছে সারিবদ্ধভাবে সৈন্যদল,
প্রাসাদের সকল স্তম্ভই স্বর্ণমণ্ডিত, সকল মণ্ডপই স্বর্ণচূড়।
তাঁর সেনাপতিগণ সবাই সহযোগী কাওয়ানী কারেনের মতো
কুশলী ও কর্মদক্ষ।
শিরোয়া সে যেন কালান্তক ব্যাঘ্র,
বীরপ্রবর শাপূর—সে যেন মদমত্ত হাতী।
তাঁর বাদ্যকরগণ—যখন তারা হস্তিপৃষ্ঠে সংস্থিত রণ-দামামায় আঘাত করে,
তখন তার আওয়াজে বাতাস হয় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ।
যখন এইসব বীরবৃন্দ দলবদ্ধভাবে অবতীর্ণ হয় সংগ্রামে
তখন পর্বত পরিণত হয় প্রান্তরে, আর প্রান্তর হয় পর্বতের মতো
অরণ্য সঙ্কুল।

এদের সবারই অন্তর জিঘাংসায় পরিপূর্ণ ও ললাটদেশ কুঞ্চিত,
যুদ্ধ ছাড়া আর কিছুই তাদের কাম্য নয়।
এইভাবে দূত যা কিছু দেখে এসেছে সব তাদের বললো,
আরো বললো ফারেদূনেব সেই ভয়ানক ভাষণ যা সে শুনে এসেছে।

দূতের কথা শুনে অত্যাচারী দুই রাজাব হৃদয় বেদনায় পূর্ণ হোল,
দুশ্চিন্তায় ও ভয়ে নীল বর্ণ হোল তাদের মুখমণ্ডল।
বিপদোত্তীর্ণ হওয়াব নানা উপায় তাবা চিন্তা করতে লাগলো,
কিন্তু এই সমস্যার কোন আদি-অন্তই তারা দেখতে পাচ্ছে না।
সহসা তূব বড ভাই সুল্‌মকে বললো,
আনন্দ ও বিশ্রামকে এখন বিদূরিত করুন।
জ্ঞানী হয়েও আমরা মিথ্যাই ক্ষমা প্রত্যাশা করেছিলাম
ফারেদূনের কাছ থেকে।
যেখানে একত্রিত হয়েছে পৌত্র ও পিতামহ
সেখানে সৃষ্ট হয়েছে এক অদ্ভুত রসায়ন।
আমাদের উচিত, আর অধিক বিলম্ব না করে
এখনই সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া।
এই সিংহ শিশুকে আর বাড়তে দেওয়া হবে না,
যাতে সে তার দাঁত আরো তীক্ষ্ণ করার ও সাহস আরো
বাড়িয়ে নেওয়ার সুযোগ না পায়।

এই চিন্তা করে তারা সজ্জিত কবলো অশ্বারোহী দল,
ডেকে আনলো সৈন্যবাহিনী চীন ও পশ্চিমাঞ্চল থেকে।
তারপর ধরণী আলোচনায় পূর্ণ করে
বিশ্বকে যেন সামনে ঠেলে নিয়ে চল্‌লো।
সীমাহীন সৈনিকে পূর্ণ করলো সেনাদল,
অসংখ্য নক্ষত্রও যার উপমা নয়।

ঠিক হোল, দুই দেশের সম্মিলিত এই বিরাট বাহিনী
বর্ম ও শিরস্ত্রাণের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে তূরান থেকে যাত্রা করবে
ইরানের দিকে।

তারপর বিশাল সেনাবাহিনী, মদমত্ত করীদল ও প্রভূত সম্পদ নিয়ে
দুই জিঘাংসাপরায়ণ নরপতি পরিচালিত করলো তাদের অভিযান।

ফারেদুন কর্তৃক মনুচোহরকে তুর ও সলমের সঙ্গে যুদ্ধার্থ প্রেরণ

ফারেদুনের কাছে সংবাদ এলো যে,
ওদের সৈন্য জেঁহুর তীরে এসে পৌঁছে গেছে।
তখন সম্রাটের আদেশে মনুচেহের
স্বীয় সৈন্যবাহিনীকে রাজধানী থেকে প্রান্তর পথে চালিত করলেন।

পরম অভিজ্ঞ সম্রাটের উপদেশ
তরুণ বীরের জন্য আকর্ষণ করে আনবে সৌভাগ্য।
শত্রু অনভিজ্ঞ মেষ তার জালে আবদ্ধ করবে
পশ্চাদ্দিক থেকে ব্যাঘ্রকে ও সামনে থেকে শিকারীকে।
ধৈর্য, সচেতনতা, সঙ্কল্প ও বিজ্ঞতার দ্বারা
সে দুরন্ত সিংহকে ফাঁদে আবদ্ধ করবে।
অন্যদিকে দুশ্চরিত্র অমঙ্গলকামীদ্বয়—
শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়ে পশ্চাদ্দিকে মুখ করবে।
প্রতিশোধ গ্রহণে সে তৎপর হবে,
সে যেন প্রজ্জ্বলন্ত করবে লৌহদণ্ডকে।

মনুচেহের বললেন, হে সমুন্নতশির সম্রাট!
শত্রুতার উদ্দেশ্যে কে আপনার নিকটবর্তী হতে চাচ্ছে?
অমঙ্গলকামিগণ অবশ্যই অতিশীঘ্র
স্বীয় দেহ প্রাণের জন্য নতজানু হবে আপনার সামনে।
আমি এখনই রোমক তনুত্রাণে আবৃত করছি বক্ষদেশ,

এবং এমনভাবে কটিদেশ বন্ধন করছি যাতে তার গ্রন্থী উম্মোচিত করা সহজ
না হয়।

রণক্ষেত্রে এমন সংগ্রাম আমি উত্থিত করবো,
যাতে সৈন্যদের পদতাড়িত ধূলি স্পর্শ করে সূর্যলোক।
বিপক্ষদলে এমন কোন পুরুষ আমি দেখতে পাচ্ছি না,
যিনি যুদ্ধে আমার সম্মুখীন হতে পারেন।

রাজধানীর বাইরে স্থাপিত হোল সম্রাটের (মনুচেহেরের) শিবির,
এবং প্রোথিত করা হোল সৌভাগ্য-সূচক পতাকা-দণ্ড।
দলে দলে সৈন্যগণ সেখানে আসতে লাগলো,
মনে হোল যেন, পর্বত ও প্রান্তরে উচ্ছ্বসিত হচ্ছে বন্যাক্রান্ত নদী।
তাদের পদোক্ষিপ্ত ধূলায় উজ্জ্বল দিন অন্ধকার হয়ে এসেছে,
মনে হচ্ছে প্রজ্জ্বলন্ত সূর্য বুঝি রাহুর কবলগ্রস্ত হোল।
সৈন্যদলের মধ্যে থেকে উত্থিত হোল এমন কোলাহল যে,
তাতে, প্রখর শ্রবণের অধিকারীগণও বধির হয়ে গেলো।
প্রান্তর জুড়ে জেগে উঠলো প্রকৃষ্ট আরবীয় অশ্বের হ্রেষাধ্বনি,
এবং সেই সঙ্গে বেজে চললো অবিরত রণদামামা।
সৈন্যদলের পুরোভাগে সেনাপতিগণ
দুই সারিতে দাঁড় করিয়ে দিলেন প্রমত্ত হস্তীদলকে।
এইসব হাতীর ষাটটির পিঠে স্বর্ণাসন স্থাপিত করা হোল,
সেই স্বর্ণাসনগুলি কতনা মণিমুক্তায় বিখচিত ও বিচিত্রিত!
তিন শত হাতীর পিঠে বোঝাই করা হোল খাদ্যদ্রব্য,
আর তিন শত হাতীর পিঠে রাখা হোল যুদ্ধের উপকরণ।
এইসব হাতির প্রত্যেকটি পরিপূর্ণভাবে বর্মাবৃত,
একমাত্র চক্ষু ব্যতীত সারা দেহ তাদের আচ্ছাদিত হয়েছে ইস্পাতের আবরণে।
এইবার সম্রাটের শিবির উত্থিত হোল,
এবং সসৈন্যে তিনি তামেশা থেকে প্রান্তর অভিমুখে ধাবিত হলেন,

কারেনের মতো প্রতিশোধকামী সেনাপতি
ত্রিশ হাজার অশ্বারোহীর পুরোভাগে রইলেন।
তারা সবাই খ্যাতিমান যোদ্ধা ও তনুত্রাচধারী,
সবাই ভারী প্রহরণ হাতে অগ্রসর হোল।
বীরবৃন্দ প্রত্যেকে দুরন্ত সিংহের মতো
এরজের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণে তৎপর হলেন।
বীরবৃন্দের সম্মুখে উড্ডীয়মান রয়েছে কাওয়ানী পতাকা,
তাঁদের হাতে ধরা রয়েছে সমুজ্জ্বল তরবারি।
মনুচেহের এখন বীরাগ্রগণ্য কারেনসহ
নারওয়ানের বনভূমি থেকে নির্গত হলেন।
তিনি সৈন্যদলের সামনে এসে প্রবৃত্ত হলেন তাদের নির্বাচনে,
এবং বিপুল প্রান্তরে সজ্জিত স্বীয় সৈন্যবাহিনীকে ব্যূহবদ্ধ করলেন।
সৈন্যদলের বাম বাহুর ভারার্পণ করা হোল গারশাসপের উপর,
দক্ষিণ বাহুর সংরক্ষণে থাকলেন কোবাদসহ বীর প্রবর সাম।
সৈন্যগণ সারি বেঁধে দণ্ডায়মান হলে
মনুচেহের সর্ওসহ বাহিনীর মধ্যভাগে অবস্থান গ্রহণ করলেন।
তিনি স্বীয় নক্ষত্রদের মধ্যে চাঁদের মতো শোভা পেতে লাগলেন,
অথবা সমুজ্জ্বল সূর্যের মতো উদিত হলেন পর্বত প্রদেশে।
সৈন্যদলনকারী কারেন ও সামের মতো যোদ্ধা
এইবার স্বীয় তরবারি কোষোন্মুক্ত করলেন।
রক্ষীদলের পুরোভাগে রইলেন কোবাদ,
এবং অভিজাত তলীমান গুপ্ত বাহিনীর দেখাশোনায় নিযুক্ত হলেন।
এইভাবে নবপরিণীতা বধূর অনুরূপ করে সজ্জিত করা হোল ইরানীয় সৈন্যদলকে
রণোন্মুখ সিংহ দুন্দুভির আওয়াজে নিদারুণ উৎসবের আভাস সূচিত করলো।
ওদিকে সুলম ও তূরের কাছে সংবাদ পৌঁছলো যে,

ইরানীয়গণ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হয়েছে।
তারা বনভূমি থেকে পর্বতের পাদদেশ পর্যন্ত সারিবদ্ধ করেছে সৈন্যদল,
ফেনরূপে তাদের হৃদয় রক্ত অধরৌষ্ঠে উচ্ছ্বসিত হচ্ছে।
সংবাদ পেয়ে দুই খুনি সম্রাট—
হৃদয় শত্রুতার বিষে পরিপূর্ণ করে অগ্রসর হোল ;
এবং আলানা ও নদীকে পশ্চাদ্বর্তী করে
যুদ্ধার্থ সজ্জিত করলো তাদের সেনাদল।
সহসা একজন রক্ষী কোবাদের কাছে
দৌড়ে এসে তূর সম্পর্কে সংবাদ দিলো,
এবং বললো, আপনি এখুনি মনুচেহের সমীপে গমন করুন,
গিয়ে বলুন, হে পিতৃহীন তরুণ সম্রাট !
যদি এরজের ঔরষে কন্যারই জন্ম হয়ে থাকে,
তবে আপনাকে কে দিয়েছে এই অসি তনুত্রাচ ও প্রহবণ ?
তাঁকে বলবেন, অবশ্যই তাঁর বাণী আমি পৌঁছে দিবো,
স্বীয় পরিচয় সম্পর্কে তিনি যা বলবেন তা প্রতিপক্ষকে অবগত করাবো।
কিন্তু যদি সন্দেহ দীর্ঘস্থায়ী হয়,
তবে প্রজ্ঞা আপনাব রহস্যেব সঙ্গে হাত মেলাবে না।
জেনে রাখুন, সামনে যে কর্তব্য তা ধারণার অতীত,
সুতরাং নিজের সম্পর্কে কোন বাজে কথা বলা সমীচীন হবে না।
যদি দিনরাত আপনাদের উপর বনের হরিণাদি চতুষ্পদ ক্রন্দন করে,
তবুও তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই থাকবে না।
কারণ, নারওয়ানের বনভূমি থেকে চীনের সীমান্ত পর্যন্ত—
যুদ্ধার্থী অশ্বারোহী ও প্রতিশোধকামী বীরবৃন্দ প্রস্তুত রয়েছে।
তাদের সমুজ্জ্বল তরবারি সূর্যালোকে ঝকঝক করছে,
আপনারা দেখবেন যে, তাদের সম্মুখে উড্ডীন রয়েছে কাওয়ানী পতাকা।
এই দৃশ্য দেখলে আপনাদের হৃদয় ব্যাথা ও ভয়ে পরিপূর্ণ হবে,
সামু থেকে আপনারা কখনো আর শৌর্যের পথ দেখতে পাবেন না।

রক্ষী সৈনিকের এইকথা শুনে মহামতি কোবাদ
অত্যন্ত ব্যথিত ও ক্রুদ্ধ হলেন কিন্তু কোনরূপ প্রত্যুত্তর করলেন না।
তিনি সঙ্গে সঙ্গে সম্রাট সমীপে আগমন করে
যুদ্ধার্থী-প্রতিপক্ষের বক্তব্য যা শুনেছেন, তা নিবেদন করলেন।
শুনে মনুচেহের হাস্য করে বললেন যে,
মূর্খ ব্যতীত এমন কথা আর কেউ বলতে পারে না।
সেই প্রভুর প্রশংসা যিনি দুই জাহানের প্রতিপালক,
গুপ্ত ও প্রকট উভয়ের রহস্যই যিনি সত্যায়িত করেন।
কে না জানে যে, এরজ আমার মাতামহ ?
পরম সম্মানিত ফারেদূন আমার সাক্ষী।
অনতিবিলম্বে যখন আমি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করবো,
তখনই লোকে আমার বংশাভিজাত্য ও ব্যক্তিত্ব
সম্পর্কে অবহিত হবে।

চন্দ্র-সূর্যের প্রভুর ঐশ্বর্যের সহায়তায়—
তাদের ঐ বিপুল সমাবেশকে আমি ধ্বংস করবো ;
আমি তাদের সৈন্যবাহিনীর শৃঙ্খলাকে ওলট-পালট করে দিবো
এবং সেই বাহিনীর দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবো তার শির।
সমুন্নত পিতার রক্তের প্রতিশোধে-
তাদের সাম্রাজ্যকে আমি তছনছ করে ফেলবো,
এই বলে সম্রাট খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করতে আদেশ দিলেন,
এবং বললেন সেজন্যে উৎসব-কক্ষ, সুরা ও পানপাত্র প্রস্তুত করা হোক।

তুরের সৈন্যদলের উপর মনুচেহেরের আক্রমণ পরিচালনা

ধরিত্রী যখন অন্ধকার রাত্রি থেকে আলোকে বহির্গত হোল,
তখন অগ্রগামী সেনাদল ছড়িয়ে পড়লো পর্বত-প্রান্তর সর্বত্র
সৈন্যদলের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে সংগ্রামী কারেন
এবং বিজ্ঞ উপদেশদাতা য়মনের অধিপতি সর্ও
সৈন্যদের উচ্চকণ্ঠে ডেকে বললেন,—
হে সম্রাটের যশস্বী সিংহদল !
আপনারা জেনে রাখুন এই যুদ্ধ শয়তানের বিরুদ্ধে ;—
যে-শয়তান বিশ্ব-স্রষ্টার শত্রু।
আপনারা বন্ধন করুন কটিদেশ ও জাগ্রত হোন।
এবং আসুন বিশ্ব প্রভুর সাহায্যের ছায়াতলে।
যে-ব্যক্তি এই যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হবে,
সে হবে স্বর্গবাসী, তার সমস্ত পাপ ধুয়ে-মুছে যাবে।
যে সব ব্যক্তি এই যুদ্ধক্ষেত্রে
রোম ও চীনের সৈন্যদের রক্তপাত করবে,
তারা চিরকালের জন্য অর্জন করবে খ্যাতি
এবং পুরোহিতদের সম্মানে সম্মানীত হবে।
তদুপরি তারা সম্রাটের হাত থেকে লাভ করবে
রাজ্য ও সিংহাসন।

তারপর যখন উজ্জ্বল দিন দ্বিখণ্ডিত হোল,
এবং দিবসের দুই প্রহর হোল অতিবাহিত,

তখন বীরবৃন্দ তাদের কটি দেশ বন্ধন করে
হাতে তুলে নিলো প্রহরণ ও কাবুলদেশীয় তরবারি
এবং প্রত্যেকে তাদের স্ব স্ব স্থানে এসে দাঁড়ালো
কেউ অপরের জায়গায় পা রাখবার প্রয়াস পেলোনা।
সেনাপতিগণ ও বীর সামন্তবর্গ
সিংহ সদৃশ সম্রাটের সামনে সারিবদ্ধ হয়ে দণ্ডায়মান হোল।
এবং সর্বাধিনায়ক সম্রাটকে সম্বোধন করে বললো, আমরা সবাই
আপনার দাস,
আপনাব জন্যই আমরা পৃথিবীতে জীবন ধাবণ করি।
আপনি যে-মুহূর্তে আমাদের আদেশ কববেন, সে-মুহূর্তেই
এই ধরিত্রীকে আমরা তরবারি দ্বাবা প্রবহমান জেঁহু নদীতে
পবিবর্তিত করে দিবো।
এই বলে সেনাপতিগণ স্বীয় শিবিবেব দিকে প্রত্যাবৃত্ত হোল,
তাদেব হৃদয়ে বৈরনির্যাতন স্পৃহা রইলো প্রবল হয়ে।

এদিকে দিনের আলো স্বস্থান থেকে প্রয়াণপর হয়ে
তির্যক্‌ভাবে প্রবিষ্ট হোল রাত্রির অন্ধকারে।
অতঃপর উষার উদয়ে দিনেব আলো যখন
রাত্রির অন্ধকার থেকে বাঁকা দিগন্তবালে বেরিয়ে এলো,
তখন মনুচেহের তাঁর রাজকীয় শিবির থেকে
তনুত্রাচ, তরবারি ও রোমীয় শিরস্ত্রাণে সজ্জিত হয়ে
বেরিয়ে এলেন।
সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যদল রণধ্বনি উত্থিত করলো,
এবং আকাশের দিকে তুলে ধরলো তাদের বর্শারাজি।
তাদের মস্তিষ্ক ক্রোধে পূর্ণ হোল ও ললাটে-
দেখা দিলো কুঞ্চন রেখা,
পৃথিবীর উপর যেন লিখিত হয়ে গেলো তাদের অভিপ্রায়।

ডাইনে বাঁয়ে ও সৈন্যদলের মধ্যস্থলে
সম্রাট স্বীয় অভিপ্রায় অনুযায়ী সেনা-সন্নিবেশ করলেন।
তাঁর বাহিনী যেন জলের উপরে ভাসমান সুদর্শন
তরীর অনুরূপ শোভা পেলো
এবং দ্রুত এগিয়ে চললো রণাভিমুখে।
সঙ্গে সঙ্গে মত্ত হাতীর পিঠে রক্ষিত রণ দামামায় বাড়ি পড়লো,
আর তাতে ধরিত্রী দুলে উঠলো নীল নদের মতো
ঊর্মিছন্দে।

হস্তীদলের সম্মুখে দুন্দুভিবাদকগণ
দুরন্ত সিংহের মতো উচ্ছ্বসিত আবেগ নিয়ে অগ্রসর হোল।
এই-অভিযানকে একটি উৎসবের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে,
এখানে বেজে উঠেছে তূর্য ও নিনাদিত হচ্ছে বিষাণ।
এইভাবে তারা একটি দুর্ভেদ্য পর্বতের মতো এগিয়ে চললো,
তখন প্রতিপক্ষ থেকেও আসলো বাধা।
দেখতে দেখতে বন-প্রান্তরে বয়ে গেলো রক্তের নদী,
মনে হোল যেন, ধরিত্রীর বুকে লালাফুলের কানন জেগে উঠেছে।
মত্ত হস্তীদলের পদরাজি রক্তের মধ্যে নিমজ্জিত হচ্ছে,
মনে হচ্ছে, সূর্যকান্ত মনির স্তম্ভরাজি যেন সম্মুখে বিরাজিত।
তুরানীয় পক্ষে শিরোয় নামের এক সেনাপতি ছিল,
সে ছিল বীর, সমুন্নতশির ও যশ:-অন্বেষী।
সে স্বীয় দল থেকে একটি গিরিচূড়ার মতো বেরিয়ে এলো,
তার আগমন প্রত্যক্ষ করে কেঁপে উঠলো বীরবৃন্দের হৃদয়।
কারেনের দৃষ্টি যখন তার উপর পড়লো
তখন সঙ্গে সঙ্গে তিনি টেনে নিলেন স্বীয় তরবারি।
শিরোয় তখন পুরুষ-সিংহের অনুরূপ গর্জন করে
কারেনের কটিদেশ লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারলো বর্শা।
ভয়ে কারেনের হৃদয় পরিম্লান হোল,

তিনি সহ্য করতে পারলেন না সেই আঘাত।
এই দৃশ্য যখন সেনাপতি সামের চোখে পড়লো,
তখন তিনি মেঘগর্জন উত্থিত করে অগ্রসর হলেন।
শিরোয় সামকে দেখেই ক্ষিপ্রগতি ব্যাঘ্রের অনুরূপ
যুদ্ধার্থ বীরবরের দিকে এগিয়ে এলো।
এবং সামের মস্তক লক্ষ্য করে প্রহরণের আঘাত হানলো
তার ফলে সামের মুখমণ্ডল হোল হলুদবর্ণ;
তাঁর শিরস্ত্রাণ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো
অতঃপর অসি দ্বারা শত্রুজয়ে নিরত রইলো শিরোয়।
অবশেষে দুই সমুন্নতশির ও দুরন্ত বীরই
স্ব স্ব বাহিনীর অভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হলেন।
এইবার শিরোয় স্বীয় সৈন্যদলের ব্যূহ-সম্মুখে এসে
মহামতি মনুচেহেরকে ডাক দিয়ে বললো,—
আপনাদের সেই সেনাপতি কোথায়,
দুনিয়া যাকে গারশাসপ বলে সম্বোধন করে থাকে?
তিনি আসুন, এসে এখনই আমার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হোন,
তাহলে আমি তাঁকে রক্তবর্ণ তনুত্রাচে পরিশোভিত করতে পারি।
ইরানে একমাত্র তিনি ব্যতীত আর কেউ আমার সমকক্ষ নয়
কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তিনিও আমার পরাক্রম সহ্য করতে অক্ষম।
ইরানে ও তূরানে কোথাও কোন লোক আমার সমকক্ষতার যোগ্য নয়,
কেউ আমার প্রতিদ্বন্দ্বী নেই, নেই আমার মতো কোন বীর।
আমার তরবারি সিংহাদির রক্ত পান করে,
আমার প্রহরণ সাহসী পুরুষদের মগজ আস্বাদন করে থাকে।
যখন আমার তরবারি কোষোন্মুক্ত হয়,
তখন সপ্তরাজ্য রূপান্তরিত হয় রক্তের নদীতে
গারশাসপ এই আহ্বান শুনে বেরিয়ে এলেন,
এবং পশ্চিমের সেনাপতির দিকে অগ্রসর হয়ে,

গবত্ত শিরোয়কে সম্বোধন করে এমন গর্জন উত্থিত করলেন যে,
তাতে প্রকম্পিত হয়ে উঠল যুদ্ধক্ষেত্র।
বললেন, ওহে অপ্রকৃতিস্থ শৃগাল,
সমুন্নতশির বীরদের মধ্যে থেকে তুই আমাকেই স্মরণ করেছিস?
তোর সামনে আমার শক্তি ও যুদ্ধকৌশল
এখনই তোর সরোদন ক্ষমাপ্রার্থনা হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে।
জবাবে প্রতিপক্ষ বললো, আমি শিরোয়
প্রমত্ত হস্তীসকলের দেহ থেকে আমি অবলীলায় বিচ্ছিন্ন
করি শির।
এই বলেই শিরোয় স্বীয় অশ্ব উত্তেজিত করে অগ্রসর হোল,
মনে হোল যেন সচল হয়েছে এক গিরিচূড়া
তুর্কী শিরোয়কে এই ভাবে আসতে দেখে
সমুন্নতশির গারশাস্প হাস্য করলেন।
শিরোয় তখন বললো, হে শক্তিমান,
সাহসী বীরবৃন্দের সঙ্গে যুদ্ধে এমন করে হাসবেন না।
গারশাস্প বললেন, ওরে দৈত্য সদৃশ পুরুষ,
যুদ্ধক্ষেত্রে আমি কখনো এমন করে হাসতাম না।
যদি তুই এভাবে না আসতিস আমার সামনে;
তোর ঔদ্ধত্যই আমাকে হাসিয়েছে।
গারশাসপের কথা শুনে শিরোয়া বললো, রে বৃদ্ধ ভাগ্যহত,
তাজ ও তখ্তের দিন তোর শেষ হয়েছে,
তাই, আমার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য এমন ব্যাকুল হয়েছিস,
চল্ তবে, তোর রক্তে সেই ব্যাকুলতার অবসান করি।
এই কথা শোনামাত্র গারশাস্প টেনে নিলেন
তাঁর ভারী প্রহরণ;
ও সেই গোমুখ-চিহ্নিত গদার আঘাতে
তাকে ধরাশায়ী করে দিলেন।

মুহূর্ত মধ্যে ধূলায় শোণিতে একাকার হয়ে গেলো,
এবং শিরোয়ের করোটি শূন্য করে বেড়িয়ে এলো তার মগজ।
এমনভাবে তাকে নিশ্চিহ্ন করা হোল
যেন শিরোয়া কখনো জন্মই নেয়নি তার মাতৃগর্ভ থেকে।
এমন সময় তুরানের বীব সেনানীগণ
সমবেতভাবে গারশাস্পের দিকে ধাবিত হোল।
গারশাস্প উত্থিত করলেন ভীষণ রণ হুঙ্কার,
সেই হুঙ্কারে কেঁপে উঠলো আকাশের চন্দ্র-সূর্য।
সঙ্গে সঙ্গে তীর, বর্শা ও সুতীক্ষ্ণ তলোয়ারের ঝঞ্চনায়
যুদ্ধক্ষেত্রে প্রলয়ের দৃশ্য প্রকটিত হোল।
রণক্ষেত্রের দিকে দিকে সূচিত হতে লাগলো মনুচেহেরেব বিজয়,
যেন বিশ্বের মন তার প্রতি করুণায় পূর্ণ হয়ে গেছে।
এইভাবে সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধ চললো, ক্রমে নেমে এলো অন্ধকার,
উজ্জ্বল সূর্য রাত্রির পর্দায় তার মুখ লুকালো।
বেশীক্ষণ কালের গতি এক রকম থাকে না,—
কখনো বিরাজ করে উৎসব কখনো দেখা দেয় আনন্দহীনতা।
তূর ও সুলমের হৃদয় দুঃখে উদ্বেলিত হোল;
রাত্রির অন্ধকাবে এক অতর্কিত আক্রমণের সঙ্কল্পে তারা কোমর বাঁধলো।
তাই পরদিন সকালে দেখা গেল, তুরানীয়গণ যুদ্ধক্ষেত্রে অনুপস্থিত;
দুই ঈর্ষাপরায়ণ নরপতি দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনায় মগ্ন হয়ে রইলো।

মনুচেহেরের হাতে তুরের নিধন

বিরতির মধ্যদিন অতিবাহিত হতে চলেছে,
এমন সময় দুই ঈর্ষাপরায়ণ নরপতির হৃদয়ে জ্বলে উঠলো শত্রুতার আগুন।
তা'রা পরস্পরের সঙ্গে আলোচনায় নিরত থেকে
তখনও কৌশলের পর কৌশল চিন্তা করে চলেছে।
তারা বলছে, রাত্রি হলে আমরা অতর্কিতে আক্রমণ করে
সারা প্রান্তর রক্তে রঞ্জিত করে দিব।

সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে দিনের অস্ত হোল,
এবং ধরণী পরিপূর্ণ হোল অন্ধকারে।
দুই অত্যাচারী তাদের সৈন্যবাহিনী সজ্জিত করলো,
এবং অতর্কিত আক্রমণের সকল প্রস্তুতি নিলো।
গোয়েন্দাগণ তা জানতে পেরে
ত্বরিতে উপস্থিত হোল মনুচেহেরের কাছে।
এবং প্রতিপক্ষের সৈন্যদের প্রস্তুতির সংবাদ
বাদশার কাছে নিবেদন করলো।
মনুচেহের মনোযোগ দিয়ে সব শুনলেন,
এবং কি কৌশলে আক্রমণ প্রতিহত করা যায়, তা ভেবে নিলেন।
গোটা সৈন্য বাহিনীকে কারেনের হাতে সমর্পণ করে
ঘাত তৈরীর স্থল নির্বাচনে স্বয়ং বেড়িয়ে পড়লেন।
সঙ্গে নিল ত্রিশ হাজার বীর,
পৌরুষ ও বীরত্বে এই অসিধারীগণ অর্জন করেছেন যশঃ।
মনুচেহের নিজে দেখলেন, গুপ্ত স্থানটি
সুনির্বাচিত হয়েছে,

এবং সৈন্যগণও প্রস্তুত।
রাত্রি আরো অন্ধকার হোলে তূর একলক্ষ সৈন্য নিয়ে
যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে মুখ করলো।
অতর্কিত আক্রমণের অভিপ্রায় নিয়ে
তূনীর থেকে আকর্ষিত করে নিলো তীর ও ধনুকে জ্যাযুক্ত করলো।
কিন্তু সহসা তার সৈন্যদের থেমে দাঁড়াতে হোল,
তারা দেখলো, সামনেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এক উজ্জ্বল নিশান।
বুঝলো, যুদ্ধ ছাড়া এখন গত্যন্তর নেই,
সৈন্যদের মধ্যে তখন উত্থিত হোল চীৎকার ধ্বনি।
অশ্বারোহীদের পদধূলিতে বাতাস মেঘের মতো ভারী হয়ে উঠলো,
ইস্পাতের তলোয়ারগুলি বিদ্যুতের মতো চমকাতে লাগলো।
বাতাস ঝঞ্ঝার বেগে প্রবাহিত হোল,
যেন হীরার আঁচরে ক্ষত বিক্ষত হচ্ছে মৃত্তিকার মুখ।
অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা মস্তিষ্কের মধ্যে সৃষ্টি করছে প্রমত্ত কলরোল,
আগুন ও দীর্ঘশ্বাস যেন দীর্ণ করছে মেঘের বুক।
দুই পক্ষের সৈন্যদল পরস্পর মুখোমুখী হয়ে লড়ছে,
উভয়েরই কাঁধের উপর উত্থিত হচ্ছে যুগপৎ বিলাপ ও হুঙ্কার।
রাত্রি অন্ধকার ও প্রান্তর কালি ঢালা—
চতুর্দিক থেকে অবিরাম বয়ে চলেছে বাণ-বৃষ্টি।
এমন সময় তুর্কদের অধিপতি গর্জন করে
তলোয়ার হাতে রণরঙ্গভূমিতে প্রবেশ করলো।
সংগ্রামী কারেন তখন পাগলা হাতীর মতো রণভূমিতে প্রবেশ করে
ধরিত্রীকে শোণিতের নীলনদে পরিণত করছে।
মরুভূমিতে প্রবাহিত হয়ে চলেছে রক্তের নদী,
এবং আকাশ পরিপূর্ণ হয়েছে আহত সৈনিকদের বিলাপ-চীৎকারে।
এমন সময় বাদশা গুপ্ত ঘাঁটি থেকে বেরিয়ে এলেন;
সঙ্গে সঙ্গে তূরের অগ্র-পশ্চাৎ বেরুবার পথ রুদ্ধ হয়ে গেলো।

তার সামনে ও পেছনে দু'দিকেই রণোন্মত্ত সৈন্যদল,
এবং স্বয়ং মনুচেহের খুঁজে ফিরছেন শত্রুকে।
বাদশা চীৎকার করে তাকে ডাকছেন,
কোথায় তুমি অত্যাচারী শত্রু!
অবস্থা দেখে তূর বিচলিত হয়ে পড়লো
সে বুঝতে পারছে, তার ভাগ্যের দুর্দিন সমাগত।
তার সামনে পেছনে দুদিকেই রণোন্মত্ত সৈন্য,
আর মনুচেহের এগিয়ে আসছে তার দিকে।
এবং তাকে ডাক দিয়ে বলছে,
ওরে নির্বোধ অত্যাচারী শত্রু, একটু সবুর করে থাক।
অবস্থা দেখে তূরের অন্তরে প্রবিষ্ট হোল ভীতি,
সে বুঝতে পারলো, তার অন্তিম সময় ঘনিয়ে এসেছে।
সে তখন অশ্ব-বল্গা টেনে অন্যদিকে মুখ ফেরালো,
কিন্তু সৈন্যদের হাহাকার ছাড়া সে আর কিছুই শুনতে পেলোনা।
এমন সময় মনুচেহের সবেগে ধাবিত হয়ে
সেই বিখ্যাত ঈর্ষাপরায়ণের সামনে এসে উপস্থিত হলেন;
এবং তাকে ডেকে বললেন,
ওরে নির্বোধ অত্যাচারী শত্রু, একটু সবুর কর।
নির্দোষ ব্যক্তির মস্তক যখন কর্তন করেছিলে
তখন কি জানতে পারিসনি যে দুনিয়া পোষণ করে রেখেছে
তোর উপরও শত্রুতা!
এই বলে তিনি তার পৃষ্ঠে বর্শা দিয়ে আঘাত করলেন,
সঙ্গে সঙ্গে তার হাত থেকে ছিটকে পড়লো তলোয়ার।
মনুচেহের ঘোড়ার উপর থেকেই বায়ুগতিতে তাকে
আকর্ষণ করে ধরলেন,
এবং চক্ষের নিমিষে আছড়ে ফেললেন মাটির উপরে।

তারপর অবলীলায় বিচ্ছিন্ন করে নিলেন তার শির,
এবং দেহটি চতুষ্পদদের উৎসবের জন্য সেখানেই ফেলে রাখলেন।

নিয়তি অবোধ্য, কোনদিন বুঝতে পারলাম না, কি তার উদ্দেশ্য ;
কারও প্রাণ রক্ষার দায়িত্ব সে গ্রহণ করে না।
কাউকে যদি সে বহু বর্ষ ধরে প্রতিপালনও করে
তবু তার শেষনিঃশ্বাস টুকুর সময় সে তার দিকে ফিরেও দেখে না।
সিংহাসন থেকে নামিয়ে এনে সে কাউকে করে পথের ভিখারী,
অথচ এমন কাজে শিউরে উঠে না সে,
অন্তরে তার দেখা দেয় না মমতা।
হে বন্ধু, তার দয়ার আশা করোনা কোনদিন—
সে যদি তোমাকে দান করে অন্তহীন সুসংবাদ, তবুও।[২৪]

মনুচেহের এইভাবে তার বিজয় সম্পূর্ণ করে
তূরের মস্তক নিয়ে ফিরে এলেন।
ফিরে এলেন তাঁর নিজের সৈন্যবাহিনীর কাছে,
তাকালেন বিজয়ী ঝাণ্ডার দিকে—ও দৃষ্টি প্রসারিত করলেন,
পাহাড় প্রান্তর সর্বত্র।

---

২৪. এই কয়টি পংক্তি কবির স্বগতোক্তি।

ফারেদুনের সমীপে মনুচেহেরের বিজয় লিপিকা

মনুচেহের যুদ্ধের উত্থান-পতন বর্ণনা করে
ফাবেদুনের কাছে লিপি লিখলেন।
প্রথমেই তিনি স্রষ্টার গুণকীর্তন কবলেন,
যিনি জাগ্রত করেছেন তার ঘুমন্ত ভাগ্যকে।
যিনি গ্রহণ করেন মানুষের করুণ প্রার্থনা,
এবং ধারণ করেন তার হাত;—
তিনিই পথ দেখান, তিনিই উন্মোচন কবেন হৃদয়;
তিনি চিরঞ্জীব ও চির-প্রতিষ্ঠিত।
পরে লিখলেন, ফারেদুনের গুণাবলী,
যিনি সিংহাসন ও প্রহরণের অধিপতি।
যাঁ'র থেকে উৎসারিত হয় দান, ধর্ম ও গৌরব,
এবং যাঁকে শোভা পায় মুকুট, সিংহাসন ও রাজত্ব।
সত্য ও সৌন্দর্য তাঁরই ভাগ্যেব দান,
গৌবব ও শোভা তাঁর সিংহাসন থেকেই বিকীবিত হয়।
তাঁব আদেশে সর্বত্র সুবিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে,
সমস্ত জগৎ পূর্ণ হয়েছে তাঁর জয়জয়কারে।
আপনারই শক্তির মহিমায় আমি লাভ করেছি তুরান ভূমি,
আপনারই আদেশে চালিত করেছি এই সৈন্যবাহিনী।
দু'দিনের মধ্যে তিনটি বড় বড় যুদ্ধ আমাকে করতে হয়েছে—
কখনো আলোকিত দিবা-ভাগে, কখনো রাত্রির অন্ধকারে।
তা'রা করেছিল রাত্রিযোগে অতর্কিত আক্রমণ, আমরা ছিলাম গুপ্ত
ঘাঁটিতে তাদের প্রতীক্ষায়,—

প্রচণ্ড হিংস্রতার সঙ্গে আমরা উভয়েই করেছি সংগ্রাম।
বাদশার নামে আমরা পূর্বদিন লাভ করেছিলাম বিজয়,
ও শত্রুদেরকে বহিষ্কৃত করেছিলাম রণক্ষেত্র থেকে।
কিন্তু যখন শুনলাম যে, পাপাচারী ভাগ্যহত তূর
এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে
রাত্রির অন্ধকারে অতর্কিত আক্রমণের মতলব করেছে—
সম্মুখ যুদ্ধে হেরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে তন্ত্র-মন্ত্রের—
তখন আমি তার সামনে-পিছনে রচনা করলাম গুপ্ত ঘাঁটি,
ও পঙ্গু করে দিলাম তার সঙ্কল্প।
তারপর যখন সে যুদ্ধভূমি ছেড়ে পলায়নের উদ্যোগ করছে
তখন তাকে ধরে ফেললাম প্রচণ্ড শক্তিতে;
ও তার বর্ম লক্ষ্য করে বর্শা ছুঁড়লাম,
এবং দমকা বাতাসের মতো উঠিয়ে আনলাম তাকে তার অশ্ব-পৃষ্ঠের
আসন থেকে।
তারপর ঘৃণিত আজদাহার মতো তাকে মাটিতে আছড়ে ফেলে
তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলাম শির।
সেই শির এখন আপনার কাছে পাঠাচ্ছি,
আর সুলমের জন্য তৈরী করছি তার উপযুক্ত রসায়ন।
যেভাবে এরজের শিরকে শবাধারে পুরে
অপমানিত অবস্থায় পাঠানো হয়েছিল—
যেভাবে বঞ্চিত করা হয়েছিল তাঁকে তাজ ও তখ্ত থেকে
নির্লজ্জভাবে,—
তেমনই আমিও বিচ্ছিন্ন করেছি তার মস্তক দেহ থেকে,
ও ধ্বংস করেছি তার রাজ্য ও গৃহ;
এবং তার মস্তক বর্শাফলকে বিদ্ধ করে আপনার কাছে পাঠাচ্ছি,
যাতে মুক্তি পায় আপনার হৃদয়ের অন্তরীণাবদ্ধ বেদনা।

এখন জ্যেষ্ঠ স্থল্মের ব্যবস্থায় নিজেকে নিয়োজিত করেছি,
নেকড়ে যেভাবে মেষের অনুধাবন করে তেমনিভাবে তৎপর
রয়েছি তার মস্তকের কামনায়।
স্থল্ম যদি সমুদ্রের গভীরতায়ও ডুব দেয়
কিংবা প্রয়াণপর পর হয় সপ্তর্ষির নক্ষত্র মণ্ডলে,
তবু তাকে নিশ্চয় ধরবো ও বিচ্ছিন্ন করবো তার মস্তক,
এবং রচিত করবো তার জন্য তার উপযুক্ত শবাচ্ছাদনী।
লিপিকায় এইভাবে সব কথা লিখে
মনুচেহের বায়ু-গতি অশ্বে করে তা ফাবেদূনের কাছে
পাঠিয়ে দিলেন।
দূত সেই লিপি নিয়ে সলজ্জভাবে ফারেদূনের দরবারে
উপস্থিত হোল,—
তার দু'চোখে উষ্ণ অশ্রুর ধাবা বইতে লাগলো।
সে ভাবতে লাগলো, কোন্ মুখে সে চীনেব অধিপতির
কর্তিত মস্তক নিয়ে
ইরান শাহের সমীপে উপস্থিত হবে?
পুত্র যদি ধর্মচ্যুতও হয়,
তবু তার মৃত্যুতে পিতার প্রাণে জ্বলে উঠে শোকের আগুন।
তার অপরাধ ছিল গুরুতর তাই ক্ষমা সে পায়নি,
তদুপরি, নতুন বাদশার প্রতিও সে হয়েছিল ঈর্ষান্বিত।
উদ্ধত দূত এইরূপ ভাবতে ভাবতে বাদশার সমীপে এসে উপস্থিত হোল,
ও তাঁর সামনে রাখলো তূরের মস্তক।
ফারেদুন তা দেখলেন এবং মনুচেহেরের উপর
বর্ষণ করলেন আশীর্বাদ-বাণী।

কারেন কর্তৃক আলানা[২৫] দুর্গ জয়

স্থলম যুদ্ধের বিপর্যয়ের কথা জানতে পারলো,—
জ্যোৎস্নারাতে যেন প্রবেশ করলো অমাবস্যার অন্ধকার।
কালের এই প্রতিকূল ব্যবহারে সমস্ত মন তার দুঃখে ভরে এলো,
ভায়ের মৃত্যুতে সে অঝোরে রোদন করলো বহুক্ষণ ধরে।

তার প্রত্যাগমনের পথে এক দুর্গ ছিল,
যার শীর্ষ নীল আকাশের সঙ্গে কথা কইছে।
সেই দুর্গে আশ্রয় নেওয়ার সঙ্কল্প করলো সে,
সময়ের উঁচু-নীচুতে এমন একটু অবসরের প্রয়োজন আছে।
এদিকে মনুচেহের ভাবলেন,
স্থলম যদি যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে থাকে
তবে আলানা দুর্গে সে আশ্রয় নিবে;
কাজেই আমাদেরকে এখুনি সেই পথ ধরতে হবে।
কারণ, নদী তীরের এই দুর্গে ঠিক হয়ে বসতে পারলে
তাকে হটানো কঠিন হবে।
জলের গভীরতা থেকে উঠে এসেছে
কঠিন পাথরের উপর প্রতিষ্ঠিত সেই দুর্গ।
সে দুর্গে প্রয়োজনীয় সকল বস্তু ও সম্পদাদি রয়েছে,
হুমাপক্ষী[২৬] তার উপর ছায়া ফেলেনা।

২৫ তুরানের অন্তর্গত এক প্রাচীন নগরীর নাম।

২৬ প্রবাদ আছে যে, হুমাপক্ষীর ছায়া উপর পড়ে সে হয় ভাগ্যবান কিংবা রাজা। কিন্তু এখানে দুর্গের উচ্চতা কিংবা দুর্গবাসীর সম্পদের প্রাচুর্য নির্দেশ করার জন্য হয়তো কবি হুমাপক্ষীর অত্যাবশ্যক ছায়া না ফেলার কথা বলেছেন।

সত্বর আমাকে সেখানে যেতে হবে,
অশ্ব-বল্গা ও রেকাব এখুনি করতে হবে উদ্যত।
এই চিন্তা করে তিনি কারেনকে ডাকলেন,
ও তার কাছে ব্যক্ত করলেন সেই কথা।
কারেন বাদশার কথা শুনে বললেন,
হে অমিত তেজা অধিনায়ক,
এই যদি আপনার অভিপ্রায় হয়, তবে দাসের অধীনে
সোপর্দ করুন একদল সৈন্য।
আপনার সুমঙ্গল পতাকা হাতে নিয়ে
ও তূরের অঙ্গুরীয় সঙ্গে করে অবিলম্বে আমি সেই দুর্গের
পথ ধরবো।
এবং সুকৌশলে সৈন্যদলসহ
প্রবেশ করবো দুর্গ মধ্যে।
কারেনের জবাব শুনে মনুচেহের বললেন, আমি সম্মত,
আপনি প্রস্তুত হোন, খোদা আপনার সহায় হবেন।
তারপর মনুচেহের সৈনিকদের মধ্যে থেকে সাহসী ও অভিজ্ঞ
ছয়-হাজার বীরকে এই অভিযানের জন্য মনোনীত করলেন।
কালি-ঢালা অন্ধকার রাত্রিতে তাঁরা যাত্রা করলেন,
হাতীর পিঠে বসিয়ে নিলেন রণ-দামামা।

কিছুদূর গিয়েই সৈন্যগণ স্থলপথ ছেড়ে
জল-পথে এগিয়ে চললো।
তারপর বীরবৃন্দ
দুর্গের নিকটবর্তী হোলে
সেনাপতি সৈন্যদলকে শিরোয়ার[২৭] হাতে সমর্পণ করে
বললেন, আমি এখন আমার পরিচয় গোপন রাখবো।

২৭ মনুচেহেরের এক সেনাপতির নামও শিরোয়া ছিল।

দূতের বেশে দুর্গরক্ষীর কাছে উপস্থিত হয়ে
এই অঙ্গরীয় দেখাব।
এবং এই কৌশলে দ্বার অতিক্রম করে
সর্ববিধ ব্যবস্থা সম্পন্ন করবো।
দুর্গে প্রবেশ করে আমি পতাকা উড়িয়ে দিব,
তারপর তলোয়ারগুলো উঁচু করে ধরবো।
তোমরা সবাই তখন দুর্গের দিকে মুখ করবে,
আমি যখন হুঙ্কার দিব, তখন তোমরাও সঙ্গে সঙ্গে তাতে
যোগ দিবে।

সৈন্যগণ নদীতীরে রয়ে গেলেন,
সেনাপতি তাদেরকে শিরোয়ার হাতে সমর্পণ করে গেছেন।
দুর্গ-দ্বারের নিকটবর্তী হয়ে দ্বার রক্ষীর সঙ্গে কথা বললেন কারেন,
ও তাকে অঙ্গুরীয় দেখালেন।
বললেন, আমি তূরের নিকট থেকে এসেছি,
এই দুর্গে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিব।
তিনি আমাকে বলেছেন, তুমি গিয়ে দ্বাররক্ষীকে বলবে,
সে যেন দিনরাত অতন্দ্রভাবে পাহারা দেয়।
তুমি দ্বাররক্ষীর সঙ্গে বন্ধুভাবে অবস্থান করবে,
দুর্গের রক্ষণাবেক্ষণে তুমিও তৎপর ও সজাগ থাকবে।
এবং যখনই মনুচেহেরের পতাকা তোমার নজরে পড়বে,
তখনই সকল সৈন্যসহ দুর্গ রক্ষায় এগিয়ে আসবে।
তোমরা অক্ষত ও ক্ষমতার অধিকারী,
মনুচেহেরের সৈন্যদলকে তোমরা পরাস্ত করতে পারবে,
এ বিশ্বাস আমার আছে।

দ্বারী এই কথা শুনে,
ও তূরের নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় দেখে,
তখুনি দুর্গদ্বার খুলে দিলো—

চোখের দেখায় সে গোপন রহস্য কিছুই বুঝতে পারলো না।

শোন, দিহ্কান কবি[২৮] কি সুন্দর বলেছিলেন,
হৃদয় রহস্য সম্পর্কে সে এতটুকুই বুঝে যে, হৃদয় অজ্ঞাত
এবং আমার ও তোমার কর্তব্য হোল আনুগত্য;
কিন্তু সে আনুগত্যের সঙ্গে বুদ্ধির যোগাযোগ চাই।
শুভ-অশুভ যাই ঘটুক না কেন,
কাহিনীর গ্রন্থী উন্মোচনের জন্য বুদ্ধিব প্রয়োজন আছে।

দ্বাররক্ষী তখনি কারেনকে সঙ্গে কবে
দুর্গে প্রবেশ করলো:
একজন সরল ও একজন কুটিল,—
সেনাপতির মন স্বীয় উদ্দেশ্যে সিদ্ধিব দিকেই উন্মুখ হয়ে বয়েছে।
তিনি শত্রুর সঙ্গে ভাই-সম্পর্ক পাতিয়ে
তাব মস্তক ও দুর্গ নির্মূল করার চিন্তায় মগ্ন হলেন।

কবি বলেছেন, হে তীক্ষ্ণনখধারীর শাবক,
তুমি অন্য এক ব্যাঘ্রশাবকের সঙ্গে
না জেনে শুনে ত্বরিত কোন কর্ম-পন্থা বেছে নিয়োনা,
তার আগে ভালো করে নিরীক্ষণ করো তাকে আপাদ মস্তক।
সুললিত কথায় ভুলে যেয়োনা,
বিশেষ করে যুদ্ধ ও গোলযোগের সময়ে।
অনুসন্ধান করো; গুপ্ত ঘাঁটি সম্পর্কে সতর্ক হও,
যে-কথাই শোনো, তার তলকূল মেপে দেখো।
লক্ষ্য করে দেখ, একজন বহুদর্শী সেনাপতি
কি ভাবে করেন প্রহেলিকার সমাধান।

---

২৮ ফেরদৌসীর পূর্বেও শাহানামার কাহিনীগুলো 'দিহ্‌কান' বা গ্রাম্য কবিদের দ্বারা গীত হোত। সামন্ত যুগে 'দিহকান' গ্রাম্য অভিজাত বা জমিদার শ্রেণী গঠন করেছে।

তিনি শত্রুর সকল চক্রান্ত উপলব্ধি করে
তার চারিদিকের বেষ্টনকে করে দেন ব্যর্থ।

রাত্রি প্রভাত হলে সংগ্রামী কারেন
উড়িয়ে দিলেন পতাকা।
রণবাদ্য ও অন্যান্য ইঙ্গিত করে
শিরোয়াব কাছে তিনি ব্যক্ত কবলেন তাঁব অভিপ্রায়।
শিরোয়া কেয়ানী পতাকা উড্ডীন দেখে
সৈন্যগণসহ দুর্গের দিকে মুখ কবলেন।
দুর্গদ্বাব অধিকার কবে সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করলেন তিনি।
এবং শত্রুপক্ষের সেনানীগণেব মস্তক বক্তে অনুরঞ্জিত করলেন।
একদিকে কাবেন ও অন্যদিকে শিরোয়া—
তাঁদেব তলোয়ার থেকে যুগপৎ আগুন ও বক্ত ঝরাতে লাগলেন।
এইভাবে সূর্য যখন গম্বুজ চূড়াব উপবে উঠলো
তখন না রইলো দুর্গ না রইলো দুর্গ রক্ষক :—
শুধু এক ধূম্রপুঞ্জ উত্থিত হোল মেঘমালার দিকে,
নদীব উপর কোন নৌকোর আর দ্বীপেব উপর দুর্গেব
চিহ্নমাত্রও দৃষ্টি গোচর হোলনা।

আগুনের লেলিহান জিহ্বা বাতাসের তাড়নায় তীব্রতর হোল,
অশ্বারোহীদের হুঙ্কার ও আহতদের বিলাপে
চতুর্দিক পূর্ণ হোল।

সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়লে
ক্রমে ক্রমে ধুঁয়ার ভিতর থেকে থেকে বেরিয়ে এলো দুর্গ ও
বিশাল প্রান্তর।

দেখা গেল বিপক্ষের দ্বাদশ সহস্র সৈনিক হত হয়ে পড়ে আছে,
আগুন থেকে বিনির্গত কালো ধুঁয়া সরে যাচ্ছে নদীর দিকে।

সেই ধুঁয়ায় কালীবর্ণ হয়ে গেছে জলতল,
এবং প্রান্তর রূপান্তরিত হয়েছে রক্তের নদীতে।
নারী ও শিশুদল কাঁদতে কাঁদতে
সেনাপতির কাছে এসে প্রাণ ভিক্ষা চাইলো।
মহামতি কারেন তাদেরকে সম্রাটের বিজয় গৌরবে
প্রাণের আশ্বাস দিলেন।

জোহাকের পৌত্র কাকোয়ের অভিযান

এইভাবে শত্রুদলন করে সংগ্রামী কারেন
বাদশার সমীপে ফিরে এলেন।
তারপর নতুন বাদশার কাছে যুদ্ধের উত্থান-পতন
এবং তার কৌশলাদির কথা একে একে বর্ণনা করলেন।
মনুচেহের তা শুনে তাঁকে সংবর্ধনা করে বললেন,
চির অব্যাহত থাক আপনার জন্য অশ্ব, প্রহরণ ও সাজসজ্জা।
বীর কারেনের উপর এইভাবে তাঁর সন্তুষ্টিজ্ঞাপন করে
বাদশা বললেন,
আপনাকে এখুনি আবার সৈন্য নিয়ে যাত্রা করতে হবে।
এক নতুন শত্রু আবার
বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে
আমাদের উদ্দেশে উন্মুক্ত করেছে খরশান তরবারি।
শুনেছি, সে জোহাকের পৌত্র;
তার অপবিত্র নাম কাকোয়।
সে এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে এগিয়ে আসছে—
তাদের মধ্যে রয়েছে দুরন্ত অশ্বারোহী দল ও বর্শাধারী বীরগণ।
আমাদের বীরবৃন্দের মধ্যে যারা যুদ্ধে বীরত্বের
পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে
তাদেরকে নিয়ে আপনি যাত্রা করুন।
বন্ধুকে দিজ্ হুখ্ত[29] ও গুঙ্[30] থেকে যাত্রা করতে দেখে

২৯ বায়তুল মুকাদ্দাসের প্রাচীন ইরানীয় নাম।
৩০ সিরিয়ার অন্তর্গত এক পাহাড়ী এলাকা।

সুলমও এখন যুদ্ধের জন্য কোমর বাঁধবে।
লোকে বলে সে যুদ্ধে এক সংগ্রামী দৈত্য
বাহুবলে পথ করে নিয়ে সে আমাদের সম্মুখবর্তী হবে।
সমস্ত রণক্ষেত্রে সে বীরদর্পে বিচরণ করবে,
এবং গদাহাতে পরীক্ষা করবে আমার সৈন্যদের বাহুবল।
যদি সে যুদ্ধ করতে আসে
তবে তাকে আক্রমণ করবো আমি নিজে।
কারেন বাদশাকে বললো, হে নরপতি,
কা'র এমন সাধ্য যে যুদ্ধে আপনার সম্মুখীন হয়?
ভীষণতম ব্যাঘ্রও যদি আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়,
তবে তার গাত্র-চর্মও আপনি অবলীলায় উন্মোচন করবেন।
কাকোয় সে কে? কি তার সাধ্য?
আপনার সামনে দাঁড়াতে পারে এমন কেউ আছে কি দুনিয়ায়?
আমি স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করে রেখেছি
এক সুন্দর কৌশল:
যা'তে দিজহুখত ও গুঙ্গ থেকে
কাকোয় যুদ্ধার্থ এগিয়ে না আসে।
এই কথা শুনে বাদশা কারেনকে বললেন,
মন থেকে দুশ্চিন্তা দূর করুন।
যুদ্ধের ক্লেশ বহন করবার জন্য প্রস্তুত হোন,
এবং তার জন্য সমস্ত হিংস্রতা নিয়ে প্রস্তুত করুন সৈন্যবাহিনী।
আমার জন্য যুদ্ধকাল এখানেই সমাগত হয়েছে,
হে সমুন্নতাশির বীর, আপনি প্রসারিত করুন
আপনার প্রচেষ্টা।
এইরূপ বলার সঙ্গে সঙ্গে শিবির প্রাঙ্গণে
উত্থিত হোল রণদামামার গুরুগম্ভীর নিনাদ।

যথাসময়ে সৈন্যদের পদধূলিতে ও দুন্দুভির আওয়াজে
বাতাস কৃষ্ণবর্ণ ও ধরণী অন্ধকার হোল।
সেই অন্ধকারে যেন হীরকখণ্ডগুলো প্রাণ পেয়েছে,
এবং ইতস্ততঃ বিচরণ করছে বর্শা ও প্রহরণ।

চারদিকে উত্থিত হচ্ছে চীৎকার ও যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে,
শরজালে ছেয়ে গেছে আকাশের আঙিনা।
ঠাণ্ডা রক্তের শৈত্যে হাতে-ধরা অসি কাঁপছে,
এবং অন্ধকার মেঘ থেকে ঝরছে রক্তের ফোঁটা।
পায়ের তলায় যেন রক্তেব বান ডেকেছে,
তাব ঢেউ এসে প্রহত হচ্ছে উচ্চতর ভূমিতে।
দুই প্রতিদ্বন্দ্বী সৈন্যবাহিনী জাপ্‌টে ধরেছে একে অন্যকে,
কালো হাবশীব মুখের মতো মসীলিপ্ত হয়েছে জগতের মুখ।
এমন সময় প্রতিদ্বন্দ্বীকে আহ্বান করে ভীষণ চীৎকার করে
মহানায়ক কাকোয়
যুদ্ধ ক্ষেত্রে এক দৈত্যের মতো প্রবেশ করলো।
মনুচেহেরও তা দেখে সৈন্যদলের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসলেন,
তাঁর হাতে ধরা রয়েছে খরশান হিন্দুস্তানী তলোয়ার।
দু'জনই যুগপৎ উত্থিত করলেন রণ-চীৎকার,
সেই চীৎকারে যেন পাহাড় ফেটে গেল, ও মানুষের হৃদয় হোল
ভয়ে প্রকম্পিত।
দুই বীর দুই প্রমত্ত হস্তীর মতো পরস্পরের নিধনে
নিজেদের কোমর বাঁধলেন।
প্রথমেই কাকোয় বাদশার কোমর-বন্ধ লক্ষ্য করে বর্শা ছুঁড়লো,
সেই আঘাতের তীব্রতায় কেঁপে উঠলো তাঁর রাজমুকুট।
এবং তাঁর বর্ম কোমর পর্যন্ত দীর্ণ হয়ে গেলো,
ফলে লৌহাবরণ সরে গিয়ে প্রকটিত হয়ে পড়লো
কটিদেশ।

এই সময় মনুচেহের কাকোয়ের গ্রীবাদেশে তলোয়ার মারলেন,
সঙ্গে সঙ্গে তার অঙ্গাবরক সাঁজোয়া ভেদ করে তা ত্বক স্পর্শ করলো।
এইভাবে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বিপ্রহর পর্যন্ত লড়তে লাগলেন,
তাঁদের মাথার উপরে গতিমান রইলো উজ্জ্বল সূর্য।
ততক্ষণে দুই পক্ষের ব্যাঘ্রদলের লড়াইয়ে
নদী প্রান্তর ও পাহাড় রক্তে ভেসে গেল।
বাদশা তখন এই দীর্ঘ-সূত্রী সংগ্রামে বিরক্ত হয়ে
যুদ্ধ সংক্ষিপ্ত করার জন্য তাঁর পাঞ্জা প্রসারিত করলেন;
এবং অত্যন্ত শক্ত মুঠিতে কাকোয়ের কোমর-বন্ধ আকর্ষণ করে
তাকে ঘোড়ার উপর থেকে মাটিতে ফেলে দিলেন।
তারপর ক্ষিপ্র-গতিতে খঞ্জর টেনে নিয়ে
তার বক্ষঃদেশ বিদীর্ণ করে দিলেন।
এইভাবে তেজস্বী আরব-বীরের সকল গর্ব চিরতরে
নির্মূল হয়ে গেল;
এমনভাবে নিশ্চিহ্ন হোল, যেন মাতৃগর্ভ থেকে কাকোয়
জন্মই নেয়নি কোনদিন।

সুল্‌মের পলায়ন ও মনুচেহ্‌রের হাতে তার নিধন

কাকোয়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে
সুল্‌মের আশা-ভরসার প্রধান স্তম্ভ ভেঙে পড়লো।
তার অন্তর থেকে ক্রোধ দূরীভূত হোল,
এবং সে পলায়ন করলো সেই দুর্গের দিকে।
নদীর তীরে পৌঁছে সে দেখলো,
সেখানে একটি নৌকার চিহ্ন পর্যন্ত নেই।
কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে আবার সে প্রান্তরের দিকে মুখ করলো,
কিন্তু সৈনিকের রক্তে ও শবে পালায়নও কঠিন হয়ে পড়েছে।
মনুচেহের অন্তর ক্রোধে পূর্ণ করে—
দ্রুতগামী অশ্বে চড়ে বসলেন;
এবং অঙ্গে তুলে নিলেন যুদ্ধসাজ,
তারপর সৈন্যদলের পদধূলিতে আকাশ পূর্ণ করে এগিয়ে গেলেন।
রোমের অধিপতির সম্মুখীন হয়ে মনুচেহের তাকে ডাক দিয়ে বললেন,
হে অপয়া-অত্যাচারী!
তুমি রাজমুকুটের জন্য আপন ভাইকে হত্যা করেছিলে,
একটু এগিয়ে এসে রাজমুকুট লও।
হে সিংহাসনধারী, আমি তোমার জন্য রাজমুকুট বয়ে এনেছি,
সেই রাজকীয় বৃক্ষকে এসে আলিঙ্গন কর।
মাহাত্ম্যের রাজমুকুট রেখে পালিয়ে যেয়োনা,
ফারেদুন তোমার জন্য এক নতুন সিংহাসন তৈরী করে রেখেছেন।
যে-বৃক্ষ তুমি নিজের হাতে রোপণ করেছিলে তাতে ফল ধরেছে,
এসো, ফল এখন বুকে তুলে নাও।

সেই ফল যদি কণ্টক পূর্ণ হয়, তবু সে তোমারই হাতের
রোপিত বৃক্ষের ফল,
আর যদি রেশম হয় তবুও সে তোমারই।
সংকীর্ণ গোরের মধ্যে তাবাই তোমাকে মাহাত্ম্য দান করবে,
সমস্ত ভালো ও মন্দ এনে দিবে তোমাব বুকের উপরে।
এইরূপ বলতে বলতে মনুচেহের অশ্ব চালিত করে
তাব মুখোমুখী এসে উপস্থিত হলেন।
এবং সবেগে তাব গ্রীবাদেশে তরবারির আঘাত করলেন,
সঙ্গে সঙ্গে সুল্‌মের রাজকীয় তনু দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে গেলো।
মনুচেহেরের আদেশে সৈন্যগণ সুল্‌মেব কর্তিত মস্তক
বর্শা শিবে গেঁথে উপরে তুলে ধবলো।
বাদশার এই অদ্ভুত বাহুবল দেখে
সৈন্যরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বইলো;
সুল্‌মের সৈন্যরা ভয়ে
ইতস্ততঃ পলায়ন করতে লাগলো।
তারা দলে দলে পথহীন পথে,
বন-জঙ্গল ও পাহাড়-পর্বতের দিকে ছুটে চললো।
এমন সময় এক বুদ্ধিমান ও বাক্‌-কুশল ব্যক্তিকে
সৈন্যরা বললো,
তুমি মনুচেহেরের কাছে গিয়ে
আমাদের পক্ষে কিছু বলো।
সেই ব্যক্তি তখন বাদশাকে বললো, আমরা সবাই বিজিত,
আপনার আদেশ ও অনুশাসন আমাদের শিরোধার্য।
আমরা শত্রুতা নিয়ে যুদ্ধ করতে আসিনি,
আমাদের বাদশার আদেশেই আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি।
সৈন্যরূপেই আমাদের যুদ্ধ ক্ষেত্রে আগমণ,

কোন রকম ঈর্ষা কিংবা শত্রুতার বশবর্তী হয়ে নয়।
এখন আমরা পুরোপুরি আপনারই দাস,
আপনারই দয়া ও করুণার প্রার্থী।
আমরা সমবেতভাবে মস্তক অবনত করছি আপনার সামনে,
আমরা নিরপরাধ ও সেইভাবেই এখানে দণ্ডায়মান।
বাদশা আদেশ করুন, কি তাঁর বাসনা, আমরা তাই করবো।
আমাদের প্রাণ-মন এখন তাঁরই ইচ্ছার অধীন।
বুদ্ধিমান ব্যক্তির এই কথাগুলো
বাদশা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন।
তারপর বললেন, আমার কামনা-বাসনা
আমি ধূলায় নিক্ষেপ করেছি।
বিশ্ব-প্রভুর পথে যা কিছু ভালো
এবং শয়তানের পথে যা কিছু মন্দ—
সব আমি আমার চোখের সামনে আনতে চাই,
মন্দ দৈত্যদেরই দুঃখের কারণ হোক।
যদি তোমরা আমার শত্রুভাবাপন্ন ছিলে,
এখন বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে থাক,
এবং আনুগত্যের প্রকাশ স্বরূপ পরিত্যাগ করে থাক অস্ত্র—
তবে পাপ থেকে উত্থিত হয়ে নিষ্পাপ-নিষ্কলঙ্ক হও।
আজ ক্ষমার দিন,
হত্যা ও রক্তপাত থেকে মুক্ত করো তোমাদের শির।
মন্দ কাজ থেকে তোমরা তোমাদের হস্ত প্রক্ষালন কর,
জ্ঞানীগণ জ্ঞানের পথে বিচরণ করুন।
প্রেম ও ভালবাসার মন্ত্র উচ্চারণ কর সকলে
অঙ্গ থেকে দূর করো সকল যুদ্ধাস্ত্র।
জ্ঞান ও বিবেচনার পথ ধরো, ধর্মকে অবলম্বন করো,

অমঙ্গল ও অসূয়াকে পরিত্যাগ করো সর্বান্তঃকরণে।
তোমরা যে যেখানকার অধিবাসী—
তুরান, চীন কিংবা রোম যে-দেশেরই হও—
আনন্দের সঙ্গে প্রত্যাবর্তন কর
ও সেখানে গিয়ে সুখে বসবাস কর।
বাদশার এই ঘোষণা শুনে সকল সামন্ত
প্রশংসা-বাণী উচ্চারণ করলো সত্য-নিষ্ঠ রাজার।
শিবিরের যবনিকান্তরাল থেকে ঘোষিত হোল বাণী,—
হে পূত-হৃদয় বীরগণ,
আজ থেকে ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে কেউ করো না শোণিতপাত,
কারণ, অন্যায় ও উৎপীড়নের ভাগ্য আজ থেকে অবনত হয়েছে।
সঙ্গে সঙ্গে চীনের সকল সংগ্রামী সেনা
তাদের শির অবনত করলো।
এবং পিশঙ্গ-নন্দনের সামনে এসে
পরিত্যাগ করলো তাদের যুদ্ধাস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম।
দলে দলে এগিয়ে এসে সৈন্যগণ বাদশার সামনে
পর্বতের মতো স্তূপাকার করে দিল অস্ত্রের রাশি।
তাদের মধ্যে রয়েছে তুর্কী-বর্ম ও সাঁজোয়া,
রয়েছে প্রাস, গদা ও হিন্দুস্তানী তলোয়ার।
সর্বাধিনায়ক মনুচেহের তখন সামন্তগণকে
তাদের মর্যাদা অনুযায়ী দান দ্বারা সন্তুষ্ট করলেন।